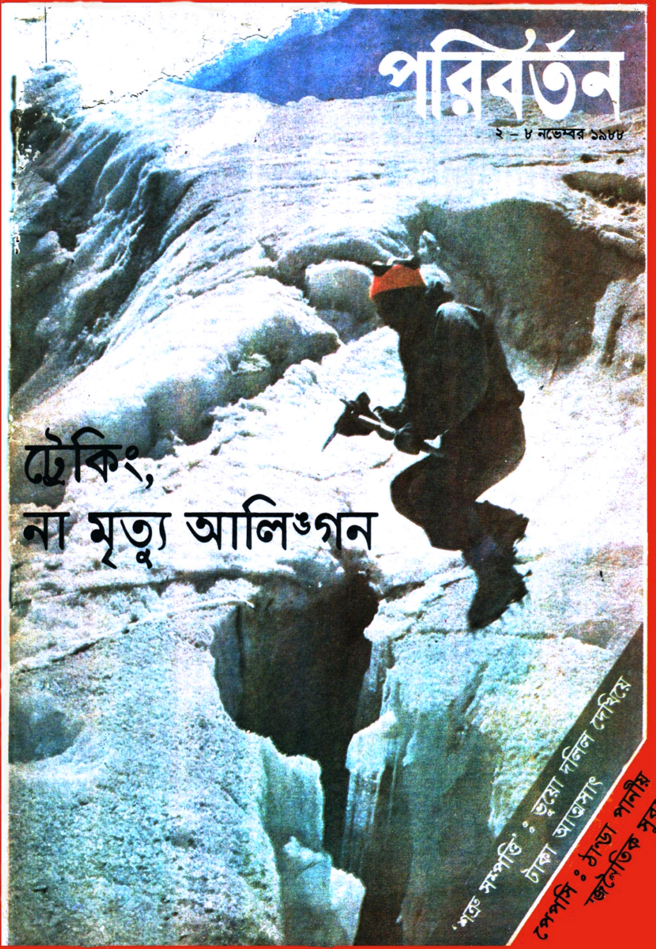

পরিবর্তন
২ – ৮ নভেম্বর ১৯৮৪
ট্রেকিং,
না মৃত্যু আলিঙ্গন
'শত্রু সম্পত্তি' : ভুয়ো দলিল দেখিয়ে
টাকা আত্মসাৎ
পেপসি : ঠান্ডা পানীয়
রাজনৈতিক সুরা



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ও স্ক্যান ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

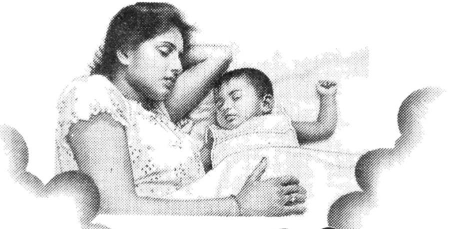
এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

সারা দেশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ গুড নাইট দিয়ে মশাদের শুভরাত্রি জানাচ্ছেন!



আর আপনি ?

মশা প্রতিরোধ করার নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য উপায়

সারা দেশের লক্ষ লক্ষ লোক গুড নাইট ব্যবহার ক'রে পরখ করেছেন। আজ পর্যান্ত যতগুলি মশা প্রতিরোধকারক আছে, তার মধ্যে এটিই হ'ল সবচেয়ে বেশী নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য।

স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকারক নয়, আর না কোনো ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়

না এ দিয়ে হয় গলা বন্ধ করা ধোঁওয়ার রাশি, না কোনো ছাই ঝরে, আর না থাকে চিটচিটানি-ভাব। শুধু একটি মৃদু সুগন্ধ থাকে, যা মশাদের দূরে রাখে — রাতের পর রাত, বছরের পর বছর ধরে।

ব্যবহার করাও অতি সহজ

গুড নাইট ব্যবহার করা খুব সহজ।
গুডনাইট-টি শুধু হিটার প্লেটের ওপর বসিয়ে দিয়ে প্লাগ লাগান, আর সুইচ জ্বালান...ব্যস্, তারপর মশার হাত থেকে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে যান।
আরও ভাল ফল পেতে হলে, কিছুক্ষণের জন্যে ঘরের দরজা, জানলা বন্ধ রাখুন।

বিশেষ ভাবে তৈরী গুড নাইট ম্যাট্স

সবচেয়ে সেরা ফল পেতে হলে, আপনার ইউনিটটিতে শুধু গুড নাইট ম্যাট-ই ব্যবহার করুন। এটি যাতে রাত-ভর এর প্রভাব অক্ষুন্ন রাখতে পারে সেজন্যে আমাদের আমদানী করা জাপানী রস[illegible] দিয়ে আমাদের নিজস্ব গবেষণাগারে অতি সযত্নে এর ক্রমোন্নয়ন সাধন ক'রে থাকি।



সুমিটোমো-র জাপানী প্রয়োগ কৌশল

গুড নাইট হ'ল এমন এক মশা প্রতিরোধকারক যা, তৈরী করা হয়, জাপানের সুমিটোমো কেমিক্যাল্স লিমিটেডের বিশ্ববিখ্যাত জাপানী প্রয়োগ কৌশল ও অতি উৎকৃষ্ট আমদানী করা সব উপাদান দিয়ে।

তাই, এটিই যে দেশের সবচেয়ে বেশী বিক্রীর ইলেকট্রিকে মশা প্রতিরোধকারক তা জেনে, আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই। এর এই এতসব সুবিধের কথা শুনে, নিজের কাছেও একটি রাখতে কে না চাইবে, তা বলুন না।

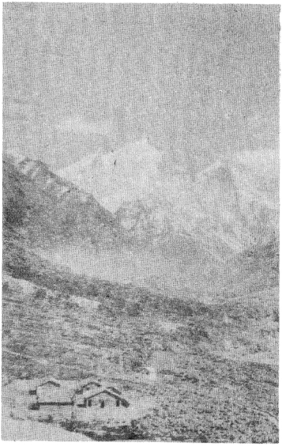
গুড নাইট

"সুইচটি জ্বালান", আর মশার হাত থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে যান।

'স্বপ্ন-মধুর' গুড নাইট-এর ঘুমে বিভোর থাকুন

প্রস্তুতকারক: **ট্রান্সলেক্টা** ১২৬, ক্রিয়েটিভ ইণ্ডাস্ট্রীয়াল বিল্ডিং, সুন্দরনগর, কালিনা, বম্বে ৪০০ ০৯৮ ফোন: ৬১৪৪৬৬১, ৬১৪০৬২৭

Creative Unit 6547 Ben.



পরিবর্তন

২-৮ নভেম্বর ১৯৮৪, বর্ষ ১১, সংখ্যা ১৭
প্রতি সংখ্যা ৪.৫০ টাকা
বিমান মাসুল : পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা, ভারতের অন্যত্র ২৫ পয়সা

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : অর্ধেন্দু রায়
ফটো : ফ্রন্টলাইন-এর সৌজন্যে

সম্পাদক : অশোক চৌধুরী



সব জায়গায়, সবখানে, যেখানেই বিমানে উড়ে
আমার তো মার্ভেল চাই-ই চাই!
— গীতা নারায়ণ
এয়ার হোস্টেস
Marvel
মার্ভেল-ভারতের বিশেষ আন্তর্জাতিক কোয়ালিটির সাবান
একটি গোদরেজ উৎপাদন
Mudra: B: G: 5004 BEN

ভাবমূর্তির যূপকাষ্ঠ

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী পদত্যাগ করেছেন। বেঙ্গল ল্যাম্প থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বেশি করে বাল্ব কেনার প্রশ্নে ৪০ দিন ধরে চাপান-উতোরের পর ৪১তম দিবসে পদত্যাগপত্র পেশের মধ্য দিয়ে যে শান্তি নেমে এল তাকে শ্মশানের শান্তি বলা হবে, না নতুন বিস্ফোরণের সূচনা বলে ধরা হবে তা বলার সময় এখনও আসেনি। তবে এটুকু বলা যায়, যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তার এবম্বিধ পরিণতি অনভিপ্রেত ছিল না। কারণ বেঙ্গল ল্যাম্পকে বাধিত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর পুত্র শ্রীমান চন্দন বসুর সশরীরে তদ্বির এবং স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর মৌখিক নির্দেশ নিয়ে যতীনবাবু যে কটাক্ষ করেছেন তারপর মুখ্যমন্ত্রী সংগত কারণেই এমন একজন দুর্বিনীত ব্যক্তিকে তাঁর মন্ত্রিসভায় রেখে দিতে পারেন না। আবার যতীনবাবুকে 'অসত্যবাদী', 'মতলববাজ' এবং অন্য যেসব বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে তারপর তাঁর পক্ষেও মন্ত্রিসভায় আলো করে বসা শোভা পায় না। প্রচুর অশালীন ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর পদত্যাগপত্র পেশের এই শালীনতা প্রকাশ করে যতীনবাবু রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতারই পরিচয় দিয়েছেন।

যতীন চক্রবর্তীর পদত্যাগ দাবি করা ছাড়া সি পি আই (এম)-এর কাছেও বিকল্প কোন পথ ছিল না। কারণ এই বিষয়টির সংগে জ্যোতি বসুর ভাবমূর্তি অম্লান রাখার প্রশ্ন জড়িত। সি পি আই (এম) যতই তার সাংগঠনিক শক্তির বড়াই করুক না কেন ঐ দলটির বাড়-বাড়ন্তের পিছনে জ্যোতি বসুর উজ্জ্বল ভাবমূর্তির অবদানই যে সর্বাধিক এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। বস্তুতপক্ষে সি পি আই ১৯৬৪ সালে বিভক্ত হবার পর দল হিসেবে সি পি আই (এম)-কে গড়ে উঠতে হয়েছিল জ্যোতি বসুকে মূলধন করেই। এই প্রয়োজনে দলও যেমন সচেতন প্রয়াস চালিয়ে জ্যোতি বসুর পিছনে একটি জ্যোতির্বলয় রচনা করার কাজ করে গেছে তেমনি স্বয়ং জ্যোতি বসুও তাঁর তীক্ষ্ম সাধারণ জ্ঞান প্রয়োগ করে সব সময়ই সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য রাজনৈতিক কৌশল গ্রহণ করে গেছেন। তিনি এবং তাঁর দল সব সময়েই মনে রেখেছেন যে, মূর্তিপূজার এই দেশে ভাবমূর্তিই সার কথা।

রাজীব গান্ধী-বিরোধী সর্বভারতীয় রাজনৈতিক রংগমঞ্চে সি পি আই (এম)-কে অন্যতম প্রধান ভূমিকায় নিয়ে আসতেও জ্যোতি বসুর ভাবমূর্তির ঔজ্জ্বল্যই তুরুপের তাস। কারণ এমন ভাবমূর্তি অন্য কোন বিরোধী নেতারই নেই। কাজেই যতীন চক্রবর্তীকে অপসারিত করে জ্যোতি বসুর ভাবমূর্তিকে অম্লান রাখতে সি পি আই (এম)-এর মরিয়া প্রয়াস মোটেই অসংগত নয়।

আর এস পি এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতারা বেঙ্গল ল্যাম্প প্রশ্নের সূচনায় সি পি আই (এম) সম্পর্কে 'রণং দেহি' হয়ে উঠলেও সম্ভবত পরে বুঝতে পেরেছিলেন যে জ্যোতি বসুর ভাবমূর্তির দাম কত বেশি! তাই তাঁরা যতীন চক্রবর্তীর যাবতীয় নোট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তে সায় দিয়েছিলেন। কিন্তু সি পি আই (এম) এতে তুষ্ট হবে কেন? তারা জানে যে উৎসমুখ বন্ধ করতে না পারলে সহস্রধারায় গরল নির্গলিত হতে পারে। তাই যতীনবাবুকে সরতেই হল।

১৮ সেপ্টেম্বর 'বেঙ্গল ল্যাম্প নোট' পত্রিকায় ফাঁস হয়ে যাবার পর বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান সরোজ মুখার্জি জ্যোতি বসুকে সার্টিফিকেট দিয়ে বলেছিলেন – 'উনি এমন কাজ করতেই পারেন না।' জ্যোতি বসু স্বয়ং তাঁর প্রিয়পাত্র অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তকে বেঙ্গল ল্যাম্প সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্তের দায়িত্ব দিয়ে আর একটি 'সততার সার্টিফিকেট' সংগ্রহ করে রাজ্যপালের কাছে পেশ করে এলেন। তারপরে যতীনবাবু পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু এর পরেও প্রশ্ন থেকে যায় এবং সেই মারাত্মক প্রশ্নটি হল – এত করেও কি মুখ্যমন্ত্রীর ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখা যাবে?

পশ্চিমবঙ্গের এযাবৎকালের মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র জ্যোতি বসুকেই এইরকম এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হল। বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্ল সেন, অজয় মুখার্জি এমনকি সিদ্ধার্থশংকর রায়কেও ব্যক্তিগতভাবে এমন জটিল পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়নি। সিদ্ধার্থশংকর রায়ের কিছু সহকর্মীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে তিনি ওয়াংচু কমিশন বসিয়ে সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছিলেন। জ্যোতিবাবু কিন্তু সে পথে গেলেন না। তিনি তদন্তের ভার দিলেন তাঁরই স্নেহাস্পদ এমন একজন মন্ত্রীর ওপর যাঁর তদন্তের ধরন সম্পর্কে পত্রান্তরে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে যদি লোকে ঠারেঠোরে কু-কথা বলে তবে কি তাদের দোষ দেওয়া যাবে?

আসলে জ্যোতি বসুর মত এমন একজন বরেণ্য নেতা সম্পর্কে কেন গুঞ্জন ওঠে সেটা তাঁর দলকে খুঁজে দেখতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী রাজভবনের 'কুটিরে গৃহীসন্ন্যাসীর' জীবনযাপন করলেও রাজকীয় উদ্যানে যেসব স্বর্ণ আপেল ফলে আছে মুখ্যমন্ত্রীর কোন নিকটজন যদি তা পেড়ে নিতে চায় তবে তার দায় মুখ্যমন্ত্রী সবসময় অস্বীকার করে যেতে পারেন কি?

ভাবমূর্তির যূপকাষ্ঠে সত্য যাতে কখনও বলি না হতে পারে তা দেখার দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীকেই নিতে হবে। আর এ কাজ করা সম্ভব কেবল নিরপেক্ষ তদন্তের সাহায্যে। যতীনবাবুকে নিমিত্তের ভাগী করে মূল প্রশ্নটি ধামা-চাপা দেবার চেষ্টা করলেই কি নিন্দার দামামা থেমে থাকবে?

ত্রিপুরায় গণতন্ত্রের কবর খোঁড়া হচ্ছে

ত্রিপুরায় গণতন্ত্রের কবর খোঁড়া হচ্ছে। কংগ্রেস আসায় এই রাজ্যে অরাজকতা বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণে।
সম্প্রতি বামফ্রন্টের ডাকে ত্রিপুরা বন্ধের দিনের কিছু ঘটনা তুলে ধরছি।
তাপস নামে একজন যুবক সি পি আই (এম)-এর পোস্টার লাগাচ্ছিল। তখন সজল নামে একজন কংগ্রেসি তাপসকে একঘুষি মারে। টাল সামলাতে না পেরে তাপস পড়ে যায়। পড়ে গিয়ে আবার উঠে কোন মতে দৌড়ে পালায়। কংগ্রেসি ছেলেটি তারপর পোস্টারগুলি ছিঁড়ে ফেলে।
সাড়াসীমা এলাকায় তিনজন ছেলে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। তারা সি পি এম সদস্য দেখলেই মারে। কিছুদিন আগেও তারা বাস থামিয়ে কয়েকজন শিক্ষককে মারধর করে। বর্তমানে পুলিশ এদের বিরুদ্ধে কিছুই করছে না। যদিও এই তিনজনের বিরুদ্ধে হত্যার মামলা চলছে।
কোনো গন্ডগোল হলেই সি পি আই (এম) সদস্যদের জেলে ঢোকানো হচ্ছে। যদিও নাসা আইন চালু রয়েছে, তথাপি কংগ্রেসি সমর্থকদের উপর তা কার্যকর হচ্ছে না।

জয়দেব সাহা
বিলোনীয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা

সুচিন্তিত মতামত

পরিবর্তনের ১৭ – ২৩ আগস্ট ৮৮ সংখ্যাতে 'মেয়ে দেখার সনাতন রীতি পরিবর্তন করা হোক' বিতর্কে একাদশ শ্রেণীর ছাত্রীর 'নতুন চিন্তার প্রয়োজন', লেখাটি ভাল লাগল। তিনি লিখেছেন – আমাদের দেশে এখনও অনেক পিতামাতা আছেন যাঁরা স্বনির্বাচন প্রথাকে মেনে নিতে পারেন না। কিন্তু প্রথাটি তো মন্দ নয়। আমি বলি কি, এইসব সনাতনপন্থী বাবা-মায়েরা একটু নতুন করে ভেবে দেখুন। তাতে আপনার পরিবারের তো বটেই, সমাজেরও মঙ্গল হবে।
ঐ সংখ্যাতেই আর একজন (ছবি দেখে অল্প বয়সই মনে হল) লিখেছেন – বিয়ের ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের স্বাধীন অধিকার থাকা উচিত। তারা নিজেরাই পাত্র পছন্দ করতে শিখুক। আমি অনেককে জানি, যারা এইভাবে বিয়ে করে দিব্যি সুখে আছে। এটাও একটা সুচিন্তিত ও সুন্দর মতামত।

পি সি ব্যানার্জি
নতুন বাজার, মেদিনীপুর

□

বিতর্কে যোগদানকারী সকল পাঠক-পাঠিকার সুবিন্যস্ত, যুক্তিপূর্ণ, আদ্য-প্রান্ত সংগতিপূর্ণ লেখাগুলি ছাপা হয়েছে। আমরা আশা রাখব এই বিষয় শেষ হলে সম্পাদকমহাশয় আবার নাড়া দেবার মত বিষয় নিয়ে বিতর্কের আয়োজন করবেন।

গোপীপ্রসাদ দাস
গড়গড়িয়া, বীরভূম

ভুল তথ্য

গত ২৪ – ৩০ আগস্ট ১৯৮৮ সংখ্যার পরিবর্তন পত্রিকার জেলার কথা কলমে 'গণ-আদালতে মৃত্যুদন্ডাদেশ : গণধোলাই খেলেন বিচারকরা' শীর্ষক লেখাটিতে চোখ পড়ল মনে হল লেখক ঘটনাটি সম্পর্কে সম্যক অবহিত নন। তার লেখাটিতে কিছু ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

১। বিচারক সহ বিচার উদ্যোক্তাদের মারধোর করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। তা একেবারেই ভিত্তিহীন।

২। অভিযুক্ত কাদের আলিকে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়িতে বেঁধে রাখা হয়নি। তাকে ঐ গ্রামের এক জনৈক ব্যক্তির গৃহে রাখা হয়েছিল। তার উপর আদৌ নির্যাতন করা হয়নি।

৩। অভিযুক্তকে জীবন্ত কবর দেওয়ার জন্য গোরস্থানের পাশে কোনও কুয়ো খোঁড়া হয়নি।

৪। চামটা গ্রাম পঞ্চায়েতের লোকসংখ্যা ১৯৮১-র আদমসুমারী অনুযায়ী ১৭,১১৯ সেখানে ২০ হাজার লোকের জমায়েত কি করে হয়?

৫। বিচারের রায়, শরিয়ত আইনানুযায়ী 'কোরান শরিফ' অবমাননাকারী অভিযুক্তকে জীবন্ত কবর বা অঙ্গহানি করান হয় কিন্তু ভারতীয় নাগরিক হিসেবে ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী তাকে উক্ত শাস্তি কোনমতেই দেওয়া যায় না।

নবিবর রহমান
নগরগিদারী, কোচবিহার

নৈনিতাল ও স্ত্রীর সান্নিধ্য

পুজোর ঠিক পরেই পুজোর খরচ সামাল দিয়ে ভ্রমণের জন্য চিন্তা করাটাও কষ্টসাধ্য। তবু গতবছর নভেম্বর মাসে নৈনিতাল ঘোরার প্রস্তাবটা যখন পেলাম, ইচ্ছার প্রবল তাড়নায় আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে বেড়িয়েই পড়লাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

আমরা সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলাম। অল্প একটু শীত সহ্য করার ক্ষমতা থাকলে স্বামী-স্ত্রী দুজনে স্বল্প টাকায় একান্তে নিভৃতে ঘোরার জন্য নভেম্বর কি ডিসেম্বর মাসে নৈনিতালই যে আদর্শ জায়গা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কুমায়ুন পর্বতমালার উদাসী গম্ভীর টান তো আছেই, সাথে সাথে নয়না, আলমা, শের কাদান্তা, লরিয়াকান্তা, আয়ারাপাট্টা, হস্তিবুন্দি এবং সেওপাট্টা – এই সাত-সাতটি আকাশছোঁয়া পর্বতশিখরের মধ্যে সোহাগী ও রূপবতী নৈনিলেকের অপরূপ সৌন্দর্য মনকে আবেশে সিক্ত করে তোলে। লেকের পাশেই আছে নৈনিদেবীর মন্দির। 'স্নো ভিউ' পয়েন্ট থেকে বরফে ঢাকা ত্রিশূল, নন্দা দেবী, ও অন্যান্য বিভিন্ন রহস্যময়ী শিখর চূড়া দেখা যায়। দেখতে দেখতে মন যেন বিভোর হয়ে ওঠে। কম খরচে শীতের নৈনিতাল উপভোগ করার সংগে সংগে নিভৃতে ও অন্তরংগভাবে স্ত্রীর সান্নিধ্য পাওয়ার যে ভিন্ন ও সীমাহীন আনন্দ আছে তা আমার মত আপনিও নৈসর্গিক শোভার সামনে স্ত্রীর সান্নিধ্যের মধ্যে থাকলে উপলব্ধি করতে পারবেন।

সলিল দাস
কুলপুকুর, চুঁচুড়া, হুগলি

ওঁদের বরখাস্ত করুন

প্রত্যেকে দিনই কাগজে দেখতে পাওয়া যায় পুলিশি নির্যাতন। হয় হাজতে পিটিয়ে মারা হয় নয়তো কয়েদীকে পুলিশভ্যান থেকে নামিয়ে দিয়ে গুলি করে মারা হয়। এ ছাড়া রয়েছে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও ছাত্রদের উপর অমানবিক গুলি বর্ষণ। তারপর একটা কেস সাজিয়ে বাঁচার চেষ্টা করা। এ সবের প্রতিবাদ সত্ত্বেও সরকার নীরব কেন? তবে কি মেনে নিতে হবে সরকারের মৌন সমর্থন আছে? এইসব পাশবিক অত্যাচারের নায়কদের এক লোকালয় থেকে অন্য লোকালয়ে বদলি করলে সেখানে সে তার স্বভাব বদলাবে – সরকার কি এমন নিশ্চয়তা দিতে পারেন?

অতএব, সরকারের ঐ সমস্ত ঘটনার নায়ককে অবিলম্বে নতুন আইন করে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা উচিত।

লোকমান মোল্লা
ডানকুনি, হুগলি

পুজোর বাজার

দুর্গাপুজোর সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আছে অর্থনীতির স্থূল চেহারাটা। অর্থনীতির পূর্ণ অবয়বটুকু আমাদের দৃষ্টিতে এলো ২১ – ২৭ সেপ্টেম্বর পরিবর্তনে প্রকাশিত 'পুজোর বাজার' প্রচ্ছদ কাহিনীর মধ্য দিয়ে। আমরা জানি, অনেকক্ষেত্রে দাম কমলে চাহিদা বাড়ে, কিন্তু পুজোর বাজার মানেই আকাশছোঁয়া দাম, কাজেই এই সময় অর্থনীতির সংগে মুদ্রাস্ফীতির অংকটা ভালোই বোঝা যায়। এখানে লেখক মিহির কর্মকার বস্ত্র সামগ্রী থেকে শুরু করে সামান্য বাদামওয়ালার বাদাম বিক্রিকে নিয়ে সুন্দর বাজেট কষেছেন।

আমরা সংক্ষিপ্ত লেখার মধ্যে এবার দৃষ্টিপাত করছি। 'গ্রামে পুজোর কেনাকাটায় চাকচিক্য নেই' – শ্যামলেন্দু চৌধুরীর এই লেখার উপর। তাঁর সংগে আমি একমত। কারণ, আমি একজন গ্রামেরই ছেলে। তবে লেখক এ পর্যায়ের চিত্রটি সম্পূর্ণ তুলে ধরতে পারেননি। আমার গ্রাম-সহ পাশের গ্রামের চেহারা দেখেই আমি উপলব্ধি করেছি, পুজোর আনন্দমুখর দিনেও গ্রামের অবস্থা করুণ – শহরের মত সাজসাজ রব নেই। অনেক বাড়িতেই দেখা গেছে পুজোর দু-মাস আগে যদি পোশাক ছিঁড়ে যায়, তবে কষ্ট করে চালিয়ে হয়তো পুজোর সময়ে কেনাকাটার চেষ্টা করে। কিন্তু অবস্থাপন্ন গৃহে দেখা যায় তাদের দু'পাঁচটা পোশাক থাকলেও পুজোর বাজার তাদের করতেই হবে। আমি যখন বাড়ির পাশে পুজো দেখি, তখন পাশে শতছিন্ন বস্ত্র পরিহিত বাচ্চা ছেলেমেয়েদের দেখে দুঃখ আসে শুধু এ কথা ভেবে যে, যেখানে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর লেনদেন চলছে, সেখানে দশ টাকার অভাবে এই শিশুরা পুজোর ন্যূনতম আনন্দ থেকে বঞ্চিত হলো।

মৃণালকান্তি চট্টোপাধ্যায়
রতনপুর, হুগলি

১৪ – ২০ সেপ্টেম্বর পরিবর্তন সংখ্যায় তুষার ভট্টাচার্যের লেখা 'বহরমপুর খেলার মাঠ ধ্বংস করে তৈরি হচ্ছে বিশাল সুপার মার্কেট' পড়ে খুবই ভাল লাগল। উনি এই ছোট্ট প্রতিবেদনে খুবই সত্যি কথা লিখেছেন। এত সুন্দর খেলার মাঠ নষ্ট করার অধিকার পুরসভা এবং জেলা প্রশাসনের আদৌ নেই। আর এমনিতেই বহরমপুর শহরে খেলাধূলার মাঠের সংখ্যা ভীষণ কম। নব নির্মিত স্টেডিয়ামের কাজ এখনও শেষ হয়নি। যে কয়টি সামান্য মাঠ আছে তাতে সারা বৎসরই রাজনৈতিক দলের মিটিং, যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতি অনুষ্ঠান লেগেই থাকে। এর ফলে স্থানীয় ছেলে মেয়েরা খেলবার সুযোগ কম পায়। পুরসভা এবং জেলা প্রশাসন কেবল মাত্র ব্যবসায়িক লাভক্ষতির দিকে তাকিয়ে একটি সুন্দর খেলার মাঠ ধ্বংস করে ফেললেন।

রঞ্জন চক্রবর্তী
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

□

'রোশনাইয়ের পাশেই যেখানে অন্ধকার' শীর্ষক প্রতিবেদন খুবই সময়োপযোগী। অগনিত হাসি আর নাচের আড়ালে কত শিশু শুধু বুক ফাটিয়েছে কেঁদে কেঁদে – তার হিসেব আমাদের তথাকথিত সু-প্রশাসকরা একটুও করছেন কি? জানি, সব দোষ চাপিয়ে কেন্দ্রের রাজীব সরকারের মুণ্ডুপাত করতে ছাড়বেন না জনদরদী জ্যোতি বসুর সরকার। কিন্তু মার্কসবাদীরা কি চোখ রাখবেন পরিবর্তনের পরিসংখ্যানের দিকে? 'এ মুহূর্তে পশ্চিমবংগে বন্ধ কলকারখানার সংখ্যা ২৯৩, এর মধ্যে ধর্মঘট চলছে ২৬টিতে, লক আউট ১৬৪ এবং ক্লোজার ১৩৩টিতে। এর ফলে কর্মহীনের সংখ্যা এক লক্ষ পঁচিশ হাজার সাতশ চুয়াত্তর।' ধিক এমন প্রশাসককে, যারা ক্ষুধার হিসেব না রেখে ক্ষমতার বৈভবে মশগুল।

বিবেকানন্দ চৌধুরী
মণ্ডলহাট, কাটোয়া

খেলার মাঠ ধ্বংস করে সুপার মার্কেট?

পরিবর্তন পত্রিকায় (১৪ – ২০ মে ১৯৮৮) সংখ্যায় 'বহরমপুরে খেলার মাঠ ধ্বংস করে তৈরি হচ্ছে বিশাল সুপার মার্কেট' শীর্ষক তুষার ভট্টাচার্যের প্রতিবেদনটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। বহরমপুরে এই সুন্দর খেলার মাঠটিতে সুপার মার্কেট না তৈরি করলেই ভাল হত। এখানে রাস্তাটি অত্যন্ত অপ্রশস্ত। ফলে এখান দিয়ে সাধারণ মানুষের যাতায়াত করতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে।

তাপস সরকার
খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

□

পরিবর্তন—এ জেলার কথা বিভাগে 'বহরমপুরে খেলার মাঠ ধ্বংস করে তৈরি হচ্ছে বিশাল সুপার মার্কেট' তুষার ভট্টাচার্যের এই লেখাটি পড়লাম। খুবই বাস্তব সম্মত লেখা। বহরমপুর শহরে খেলার মাঠের সংখ্যা দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে। অন্য দিকে বহরমপুর স্টেডিয়ামের কাজ এখনও অসমাপ্ত রয়েছে। কবে এই স্টেডিয়ামের কাজ সম্পূর্ণ হবে তা কেউ জানে না। এই অবস্থায় একটি খেলার মাঠ ধ্বংস করে কেন যে বিশাল সুপার মার্কেট তৈরি হচ্ছে তা আমাদের বোধগম্য হল না। খেলার মাঠটি নষ্ট করবার মূলে রয়েছেন বহরমপুর পৌরসভা এবং জেলা প্রসাশন। তাঁরা এখানে সুপার মার্কেট তৈরি করে ব্যবসায়িক ফায়দা তুলবারই চেষ্টা করছেন। তাদের খেলাধূলার প্রতি একটুও নজর নেই।

শ্যামাপদ সরকার
পঞ্চাননতলা, মুর্শিদাবাদ

এদেশটা দেউলে শাসকশ্রেণীর নয়, ভারতবাসীর

নয়া দিল্লি থেকে

সুদীপ মজুমদার

সারা দেশে এর আগে এ দৃশ্য আর কখনো দেখা যায়নি। দিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামকে দেখলে ফিলাডেলফিয়া, লণ্ডন, টোকিও অথবা লস অ্যাঞ্জেলেসের বিখ্যাত কনসার্ট অ্যারেনার থেকে এতটুকু আলাদা মনে হত না। স্টেডিয়ামের উত্তর দিকে বিশাল প্রায় পাঁচতলা বাড়ির উচ্চতায় স্টিল পাইপ দিয়ে গড়া স্টেজ। দুপাশে নয় লক্ষ ওয়াট আউটপুটের স্পিকার সিস্টেম। শয়ে শয়ে রঙিন স্ট্রোব লাইট। মঞ্চের দুপাশে বিশাল ভিডিও স্ক্রিন। মঞ্চে পৃথিবীখ্যাত ব্যান্ড। আর সামনে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি দর্শক ও শ্রোতা। এদের মধ্যে সবাই ভারতীয়।

বিদেশি রক তারকারা যখন চিৎকার করে গান গাইছিলেন আর স্টেজে দাপাদাপি করছিলেন তখন দর্শক আর শ্রোতার মাতোয়ারা ভাব দেখলে কোনও মতে বিশ্বাসই হত না যে এরা ভারতীয়। রক মিউজিক যে উদ্দীপনা ১৫ থেকে ৫০ বছর বয়সের দেশি এলিটদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল তা দেখে শুধু একটা প্রশ্নই বারবার মাথায় আসে : এই শ্রোতাগণ যারা আগামী দিনে দেশের কর্ণধার হবে তারা কি দেশের নিজস্ব কোনও বস্তু, ব্যক্তি বা ঘটনার প্রতি এর দশভাগের এক ভাগও উৎসাহ দেখাতে পারবে?

উত্তরটা হল : একটা অস্বস্তিকর চিন্তাদায়ক 'না'। ভারতবর্ষের বড় বড় শহর থেকে ধনী ও প্রতিপত্তিশালী মানুষেরা প্লেনে করে হাজার, দুহাজার টাকার টিকিট কিনে পরিবারসহ এ দশকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী হতে এসেছেন। রক স্টাররা অবশ্য এসেছিলেন এক মহৎ উদ্দেশ্যে। এই সব কোটিপতি রক স্টাররা মনে করেন তাঁরা তাঁদের গান শুনিয়ে বিশ্বের যুবসমাজের ভেতর মানবাধিকার সংক্রান্ত জাগৃতি সৃষ্টি করতে সাহায্য করবেন। একজন আমেরিকান প্রোমোটার এইসব রক স্টারদের সংগ্রহ করেন।

এথেন্স থেকে বুয়েনস আয়ারস, নিউ দিল্লি থেকে লস অ্যাঞ্জেলেস। প্রায় দুডজনের একটা ভ্রাম্যমাণ মিউজিক কনসার্ট ছ'সপ্তাহ জুড়ে গান গেয়ে অত্যাচার আর অবিচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে চলেছেন। নিজস্ব পারিশ্রমিক এঁরা নিতে চাননা। লণ্ডনের অ্যামনেস্টি ইনটারন্যাশনাল নামক সংস্থা মানবাধিকার রক্ষা করার আন্দোলনের পুরোভাগে রয়েছে। এবছর রাষ্ট্রসংঘের 'Universal Declaration of Human Rights'-এর চল্লিশ বছর পূর্ণ হল। পৃথিবীর প্রায় সবকটি দেশই এই ঘোষণাপত্রের স্বাক্ষরকারী। এতে বলা হয়েছে : মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে কিন্তু তাকে নানান রকম শেকলে আবদ্ধ করে দেওয়া হয়। বাঁচার, শিক্ষার, স্বাস্থ্যের মৌলিক অধিকার সব মানুষেরই আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র্যে, রাজনৈতিক দাসত্বে অথবা বর্বর অত্যাচারের শিকার। ভারতবর্ষও এই ঘোষণাপত্রের সমর্থনকারী। কিন্তু আমরা ভারতবাসীরা ভাল করেই জানি যে, এখানকার পুলিশ লকআপে সন্দিগ্ধ ব্যক্তিরা মারা যায় অহরহ অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে। হরিজনদের পুড়িয়ে মারা হয়। পুলিশ দাঁড়িয়ে দেখে। নাগাল্যাণ্ড, মণিপুরে সেনাবাহিনীর অবাধ অত্যাচারে মানবাধিকার পদে পদে ক্ষুণ্ণ।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সারা পৃথিবীর মানবাধিকার উল্লংঘনের খোঁজ রাখে আর মাঝে মাঝে তা প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট সরকারের কাছে জবাবদিহি চায়। গত কয়েক মাসের মধ্যে অ্যামনেস্টি ভারত সরকারের কাছে কয়েকটি রিপোর্ট পাঠিয়ে পাঞ্জাবে সশস্ত্র বাহিনীর সংগে সংঘর্ষে মৃত্যু, গুজরাটের কালা কানুন ইত্যাদি সম্বন্ধে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু সরকার রিপোর্টটি পাত্তাই দেয়নি বরং উল্টে অ্যামনেস্টিকে গালাগাল দিয়েছে।

এদিকে টাইমস অব ইন্ডিয়া এ দেশের নামকরা সংবাদপত্র সংস্থা। পত্রিকা প্রকাশের দেড়শো বছর পূর্তি হওয়া উপলক্ষে টাইমস ম্যানেজমেন্ট চাইছিল এমন করে একটা অনুষ্ঠান করতে, যা সবাই অবাক হয়ে দেখবে। কথা হচ্ছিল, কোমর দোলানো রক স্টার মাইকেল জ্যাকসনকে আনা হবে। কিন্তু ওঁর পারিশ্রমিক দিতে টাইমস কর্তৃপক্ষ দোমনা করছিল। ভেবে দেখার কথা এ দেশের এত বড় একটা সংবাদপত্র সংস্থা যারা নিজেদের ভারতীয় বলে দাবি করে তারা তাদের দেড়শো বছর পূরণের অনুষ্ঠানে মার্কিন ও পাশ্চাত্য রক স্টারকে এনে অনুষ্ঠানটিকে স্মরণীয় করতে চাইছিল। এদেশের কোনও কিছুকেই টাইমস পত্রিকা গোষ্ঠী গর্বিত করতে পারল না। এরাই আবার নিজেদের ভারতীয় বলে দাবি করে!

শেষে জানা গেল, রক স্টারদের একটা বিশ্বজোড়া ট্যুর হচ্ছে। টাইমস ঝাঁপিয়ে পড়ল। দেখল, হিউম্যান রাইটস উপলক্ষে কিছু বিদেশি রক স্টারকে নিয়ে এসে নিজস্ব সংস্থার বিজ্ঞাপনও প্রচার করা যাবে। এই ভেবে সরকারপন্থী টাইমস গোষ্ঠী সরকারি আমলাদের প্রভাবান্বিত করে এই কনসার্ট আনার অনুমতি আদায় করে।

কিন্তু মানবাধিকার আর সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচারের প্রতি পত্রিকা গোষ্ঠীর যে এতটুকু উদ্বেগ নেই তার প্রমাণ : কনসার্টের আগেই বিজ্ঞাপনে পত্রিকার গৌরবের কথা ফলাও করে প্রচার করা হতে থাকল আর গায়কদের ব্যক্তিগত জীবনের নানান কথা ফলাও করে ছাপা হতে থাকল। ঘোষণাপত্র অথবা মানবাধিকার অথবা অ্যামনেস্টির নামগন্ধও নেই। এসব দেখে রক স্টাররা তো খাপ্পা। তাঁরা প্রতিবাদ করার ফলে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন বেরোতে থাকল।

শেষ পর্যন্ত জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামের কনসার্ট বাস্তবায়িত হল। নানান স্লোগান দেওয়া টি-শার্ট পড়া তরুণ-তরুণীরা এসে ভিড় করল স্টেডিয়ামে। কারও বুকে লেখা 'আই লাভ নিউ ইয়র্ক', কারও মাথার চুলে দুরকমের রঙ চড়ানো। কারও কানে দুলের সংগে পাখির পালক। মুখের ভাষা 'হে ম্যান, টেক ইট ইজি' থেকে শুরু করে চার অক্ষরের গালাগালি পর্যন্ত। চোখেমুখে একটা নেশাগ্রস্ত ভাব। যেদিকে দুচোখ যায়, সেদিকে এই একই প্রজন্মের ভিড়। এরা ম্যানহাটানের স্ট্রিট ম্যাপ হয়তো ভাল করে মুখস্থ করে রেখেছে। কিন্তু বলতে পারবে না সাঁচী বা নালন্দা কোথায়।

এরাই আমলা, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী এককথায় ভারতের প্রিভিলেজড এলিটদের বংশধর। এরাই আই এ এস, আই এফ এস, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ম্যানেজার হবে কয়েক বছরের মধ্যে। এরাই কর্ণধার হবে আর এরাই নিজের দেশ বলতে কী বোঝায় তা জানে না। এদের যদি প্রশ্ন করা হয় – ভারতের কোন জিনিসের প্রতি এদের গভীর আকর্ষণ, তাহলে এরা নাক সিঁটকে জবাব এড়িয়ে যাবে। কেননা এদের দেশের মাটিতে শেকড় জমেনি। জমবেও না। কেননা এরা ব্রুস স্প্রিংস্টিনের জন্য জীবন দান করে দিতে পারে। এরা পাড়ার লক-আপে অত্যাচারের বিরুদ্ধে কখনো প্রতিবাদ করতে পারে না। রাত জেগে রক মিউজিক শুনে বিভোর হয়ে আত্ম-বিস্মৃত হতে পারে।

কী ভীষণ দেউলেপনার দৃশ্য! দেশটাকে যারা চালায় তাদের ছেলেমেয়েরাই একেবারে আত্ম-বিস্মৃত। অথচ এদেশটাতে কী নেই! হাজার হাজার বছরের গৌরবময় ঐতিহ্য এদেশের। ভাষা সংস্কৃতি, সংগীত সব কিছুতেই প্রগাঢ়তার ভাণ্ডার এ দেশ। মানব সম্পদ থেকে আরম্ভ করে প্রাকৃতিক সম্পদ সব কিছুরই প্রাচুর্য ভারতে। বুদ্ধিতে, বিচারে, দর্শনে কারও থেকে কম নয় এদেশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাশ্চাত্যমুখী আমাদের শাসকশ্রেণী নিজের দেশের জন্য গৌরব অনুভব করতে পারে না।

রক স্টারদের প্রতি উৎসাহে কোনও দোষ নেই। কিন্তু নিজস্ব পরিচয়, ইতিহাস, বিশ্বাস ভুলে গিয়ে বিদেশি সংস্কৃতির আরকে মাতাল হওয়া এক ধরনের বিকার, একটা রোগ। এ রোগ একটা দেশকে মানসিক দাসত্বে আবদ্ধ করে রেখে দিতে পারে। আজন্ম। তাই রক কনসার্ট এদেশে মানবাধিকারের বাণীর বদলে রক কালচারই বেশি প্রচার করে যেতে পারল। আর এদেশের শ্রোতা ও দর্শক নিজস্ব মানসিক দাসত্বের প্রমাণ আরও স্পষ্ট করে তুলে দিল বিদেশির হাতে। কী ভয়ংকর একটা চারিত্রিক অক্ষমতা। তাই গণতান্ত্রিক, আর মানবিক অধিকারগুলো দিনের পর দিন ক্ষুণ্ণ হতে থাকবে, কিন্তু ওই উন্মত্ত দর্শকবৃন্দ নির্বাক থেকে যাবে। কেননা তাদের হৃদয়ে বিদেশি অপসংস্কৃতি পুজো পায়, দেশি কোনও কিছুই না। আমরা যারা এরকম একটা অবস্থায় আমাদের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ বলে মনে করি তাদের দরকার নিজেদের ভাবধারণা আরও সোচ্চার করা। এদেশটা দেউলে শাসকশ্রেণীর নয়, ভারতবাসীর। □

পথচলতি

একটি স্বপ্নের জন্য

শনি এবং রবিবারের সকালটা বাদ দিয়ে প্রতিদিন সকালেই তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন। মৌলালির মোড়ে। প্রজ্ঞানানন্দ ভবন থেকে কিছুটা সামনে এগিয়ে, সর্পিল ট্রাম লাইন যেখানে বাঁক নিয়েছে আরো দূর নিরুদ্দেশের জন্যে, যার নাম ধর্মতলা অথবা পার্ক সার্কাস। তাঁর এই দাঁড়িয়ে থাকা অবিচল, স্থির, অকম্প। তখন অফিস যাওয়ার তাড়া। লাল কালির হাতছানি, যেন অশালীন কৌতুকের মতো। তবু, ট্রামে-বাসে বাদুড়ঝোলা মানব-মানবী ভ্রূ-পল্লবে আনে বিস্ময়, পাশের সংগী অথবা সঙ্গিনীকে ডেকে বলে, দ্যাখো, দ্যাখো, সেই যে বলেছিলাম...

বিস্মিত মানুষরা দেখে, দাঁড়িয়ে থাকা একটি স্থির পোস্টার –

আমাদের সবার
সব সন্তানকে
সমানভাবে লালন-পালন করতে
সচেষ্ট হলে বিপ্লব আসবে।

তাঁর নাম সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়। থাকেন হাওড়ায়। বয়সের হিসাবে তিনি যুবক অথচ চোখে-মুখে গাঢ় প্রজ্ঞার ছাপ। কয়েক বছর আগে হঠাৎই তাঁর মনে হয়, 'প্রগাঢ় অন্যায় কোনো ঘটে গেছে মনে হয় যেন/কিছু কি দেবার কথা কিছু কি করার কথা ছিল ?'
এই দেশ, এই সমাজের জন্য, হয়তো বা তাঁরও কিছু করার আছে।

ফটো : ইকবাল দরগাই



কী করা যায়, কী করলে অন্তত একটি মানুষও সচেতন হবে – এইসব ভেবেই তিনি তৈরি করলেন পোস্টারটি। তারপর থেকেই তাঁর দাঁড়িয়ে থাকা, সম্পূর্ণ একা, ব্যক্তিগত উদ্যোগেই, সেই বিজ্ঞাপন নিয়ে। মানুষেরা যায়, আসে। চলমান স্রোতের সামনে একা, অবিচল দাঁড়িয়ে থাকেন যুবকটি, একটি স্বপ্নের জন্যে।

বিমলেন্দু চৌধুরী

অম্লমধুর



শিক্ষকেরা পিতার মতন
প্রাণের আপন জন,
ছাত্ররা সব ছিল যেন
সাত রাজারই ধন।
কালের হাওয়া গায়ে লেগেছে
দুঃসময়ের শুরু !
শিক্ষকেরা ভয়ে ভয়ে
ছাত্ররে কন 'গুরু !'

শৈলেন্দ্র হালদার

নেহাৎ কিছু
কাহিনী লিখেছে অল্প
তাতেই বেরোয়
গ্রন্থ – 'শ্রেষ্ঠ গল্প'।
গুটিকয় যদি
পদ্য লিখেছে, কবি তা
অমনি ছাপায়
গ্রন্থ – 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'।
শুরুতেই শেষ –
বেরোয় এদের 'শ্রেষ্ঠ' !
বাঁচাও এদের
হে হরি, মাধব, কেষ্ট !!

সুদেব বকসী

মন্ত্রী যা সব বিবৃতি দেন
রাইটার্সে বসে,
হেডলাইন-টা পেয়ে খবর
হয় তা অনায়াসে।
জ্যোতিবাবুর ধমক খেয়েই
কণ্ঠ যে হয় নরম,
বলিনি যা তাই লিখেছে
সাংবাদিকের কলম।

শফিরুল হক



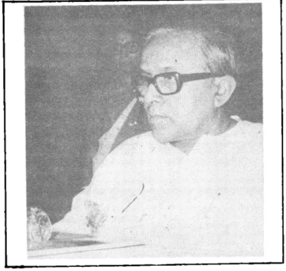
নাক বাড়িয়ে ঝামা
খসল জাতির মামা
মানহানি বিল বেজায় ভারি
কাঁধের থেকে নামা।
কলম দিল ঠেলা
পালায় পঞ্চা প্যালা –
পারলি না মল পরিয়ে দিতে
লোক হাসালি মেলা।

তারাশংকর ভট্টাচার্য

কার্টুন : উদয়শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়

জ্যোতি বসুর ইমেজ নষ্ট হলে সি পি আই (এম)-এ ধস নামবে

নিশীথ দে



জ্যোতি বাবুর ইমেজই বামফ্রন্টের রক্ষক

সূত্রপাত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু-পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীর মধ্যে বিরোধ নিয়ে। আজকে সেই বিরোধ আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে মিটে গেছে। হয়তো বিরোধ মিটে যাবে কিংবা ধামাচাপা পড়বে। কিন্তু এই বিরোধ থেকে দাঁড়িয়েছে একটা সঙ্কট। আর এই সঙ্কট হল বামফ্রন্টের ইমেজ নিয়ে।

এগার বছর আগে বামফ্রন্টের যে ইমেজ ছিল আজ তা নেই। এগার বছর আগে বামফ্রন্ট বিভিন্ন নির্বাচনে যত আসন এবং ভোট পেয়েছিল, আজকে তার চেয়ে অনেক বেশি ভোট পেয়েছে, আসন পেয়েছে। বিধানসভা থেকে স্কুল কমিটি, এমনকি পাড়ার পুজো কমিটিতেও বামফ্রন্ট বিশেষ করে সি পি আই (এম) সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু বামফ্রন্টের সেই ইমেজ কি আছে?

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, বামফ্রন্টের ইমেজের মূলে জ্যোতি বসু। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর জ্যোতিবাবু রাজনীতিতে যুক্ত। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী আন্দোলনের সবচেয়ে বলিষ্ঠ নেতা জ্যোতি বসু। কংগ্রেস-বিরোধী নেতা, বামপন্থী নেতার ইমেজই মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সম্বল।

দীর্ঘ এগার বছরে বামফ্রন্ট সরকারের অবদান কম নয়। কিন্তু ব্যর্থতাও কম নয়। সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা, বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়নের সম্ভাবনা নষ্ট করেছে। প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে – রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যন্ত দুর্নীতি বেড়ে চলেছে। স্বজনপোষণ, পক্ষপাতিত্ব, দলবাজি বেড়ে চলেছে।

অনেক মন্ত্রী, এম এল এ, এম পি, পঞ্চায়েত এবং পুরসভার কর্মকর্তা পার্টির নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, দলবাজির অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু তাতে বামফ্রন্ট সমর্থকরা হতাশ হননি। আজকে জ্যোতিবাবুকে নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠছে তখন সাধারণ মানুষ হতাশ হয়ে পড়ছেন। তার কারণ আর কিছুই নয়, জ্যোতি বসু বলেই।

সি পি আই (এম) নেতারা যে যতই চিৎকার করে বলুন, আমরা যৌথ নেতৃত্বে চলি, পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলি – আজকে এটা জলের মত পরিষ্কার, জ্যোতি বসুর সিদ্ধান্তই পার্টির সিদ্ধান্ত। জ্যোতি বসুর ইমেজই পার্টির ইমেজ তৈরি করেছে। জ্যোতিবাবুর ইমেজ নষ্ট হলে পার্টির প্রভাবে ধস নেমে যাবে।

এটা পার্টির নেতারাও জানেন। বিশেষ করে যাঁরা মন্ত্রিসভা, পুরসভা, পঞ্চায়েত, বিভিন্ন সরকারি – আধা সরকারি সংস্থায় ক্ষমতা ভোগ করছেন তাঁরা ভালভাবেই জানেন, জ্যোতি বসুর পতন তাঁদের অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দেবে।

সি পি আই (এম)-এর সংগঠন অন্তত পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্ট শক্তিশালী। কিন্তু এগার বছর ক্ষমতায় থাকার পর যে কোন দলে বুর্জোয়া ভাইসেস মাথাচাড়া দেয়। সি পি আই (এম)-এর শক্ত ভিত আগে ছিল শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে, আজকে দাঁড়িয়েছে গ্রামের গরিব ক্ষেত মজুরদের মধ্যে। আগেও ছিল পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি, আজকেও তাই। সি পি আই (এম)-এর এবং অন্যান্য বামপন্থী দলের নেতৃত্ব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দখলে। এই মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতির গন্ডির বাইরে যেতে পারে না।

বিরোধী দলে থাকার সময় সি পি আই (এম) মূলত কংগ্রেস-বিরোধী রাজনীতিকে সম্বল করেই এগিয়েছে। শ্রমিক-কর্মচারীরা সামিল হয়েছিলেন কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে। বেতন-ভাতা-বোনাসের লড়াই-এর মধ্যে দিয়ে শ্রমিক কর্মচারীরা আর্থিক দিক থেকে লাভবান হয়েছেন। সি পি আই (এম)-এর মূল শক্তি ছিল সুবিধেবাদী ট্রেড ইউনিয়ন নীতি।

সেদিন সি পি আই (এম) সুবিধেবাদী রাজনীতি, সুবিধেবাদী ট্রেড ইউনিয়নের স্বার্থে শিল্পে আধুনিকীকরণ, অটোমেশন, কমপিউটারাইজেশন এবং র‍্যাশনালাইজেশনের বিরোধিতা করেছে। শিল্পের সমস্যা, শিল্প-বিকাশ, আধুনিক শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করেছে।

আজ সি পি আই (এম)-এর কাছে উভয় সঙ্কট – সামগ্রিক স্বার্থ-বিরোধী শ্রমিক আন্দোলনের বিরোধিতা করতে পারছে না, অন্যদিকে শিল্প-মালিকদের উদ্যমকেও প্রকাশ্যে সমর্থন করতে পারছে না, যে কারণে একদিকে বিভিন্ন শিল্প সংস্থা শ্রমিক ইউনিয়ন হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে শিল্প সংস্থার মালিকরা বামফ্রন্ট সরকারের ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না। সি পি আই (এম)-এর অবস্থাটা শাঁখের করাতের মত।

এটা একটা দিক। আর একদিকে

বুর্জোয়া ভাইসেস-এর জন্য দুর্নীতি মাথাচাড়া দিচ্ছে। আন্দোলনের বদলে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি

করে পার্টি বাড়াতে হচ্ছে। যাঁরা ক্ষমতার দৌলতে কিছু পাচ্ছেন তাঁরা নিজেদের স্বার্থেই সি .পি আই (এম)-কে বাঁচাতে শুধু নয়, এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সমস্ত বুর্জোয়া পদ্ধতি গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছেন। কারচুপি, জালিয়াতি, সন্ত্রাসের পথ ধরে জনসমর্থন বাড়ছে, আর জনসমর্থন যে বাড়ছে সেটা প্রমাণ করার জন্য তাঁরা সবসময় সতর্ক।

সাধারণ মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে ক্ষমতাসীন সি পি আই (এম)-এর একটা বড় অংশ শুধু নবীন নয়, বহু প্রবীণ নেতাও আজকে দুর্নীতিগ্রস্ত। পঞ্চায়েত, পুরসভা, মন্ত্রিসভা – সর্বত্র এই দুর্নীতি বাড়ছে।

তবু এতদিন সাধারণ মানুষ জ্যোতিবাবুকেই দক্ষ প্রশাসক, বলিষ্ঠ নেতা এবং কংগ্রেস-বিরোধী আন্দোলনের অগ্রণী নেতা বলে জেনে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের বিকল্প নেই। বিরোধী দল হিসাবে কংগ্রেস সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কংগ্রেসের চরম ব্যর্থতাই বামফ্রন্ট এবং সি পি আই (এম)-এর সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার।

পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতি বসুর কোন বিকল্প নেই। বিকল্প শুধু কংগ্রেস দলেই নেই যে তা নয়, বিকল্প সি পি আই (এম) দলেও নেই। সি পি আই (এম)-এর জনাকয়েক নেতা এবং মন্ত্রীর ক্ষমতার দৌলতে কথাবার্তা, চালচলন বদলে গেছে, দাম্ভিকতা-অহমিকা বেড়ে গেছে। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে রাইটার্স বিল্ডিংস – সব জায়গায় অসংখ্য জ্যোতি বসু গজিয়ে উঠেছে।

আজকে সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে, জ্যোতি বসু কি সাচ্চা কমিউনিস্ট? জ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রিত্বের ক্ষমতাকে কি তাঁর আত্মীয়-স্বজন কাজে লাগাচ্ছেন না? জ্যোতি বসু কি সত্যিই দুর্নীতি দমনে আগ্রহী? জ্যোতিবাবু কি মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন না? কিংবা তিনি নিজে কি অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধে ভোগ করছেন না?

এসব প্রশ্ন নিয়ে সি পি আই (এম)-এর লোকেরাও চিন্তিত। যাঁরা ক্ষমতার দৌলতে ছড়ি ঘোরাচ্ছেন তাঁরা জানেন, জ্যোতি বসুর ইমেজই তাঁদের প্রোটেকশন দিচ্ছে। আর যাঁরা পার্টির নিষ্ঠাবান, সৎ নেতা ও কর্মী তাঁদের আশঙ্কা, জ্যোতিবাবুর ইমেজ নষ্ট হলে পার্টিতে ধস নেমে যাবে। □



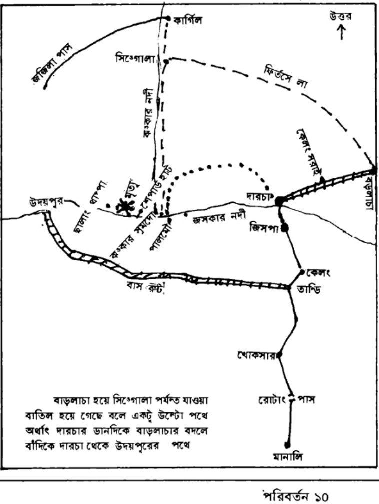
ট্রেকিং, না মৃত্যু আলিঙ্গন

পর্বতাভিযান বা ট্রেকিং সারা বিশ্ব জুড়ে এর জনপ্রিয়তা। প্রতি বছর হিমালয়ে একাধিক অভিযান সংগঠন করা হয়। কিন্তু অভিযোগ এইসব অভিযানের অধিকাংশই আধা অপেশাদারিত্ব মনোভাবে গড়ে ওঠে। ফলে দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। অতি সম্প্রতি বেহালার ৬টি তাজা প্রাণের আহুতি হল লাহুলে । অনুসন্ধান করেছেন প্রদীপ দে।

প্রিয় আদরিণী, আবার কেন ডাকো? তুমি তো জানো আমি তোমার রূপে পাগল। তুমি আদরিণী। মায়াবিনী। তবু তোমার ডাকে সাড়া না দিয়ে আমি থাকতে পারি না। কিন্তু আশ্চর্য হই তখন, যখন ভাবি তুমি একজন স্বর্গবাসী হয়েও সামান্য এক মর্তবাসীর প্রেমে কেন পাগল? তুমি যে কি? তা এখনও বুঝে উঠতে পারলাম না। সত্যি রূপসী, তুমি যাদু জানো। তোমার ডাক শুনলেই পদযুগল বাস্ত হয়' তুমি আলেয়ার মত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াও। সবই রহস্য। তবু রূপসী চলেছি তোমার ডাকে। তোমার কাছে......

না, এটা কোনো প্রেমিকের প্রেমপত্র নয়। এটা পাহাড়ের প্রেমপত্র। একেই বলে পাহাড়ের প্রেম এবং এই প্রেমেই পাগল হয়ে যায় হাজার হাজার মানুষ। ছুটে যায় পাহাড়ের কোলে। একদিকে মৃত্যু। আরেকদিকে জীবন। মাঝখানে পাহাড়। জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে এই পাহাড়ের এক অজানা আনন্দ। এই অজানা আনন্দকে জানতে গিয়েই কেউ ফিরে আসে সুখের স্মৃতি নিয়ে। আবার কেউ ফিরে আসে দুঃখের স্মৃতি নিয়ে। এহেন দুঃখের স্মৃতি নিয়েই ফিরে এলেন বেহালার সরশুনার হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সুবীর চন্দরায়। লাহুলের বুকে রেখে এলেন প্রাণের ৬ বন্ধুকে। কথা ছিল ১৩ সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকে লাহুল উপত্যকা ঘুরে এই কলকাতায় ৬ অক্টোবর ফিরে আসার। কথা রাখেনি ৬জন। ফিরে এলেন শুধু সুবীর। এবারের দুর্গাপুজোর বোধনের দিন বিসর্জন হল ৬জনের প্রাণহীন দেহ।

আসলে কথা কী ছিল? প্রশ্নটা হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি দেবকুমার ব্যানার্জিকে করার সংগে সংগে জানালেন – আমারও এই অভিযানে যাবার কথা ছিল। প্রথমে ঠিক ছিল ১৫জন যাবে। তারপর নানা কারণে সংখ্যাটা কমে ৭জনে দাঁড়ায়। প্রথমে ঠিক ছিল দারচা থেকে বাড়লাচা হয়ে ফির্টসে পাস ধরে সিংগোলা হয়ে আবার হেঁটে দারচা ফিরে আসার। কিন্তু আমার ৭ বন্ধু দারচায় পৌঁছে দেখেন বাড়লাচা পর্যন্ত বাস যাচ্ছে। ১৮ সেপ্টেম্বর দারচা থেকে বাসে উঠে বাড়লাচায় পৌঁছেই ১৯ সেপ্টেম্বর ৭ বন্ধুরই শরীর খারাপ হয়ে যায়। ফলে বাড়লাচা থেকে আবার সবাই বাসে করেই ২০ সেপ্টেম্বর দারচা ফিরে আসেন। এই দারচাতেই সুবীরের প্রচণ্ড শরীর খারাপ হওয়ার ফলে সুবীর ২০ তারিখেই সোজা মানালিতে ফিরে আসেন। তখন দলনায়ক অমিত দাস ঠিক করেন পূর্বনির্ধারিত ট্রেকিং অর্থাৎ বাড়লাচা হয়ে সিংগোলা পর্যন্ত যাওয়া বাতিল হয়ে গেছে বলে একটু উল্টো পথে অর্থাৎ দারচার ডানদিকে বাড়লাচার বদলে বাঁদিকে উদয়পুরের পথে যাওয়া হবে কদমভ্যালি ধরে। সেই অনুযায়ী ২০ তারিখ সকালে দারচা থেকে ট্রেকিং শুরু হয়। প্রথম ক্যাম্প হয় পালামোতে। তারপর দ্বিতীয় ক্যাম্প হয় জাসকর সুমদোতে ২১ তারিখ রাত্রে। ২২ তারিখ সকালে জাসকর সুমদো ক্যাম্প ছেড়ে বেরোবার পর থেকেই দুর্যোগ শুরু হয় এবং ২২ তারিখ রাত্রি থেকে প্রচণ্ড তুষার ঝড় শুরু হয়। তারপর থেকে সব যোগাযোগ ছিন্নভিন্ন। প্রথমে দলনায়ক অমিত দাসের শরীর খারাপ হয়। ২২ তারিখে প্রচণ্ড তুষার ঝড়ের মধ্যেই সারারাত ধরে অমিতকে সুস্থ করার চেষ্টা হয়। কিন্তু অমিত ক্রমশই অসুস্থ হতে থাকেন। বাকি সদস্যরা একটু নার্ভাস হয়ে পড়েন। প্রচণ্ড ঠান্ডার (মাইনাস ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) হাত থেকে অমিতকে বাঁচানোর জন্যই হয়তো ২৩ তারিখ সবাই তুষার ঝড়কে উপেক্ষা করেই ফিরে আসতে চাইছিলেন। কিন্তু ফিরে আসা আর হল না। একে একে সবাই দু-তিন ফুট বরফের তলায় হারিয়ে গেল। পরে দেহগুলি খুঁজে পাওয়া যায় জাসকর সুমদো এবং ছালাং তাম্পা নালার কাছাকাছি। তবে সবচেয়ে রহস্য লাগছে ৪জন কুলি এবং ১জন গাইডের আচার আচরণে। কারণ যে অঞ্চলে ৬জন মারা গেছেন সেই জাসকর সুমদো থেকে মাইল-খানেকের মধ্যে একটা লেপার্ড হাট অর্থাৎ ভেড়াওয়ালাদের ঘর আছে। সেখানে গিয়ে কুলি এবং গাইডরা বেঁচে গেল। তাহলে ৬জন অভিযাত্রীকে বাঁচানো হল না কেন? কুলিরা নাকি ২৫ সেপ্টেম্বর সকালে তুষার ঝড় কমে যাওয়ার পর অভিযাত্রীদের অবস্থা দেখতে গেছিল। তাহলে নিশ্চয় কুলিরা পালিয়ে আসার আগে সব অভিযাত্রীরা বেঁচে ছিল। তা না হলে আবার দেখতে গেল কেন? বেঁচে ছিল বলেই হয়তো কুলিরা দেখতে গেছিল! কুলিরা এখন সব অস্বীকার করার চেষ্টা করছে। কিন্তু পর্বতারোহণের নীতি এবং সততার খাতিরে সবই তদন্তসাপেক্ষ। কুলিরা এখন অন্যরকম প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমাদের এখন একটাই প্রশ্ন – তুষার ঝড়ে প্রচণ্ড বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে কুলিরা পালিয়ে গেল কেন? কুলিরা যদি নিজেদের বাঁচানোর মত উপায় জানতে পারে তাহলে কেন অভিযাত্রীদের সেই উপায়ে বাঁচানো গেল না? তবে কি কুলিদের অসহযোগিতাই মৃত্যুর একমাত্র কারণ? সবই এখন রহস্য!



বাড়লাচা হয়ে সিংগোলা পর্যন্ত যাওয়া বাতিল হয়ে গেছে বলে একটু উল্টো পথে অর্থাৎ দারচার ডানদিকে বাড়লাচার বদলে বাঁদিকে দারচা থেকে উদয়পুরের পথে

লাহুলে এহেন আচমকা তুষার ঝড়ে মৃত্যুর রহস্যটা জানার জন্য ছুটলাম বেহালায় তিনবার লাহুলের অভিজ্ঞ অভিযাত্রী দীপক



উদয়পুরের পথে এই ভয়ংকর ঝংকার সুমদোতে মৃত্যু হয়েছে

সরকারের কাছে। পাহাড়ের প্রেম যে কি জিনিস, দীপকবাবুর একচিলতে ঘরে ঢুকেই বুঝতে পারলাম। চারদিকে শুধু পাহাড়ের বই আর সরঞ্জাম। পাহাড়ের প্রেমে পড়ে দীপকবাবুর আর এ জীবনে অন্য কাউকে প্রেম বা বিয়ে করা সম্ভব হয়নি। প্রায় তিরিশ বছর ধরে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। এহেন দীপকবাবুর সংগে শুরু হল পাহাড়ী গল্প। প্রশ্ন করে বসলাম – লাহুলের এই আচমকা তুষার ঝড়ের মৃত্যুর আসল রহস্যটা কি?

দীপকবাবু রীতিমত পাহাড়ী তৎপরতায় রহস্যের কিনারা খুঁজতে শুরু করলেন – লাহুল উপত্যকায় আমার ইতিমধ্যেই তিনবার অভিযান হয়ে গেছে এবং প্রতিবারই প্রায় তুষার ঝড়ের মুখে পড়তে হয়েছে। ১৯৭৪-এর সেপ্টেম্বরে তুষার ঝড় ছাড়াই শুধু হাওয়ার দাপটে আমাদের জিসপা ডাক-বাংলোর বাথরুমের দরজা বন্ধ করে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। বুঝুন অবস্থা। আসলে এই জিসপা অঞ্চলে একটা ভূতুড়ে হাওয়া আছে এবং যে রোটাং পাস ধরে লাহুলে যেতে হয় সেই রোটাং শব্দের তিব্বতী মানে হল 'মৃত্যুর স্থান'। অতএব রোটাং পাসের ভয়াবহতা সহজেই অনুমেয়। অথচ এই রোটাং পাস ধরেই লাহুলে যেতে হয়। এছাড়া ১৯৭৬-এর সেপ্টেম্বরেও আমরা লাহুলের সোরা-উংগলাতে প্রচন্ড তুষার ঝড়ে পড়েছিলাম। তবে এবারে বেহালার সরশুনার হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশানের যে ৬জন অভিযাত্রীর মৃত্যু-ঝংকার সুমদো অঞ্চলে হয়েছে সেখানে গেছিলাম ১৯৭৯-র জুনে। এই ঝংকার সুমদো অঞ্চলে এবং জাসকর নদীর পাশে একটা ভূতুড়ে হাওয়া আছে। এই ভূতুড়ে হাওয়ার প্রচন্ডতার জন্যই গাছপালা তেমন নেই। ফলে বৃষ্টিও খুব কম হয় এবং বারো মাসই এখানে প্রচন্ড গতিতে হাওয়া ঘুরপাক খায়। হাওয়াটা জাসকর নদীর পাশ ধরে দারচার কাছে মুলকিলায় ধাক্কা খেয়ে আবার ঘুরে আসে। ফলে এই হাওয়াটা একটু ভূতুড়ে হয়ে ঘুরপাক খায়। এই ভূতুড়ে হাওয়াটার জন্যই তুষার ঝড়ের প্রচন্ডতা ভয়ংকর হয়ে ওঠে। ঝংকার সুমদোর পরেই ঠিক যে অঞ্চলে ওরা মারা গেছে সেখানে দুদিকেই পাহাড়। মাঝখানে একটা বিশাল গলি। এই গলি ধরেই উদয়পুরের দিকে যেতে হয়। কাছে-পিঠে তেমন কোন বড় গুহা নেই। শুধু পাথর আর বরফ। তবে ঝংকার সুমদোর ঠিক উপরেই মাইলখানেকের মধ্যে স্থানীয় ভেড়াওলাদের দুটো ছাউনি ছাড়া (বৃষ্টি হয় না বলে) পাথরের ঘর বা আস্তানা আছে।

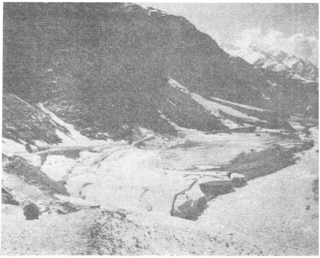
১৯৭৯-এর জুনে মানালি থেকে হেঁটে ঐ পথ ধরে যাবার সময় একটা রাত ঐ ঘরে আমরা কাটিয়েছিলাম। এই ঘরটাকে ঘিরেই এখন রহস্যের দানা বাঁধছে। কারণ কুলিদের রিপোর্ট অনুযায়ী ৪জন কুলি এবং ১জন গাইড তুষার ঝড়ের সময় ঐ ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে কুলিরা যদি ঐ ঘরে আশ্রয় নিয়ে বাঁচতে পারে তাহলে ৬জন অভিযাত্রীকে বাঁচানো গেল না কেন? তাহলে কি কুলিরাই অভিযাত্রীদের ফেলে পালিয়ে গেছিল বলেই বাঁচানো যায়নি? নাকি অভিযাত্রীরা কুলিদের কথা শোনেনি বলেই এই মৃত্যু? এইসব প্রশ্নের উত্তর এই মুহূর্তে দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ ব্যাপারটা এখন সম্পূর্ণ তদন্তসাপেক্ষ। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি – মানালি অঞ্চলের কুলিরা প্রচন্ড অসহযোগী। অর্থাৎ সবসময় বিপদের মুখে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় না। কারণ ১৯৭৬-এর সেপ্টেম্বরে এই লাহুলেই ছোটা শিকরি হিমবাহে আমরা প্রায় ৬দিন ধরে প্রচন্ড তুষার ঝড়ের মুখে পড়েছিলাম। প্রথমে

সোরাউংগলাতে একটা ক্যাম্পে প্রায় ৪৮ ঘণ্টা তুষার ঝড়ে আটকে গেছিলাম। ৪৮ ঘণ্টার পর একটু আকাশ পরিষ্কার হতেই আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম। ছেতরু ক্যাম্প ছেড়ে চার/পাঁচ কিলোমিটার যাবার পর আবার তুষার ঝড়। ফলে ফুটরুনিতে একটা ক্যাম্প করতে হল। প্রায় ·২৪ ঘণ্টা তুষার ঝড়ের পর আবার বেরিয়ে পড়লাম। চার/পাঁচ কিলোমিটার হাঁটার পর আবার তুষার ঝড়। ছোটাধারায় একটা ক্যাম্প করতে বাধ্য হলাম। প্রথম ৪৮ ঘণ্টা তুষার ঝড়ে আটকে পড়লাম। সারা রাত ধরে শুধু বরফ আর বরফ। ১০/১৫ মিনিট অন্তর ক্যাম্পের বাইরে বেরিয়ে ছাউনির বরফ পরিষ্কার করতে হচ্ছিল। এহেন ভয়াবহ অবস্হায় হঠাৎ শুনলাম আমাদের ১৮জন কুলির মধ্যে ৭জন কুলি পালিয়েছে। সেই থেকেই বুঝে গেছিলাম মানালির কুলিরা কিরকম অসহযোগী! আমরা স্বীকৃত কুলি সংস্হা থেকে কুলি নেওয়ার পরেও এরকম দারুণ সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। অতএব বেহালার ৬জন অভিশপ্ত অভিযাত্রীদের ক্ষেত্রে কুলিদের অসহযোগিতা সহজেই অনুমেয়। তাই অনেকেই এখন মানালি কুলিদের 'লাটসাহেব' কুলি বলেন। কুলিদের এহেন অসহযোগিতাও এখন তদন্তসাপেক্ষ। এরকম অসহযোগী কুলিদের অবশ্যই সরকারি শাস্তি দরকার। কারণ অভিযাত্রীদের মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়ে পালিয়ে আসাটা অমার্জনীয় অপরাধ। এক্ষেত্রে আবার উল্টো প্রশ্ন উঠতে পারে – অভিযাত্রীরা কি কুলিদের কথা শোনেনি? অবশ্যই উত্তরটা প্রমাণসাপেক্ষ। যদি অভিযাত্রীদের অবাধ্যতা প্রমাণিত হয় তাহলে পাহাড়ী নীতি অনুযায়ী অভিযাত্রীদেরই অভিযুক্ত হওয়া উচিত। কারণ পাহাড়ী নীতি অনুযায়ী বেশি উচ্চতায় সবরকম কুলি এবং গাইডের কথা বা পরামর্শ শোনা উচিত।



দারচা থেকে এই পথ ধরেই যেতে হয়েছিল

ছবি : দীপক সরকার



জাসকর নদীর বা পাশের আইসব্রিজ পেরিয়েই তুষার ঝড়,

মৃত্যুর পর মৃত্যু

পাহাড়ের ডাক এমনই যে একবার সাড়া দিলে আর ফেরা যায় না। বেহালার ৬জন বন্ধুকে লাহুলের বুকে হারিয়ে আসার পরেও একমাত্র জীবিত সদস্য সুবীরচন্দ্র রায় ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন – আবার সামনের বছর পাহাড়ে যাব । অর্থাৎ 'ভয়' শব্দটা পর্বতারোহীদের অভিধানে নেই। পাহাড়ের ডাকে ভয়ের আদৌ চিহ্ন নেই তার প্রমাণও পাওয়া গেছে প্রথম বাঙালি হিসাবে গৌরাঙ্গসুন্দর চৌধুরী গঙ্গোত্রীর বুকে ১৯৬৫ সালে হারিয়ে যাওয়ার পরেও ছোট ভাই গণেশ চৌধুরী এখনও প্রতি বছর পাহাড়ের ডাকে হিমালয়ে অভিযান করেন। অদ্ভুত সাহস! গণেশের মুখেই শুনছিলাম – গঙ্গোত্রীর বুকে দাদা গৌরাঙ্গসুন্দরের হারিয়ে যাওয়ার কাহিনী। গঙ্গোত্রী অভিযান সেবার সফল হয়ে যাবার পর ফেরার পালা। বিজয়ী পর্বতারোহীরা তখন ফেরার আনন্দে পাগল। হঠাৎ গৌরাঙ্গসুন্দরের মনে হল এই অজানা আনন্দের ছবি দু-চারটে ক্যামেরায় তুলে রাখা ভাল। হাতে ক্যামেরা নিয়ে ক্যাম্প থেকে বেরোলেন। আর ফিরলেন না ক্যাম্পে। হঠাৎ একটা তুষার ফাটলে হারিয়ে গেলেন গৌরাঙ্গসুন্দর। সবাই ফিরলেন। ফিরলেন না শুধু চুঁচুড়ার গৌরাঙ্গসুন্দর। এতে থমকে যায়নি বাংলার ছেলেমেয়েদের পর্বতাভিযান। একদা ভারতীয় পর্বতাভিযানের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগের উদ্যোক্তা ছিলেন বাংলার পর্বতারোহীরা। পশ্চিমবঙ্গের পরেই ছিল মহারাষ্ট্র। তারপর গুজরাট, দিল্লি ইত্যাদি। এখনো বাংলাই পর্বতাভিযানে এগিয়ে। শতকরা ৮০ ভাগ থেকে কমে ৬৫ ভাগ হয়ে গেলেও বাংলার পর্বতারোহীর সংখ্যা ও উৎসাহ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ছে। আসলে দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক, মাদ্রাজ, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ কোনদিন পর্বতাভিযানে অংশ নিত না। এখন দক্ষিণ ভারতের ছেলেমেয়েরাও উত্তরের দিকে। তবে পশ্চিমবঙ্গের পর্বতারোহী সংস্হার সংখ্যাটা প্রায় জ্যামিতিক হারে বাড়ছে। ১৯৫৯ – ৬০ সালে যেখানে সারা পশ্চিমবঙ্গে একটি মাত্র মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাব হিসাবে হিমালয়ান অ্যাসোসিয়েশান ছিল এখন সেই ক্লাবের সংখ্যা ১২০ ছাড়িয়ে গেছে। শুধু কলকাতায় প্রায় ৭০টা ক্লাব। ক্লাবের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে দুর্ঘটনার সংখ্যাও। এই লাহুলের বুকেই ১৯৭০ সালের ২৬ আগস্ট কলকাতার 'পথিকৃৎ' পর্বতারোহী সংস্হার মহিলা সদস্যদের মধ্যে সুজয়া গুহ এবং কমলা সাহা হারিয়ে গেছিলেন। ১৯৭৮ সালে হিমালয়ান অ্যাসোসিয়েশানের মহিলা অভিযাত্রী দলের ধরম-সুরা অভিযানে হারিয়ে গেছিলেন ব্রিটিশ মহিলা রুথ মুখার্জি। কুলির সঙ্গে সামান্য মতান্তরের পর নিজের জেদের বশে এগোতে গিয়ে হারিয়ে যান রুথ। ঠিক এরকম নিজের ওপর বেশি আত্মবিশ্বাস দেখাতে গিয়ে ১৯৮৪ সালে কামেট অভিযানে পর্বত অভিযাত্রী সংঘের সুখেন্দু মুখার্জি হারিয়ে গেছিলেন। কামেট অভিযান জয় করে ফেরার পথে মৃত্যু-ফাঁদে আটকে যান সুখেন্দু। একটুর জন্য বেঁচে যান পুলক মজুমদার। ১৯৮৫ সালে গাড়োয়ালের চৌখাম্বারে হারিয়ে গেছিলেন রনো লাহিড়ী। ১৯৮৬ সালে গঙ্গোত্রীতে সরশুনার 'শিখর' পর্বতারোহী সংস্হার অরুণ ঘোষ মৃত্যুর কোলে ভেসে গিয়েছেন। এইভাবেই বছরের পর বছর একের পর এক পর্বতারোহী পাহাড়ের কোলে হারিয়ে গেছেন, তবু বন্ধ হয়নি পর্বতাভিযান। এবছর পুজোর আগে যেমন বেহালার ৬জন হারিয়ে গেছেন তেমনি ঠিক পুজোর সময় আসানসোল পর্বতারোহী সংস্হার দুজন অভিযাত্রী হারিয়ে গেছেন গঙ্গোত্রীতে। পর্বতারোহীরা এই দুর্ঘটনার পর দুর্ভাবনায় ভেঙে পড়েননি। ভেঙে

লাহুল উপত্যকার দুর্ঘটনার পর দলের একমাত্র জীবিত সদস্য সুবীর রায় তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন আমাদের প্রতিনিধিকে

আমি তখন মানালিতে। শান্তিনিকেতন হোটেলে। ১ অক্টোবর বিকালে পিকাডেলি হোটেল থেকে খবর এল, ডি সি কেলং আমাকে মানালি থানার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছে। আমাদের পার্টির নাকি কোন একটা দুর্ঘটনা হয়েছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে থানায় যোগাযোগ করলাম। গিয়ে জানলাম, মানালি থানা তখনো কোন খবর পায়নি এ বিষয়ে। আমি ওদের দুর্ঘটনার কথাটা বললাম এবং রিপোর্ট করতে চাইলাম। থানা কিন্তু রিপোর্ট নিতে রাজি হল না। বলল, যতক্ষণ না কেলং থেকে সরাসরি ওদের কাছে কোন খবর আসছে ততক্ষণ ওরা কোন রিপোর্ট বা অ্যাকশন নেবে না। তবে ওরা আমাকে পরের দিন যেতে বলল। কিন্তু সেদিনই রাত সাড়ে ১১টায় ওরাই আবার আমাকে ফোনে জানাল, আমাদের দলের ছজনেরই মৃত্যু হয়েছে দুর্ঘটনায়।

সেদিন রাতেই আমাদের দলের কুলিদের একজন মানালিতে ফেরে। তাকে জিগ্যেস করে জানতে পারি, প্রচণ্ড বরফ পড়ছে দেখে সে রেসকিউ পার্টির জন্য নিচে নেমে এসেছে। সে জানে না দলের অন্যান্যরা কী অবস্থায় আছে। এর মধ্যে মানালি থেকে আমাকে বলা হয় ডি সি কেলং-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে। তখনও কিন্তু আমার মনে হয়নি, ছজনই মারা গেছে। কারণ ১ তারিখেই আমি দুরকম খবর পাই – একটিতে কেবল দুর্ঘটনার কথা, অন্যটি ছজনেরই মৃত্যু। মানুষের মন আশাবাদী। তাই হয়ত আমার মনে তখনও আশা ছিল ওদের জীবিত দেখতে পাওয়ার। কিন্তু হায়, মানুষ যা চায়, তাই কী আর হয়? ডি সি কেলং-কে ফোনে পেতেই আসল খবরটা, শরীর হিম করে দেওয়া সেই মৃত্যু সংবাদ পেলাম।

কলকাতায় ফিরে এসে সতীর্থ ছজনের মৃত্যুর ব্যাপারে আমাকে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। যার মধ্যে একটি হল – আমরা কুলি নির্বাচন ঠিকমত করিনি অথবা প্রয়োজনীয় সংখ্যক কুলি নিইনি। ব্যাপরটা একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার।

মানালিতে আমরা পৌঁছই ১৫ সেপ্টেম্বর রাতে। উঠি শান্তিনিকেতন হোটেলে। পরদিন অর্থাৎ ১৬ তারিখ সকালে আমরা শ্রীজ্ঞানচাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। যাঁরা পাহাড় ও পাহাড়ের বই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তাঁদের কাছে জ্ঞানচাঁদের নামটা খুব অপরিচিত হওয়ার কথা নয়। 'ট্রেকিং ইন ইন্ডিয়া' বলে বইটি লিখেছেন এই জ্ঞানচাঁদ এবং মনোহর পুরি। আমরা জ্ঞানচাঁদের কাছে গিয়ে আমাদের রুট সম্পর্কে উপদেশ চাই। সেই সঙ্গে তাঁকে অনুরোধ জানাই কয়েকজন কুলি যোগাড় করে দেওয়ার জন্য। প্রথম বিষয়ে তিনি আমাদের সবুজ সংকেত দিয়ে দেন সঙ্গে সঙ্গেই। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে আমরা গিয়েছি বলেও প্রশ্ন তুলেছেন কেউ কেউ। জ্ঞানচাঁদকে আমরা বিশেষভাবে এ ব্যাপারটাও বলি। তবুও সবুজ সংকেত দিতে কোন দ্বিধা করেন না। কিন্তু কুলির ব্যবস্থা করতে তিনি অপারগ হন। কারণ সেই সময়ে মানালিতে ছিলেন দলাই লামা। ফলে বেশিরভাগ কুলিই তখন দলাই লামার কাছে চলে যান। তবে তিনি আমাদের লাহুল হিমালয়ান এজেন্সির কাছে পাঠান। আর শেষ পর্যন্ত আমরা এখান থেকেই চারজন কুলি ও একজন গাইডকে আমাদের সঙ্গী করি। চারজনের মধ্যে একজন আবার এইচ এ পি অর্থাৎ হাই অল্টিচুড পোর্টার। জ্ঞানচাঁদ আমাদের র‍্যাশন নেওয়ার ব্যাপারেও সাহায্য করেন।

ওই ছজনের মৃত্যুর ব্যাপারে কাউকেই দায়ী করা যায় না বা উচিত নয়। তবে আমার যখন শরীর খারাপ হয় এবং ফিরে আসব ঠিক করি তখন ওদেরও আমি ফিরে আসতে বলেছিলাম। কিন্তু বিধির বিধান খণ্ডায় কে? আর কুলিদের সম্পর্কে বলা যায় ওরা হয়ত চেষ্টা করেছিল দলকে বাঁচাবার, তবে হিমাচল প্রদেশের কুলিরা একটু বেশি পেশাদার হয়ে গেছে। কুমায়ুন বা গাড়োয়ালের কুলিরা এখনও অনেক সরল ও বন্ধুবৎসল। হিমাচলের কুলিরা সেখানে অনেক বেশি শহুরে। □

অনিরুদ্ধ ঘোষ

পড়েছেন পর্বতারোহীর আত্মীয়-শুভানুধ্যায়ীরা। শুভানুধ্যায়ীদের প্রশ্ন – পর্বতাভিযানের নামে কি প্রহসন শুরু হয়েছে? নাকি পাহাড়ের ডাক মানেই মৃত্যুর ডাক?

প্রশ্নের পর প্রশ্ন

সরশুনার হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশানের সহ-সভাপতি দেবকুমার ব্যানার্জিকে প্রশ্ন করলাম – হিমাচল প্রদেশের টুরিস্ট গাইড অনুযায়ী সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে তুষার ঝড় বা অন্যান্য দুর্ঘটনার সম্ভাবনা জানা সত্ত্বেও এই লাহুল অভিযান করা হল কেন?

দেবকুমারবাবু বেশ সহজভাবেই জানালেন – প্রায় বছরদশেক ধরে আমাদের ক্লাব থেকে নানারকম ট্রেকিং হয়েছে। কোনরকম দুর্ঘটনা আগে ঘটেনি। এই প্রথম দুর্ঘটনা ঘটল। তাছাড়া আমাদের ঠিক ছিল ১৩ সেপ্টেম্বর কলকাতা ছেড়ে ৮ অক্টোবর কলকাতায় ফেরা। মানালি থেকে বড়লাচা হয়ে ট্রেকিং করে ৩০ সেপ্টেম্বর মানালিতেই ফিরে আসার কথা। এমনকি ৬ অক্টোবর ট্রেনে ফেরার টিকিট পর্যন্ত কাটা ছিল। অতএব অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেই সব শেষ হয়ে যেত। তাছাড়া আমাদের 'ট্রেকিং শিডিউল' খোদ ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশান অনুমোদন করে তবেই 'হিউম্যান রিসোর্সেস' বিভাগে পাঠানো হয়েছে। অতএব 'ট্রেকিং শিডিউল' নিয়ে বিতর্ক হওয়া উচিত নয়। এর আগে বহুবার সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে লাহুল অভিযান হয়েছে। এবারেই হঠাৎ ২২ সেপ্টেম্বর থেকে প্রচণ্ড তুষার ঝড় শুরু হয়েছিল। সবই কপাল। এই তুষার ঝড়ে আমাদের ৬জন বন্ধু ছাড়াও হিমাচল প্রদেশের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৬৪জন মারা গেছে। এবং গত ৩০ বছরে নাকি এমন ভয়াবহ তুষার ঝড় হয়নি। হিমাচল প্রদেশের রিপোর্ট থেকে সবকিছুই সহজেই অনুমেয়।

– এবারের লাহুল অভিযানের সব অভিযাত্রীই কি অভিজ্ঞ?

– মোটামুটি সবাই বছরদশেক ধরে নানারকম অভিযান করেছে। কিন্তু দুর্ঘটনায় না পড়লে অভিজ্ঞতা হয় না। অথচ আগে দেখা গিয়েছে বহু অভিজ্ঞ অভিযাত্রীও দুর্ঘটনায় হারিয়ে গেছেন। অতএব অনভিজ্ঞতার প্রশ্ন না তোলাই ভাল।

– এই লাহুল অভিযানের জন্য কি কোন সরকারি সাহায্য ছিল?

– এবারের লাহুল অভিযানের জন্য প্রায় ২২ হাজার টাকার মত কেন্দ্রীয় সরকারের 'হিউম্যান রিসোর্সেস' বিভাগ থেকে পাবার কথা। কিন্তু আমরা কোনদিনই টাকার লোভে পর্বতাভিযান করিনি। গত ১০ বছরে মাত্র একবার সরকারি সাহায্য পেয়েছি। সরকারি সাহায্যের নমুনাটা সহজেই অনুমেয়। আসলে পাহাড়ের প্রেম টাকা দিয়ে তৈরি হয় না। সত্যিকারের প্রেমে যত আঘাত করা হয় তত জোরদার হয়। তেমনি পাহাড়ের প্রেমে যত ভয় দেখাবে তত আকর্ষণ বাড়ে।

– লাহুলের এই বিতর্কিত মৃত্যুর জন্য কি সত্যি অনভিজ্ঞতা দায়ী?

দীপকবাবু প্রশ্নের উত্তরটা দেবার জন্য কিছু অভিজ্ঞতার স্মৃতি তুলে উত্তরে জানালেন – এটা খুব সত্যি কথা যে কলকাতায় এখন প্রায় ব্যাঙের ছাতার মত রাতারাতি প্রচুর



ট্রেকিং দলের শিবিরে আলোচনা করছেন অভিযাত্রীরা

পর্বতারোহণ সংস্থা বা ক্লাবের জন্ম হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কটা ক্লাবে সঠিক প্রশিক্ষণ নিয়ে পাহাড়ে পাঠানো হচ্ছে সেটা প্রমাণসাপেক্ষ। অথচ যেকোন 'হাই অলটিচিউড' ট্রেকিং (১২/১৩ হাজার ফুট ওপরে) করার জন্য রীতিমত অ্যাডভান্স ট্রেনিং থাকা দরকার। যদিও ট্রেকিং এর জন্য বেসিক ট্রেনিং যথেষ্ট। তবু অ্যাডভান্স ট্রেনিং থাকা ভাল। প্রসংগত জানিয়ে রাখা ভাল মাউন্টেনিয়ারিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলিতে প্রধানত দুটো কোর্স চালু আছে -

১। বেসিক কোর্স।

২। অ্যাডভান্স মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স।

এছাড়াও দুটো বিশেষ ট্রেনিং দেওয়া হয়-

১। রেসকিউ বা উদ্ধার পদ্ধতি।

২। মেথড অব ইনস্ট্রাকশান।

বেসিক কোর্সে শেখানো হয় - রক ক্লাইম্বিং, আইস ক্র্যাফ্‌টিং, ম্যাপ রিডিং, ক্লাউড রিডিং, সারভাইভাল ক্যাম্পিং ইত্যাদি। এইসব থিওরিটিক্যাল ট্রেনিং ছাড়াও একনাগাড়ে চারদিন ধরে প্র্যাকটিক্যাল ট্রেকিং শেখানো হয়। বেসিক কোর্সের ট্রেনিং মেয়াদ ২৮ দিন। এছাড়া অ্যাডভান্স কোর্সে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় টেকনিক্যাল ক্লাইম্বিং রেসকিউ এবং রিভার ক্রসিং ইত্যাদি। অ্যাডভান্স কোর্সের মেয়াদ ৩২ দিন। এই দুটো ট্রেনিং দেওয়া হয় এখন তিনটি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে। উত্তরকাশী, কাশ্মীর এবং মানালি ইনস্টিটিউটে। এইসব ইনস্টিটিউটে মূলত সেনাবাহিনীর জওয়ানদের ট্রেনিং দেওয়া হয়। ইনস্টিটিউটগুলি সেনাবাহিনীর দ্বারাই পরিচালিত। তবে সাধারণের ট্রেনিং ব্যবস্থাও আছে।

– এই বেসিক এবং অ্যাডভান্স কোর্সে সত্যি কি অভিজ্ঞ হওয়া যায়?

দীপংকরবাবু এই লোক দেখানো প্রশিক্ষণের ব্যাপারেই প্রচন্ড আপত্তি করে জানালেন – পাহাড়ের ব্যাপাটা পুরোপুরি প্র্যাকটিক্যাল। থিওরিটিক্যাল শিক্ষা নেবার সংগে তুষার ঝড়ের অভিজ্ঞতা বা আত্মরক্ষার শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। এই যে ছেলেগুলি তুষার ঝড়ে মারা গেল-তা নিশ্চয় তুষার ঝড়ের কারণে। তুষার ঝড়টা আচমকা হয় না। তুষার ঝড়ের আগে অন্তত ১০/১৫ মিনিট ধরে তুষারের ফুলকি বা গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি হয়। সংগে সংগে আস্তানায় ফিরে যাওয়া উচিত। দিনের পর দিন তুষার ঝড় হলেও ক্যাম্পে থেকেই আত্মরক্ষা করা উচিত। এই অভিজ্ঞতা থাকলে নিশ্চয় ছেলেগুলি পাগলের মত তুষার ঝড় উপেক্ষা করে বেরোবার চেষ্টা করত না। কারণ একবার তুষার ঝড় আরম্ভ হয়ে গেলে আর কিছু করার থাকে না। মুহূর্তের মধ্যে প্রায় দু তিন ফুট বরফ জমে যায়। হাঁটা-চলা প্রায় অসম্ভব এবং এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে গেলে মৃত্যুর মুখোমুখি হতেই হবে। বাঁচার কোন উপায় নেই।

পর্বতারোহণে দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচার উপায় কি?

পর্বতারোহণের অভিধানে একটা কথা বলাই আছে, একটু ভুল করলেই দুর্ঘটনা আর বেশি ভুল করলেই মৃত্যু। পর্বতারোহণে প্রতি মুহূর্তে ভুল হতে পারে। এই ভুল যে যত কম করে সে তত বেশি সফল হয়। যেমন আমার প্রথমেই মনে হয়েছে লাহুল উপত্যকায় সেপ্টেম্বরের শেষদিকে ট্রেকিং করা উচিত নয়। কারণ লাহুলের সিংগোলা থেকে ফেরার দুটো পথই আছে। একটা জজিলা পাস এবং আরেকটি রোটাং পাস। জজিলা পাস সেপ্টেম্বরের শেষ দিকেই বরফের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। আর রোটাং পাস অক্টোবরের মাঝামাঝি বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া হিমাচল প্রদেশের ট্যুরিস্ট গাইডে বড় বড় করে লেখা আছে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর থেকে মে-জুন পর্যন্ত প্রচন্ড 'স্নো-ফল' হয়। তাহলে লাহুলে সেপ্টেম্বরের শেষদিকে ছেলেগুলি গেল কেন? এটাও তদন্তসাপেক্ষ। কারণ সিংগোলা থেকে রোটাং পাস ধরে ৩০ সেপ্টেম্বর ফিরে আসার কথা থাকলেও তুষার

ঝড়ের সম্ভাবনা এসময় পর্যন্ত থাকে। যেকোন 'হাই-অলটিচিউড' ট্রেকিং ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশানের অনুমতিতেই হয়। সেপ্টেম্বরের শেষদিকে লাহুল উপত্যকায় ট্রেকিং-এর অনুমতি না দেওয়াই ভাল। কারণ লাহুল উপত্যকা থেকে 'স্নো-লাইন' খুব কাছে বলেই লাহুল এত আকর্ষণীয়। তেমনি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে সেপ্টেম্বরের শেষে তুষার ঝড়ের জন্য। তাহলে কি পর্বতাভিযানের নামে প্রহসন হচ্ছে? আসলে এদেশে পর্বতাভিযানের যেমন প্রচুর আগ্রহ আছে। তেমনি প্রচুর সমস্যাও আছে। মূলত টাকার সমস্যা। সাজ-সরঞ্জামের সমস্যা। কলকাতায় বহু ক্লাব আছে। কিন্তু পর্বতাভিযানের জন্য সব সাজ-সরঞ্জাম কোন ক্লাবেরই নেই। এই সাজ-সরঞ্জাম কেনার জন্যই ক্লাবগুলির একটা পরোক্ষ চেষ্টা থাকে আই এম এফ কিংবা হিউম্যান রিসোর্সেস বিভাগের অনুমোদিত টাকা থেকে বাঁচিয়ে সাজ-সরঞ্জাম কেনার এবং এই টাকা বাঁচাতে গিয়েই অনেক সময় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। টাকা বাঁচাতে গিয়ে কুলি কম নেওয়া হয়। খাবারও কম নেওয়া হয়। তিনদিনের পথ একদিনে পার হতে গিয়ে সমস্যা হয়। সব সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে যায় যদি টাকার ব্যাপারটা স্বাস্থ্যকর হয়। অনেক ক্লাবেই এরকম অনুমোদিত টাকা বাঁচাতে গিয়ে সমস্যা বাড়াবার একটা প্রবণতা আছে।

সমস্যার পর সমস্যা

পর্বতাভিযানে এখন একটা নতুন সমস্যা হিসাবে দাঁড়িয়েছে 'আলপাইন স্টাইল' অর্থাৎ শেরপা বা গাইড ছাড়াই পর্বতাভিযান। এধরনের পর্বতাভিযান বিদেশে সম্ভব। কারণ সেখানে একা একা পর্বতাভিযান করার মত সবরকম ব্যবস্থা আছে। অথচ এখানে ট্রেকারদের অভিজ্ঞতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুব সীমিত। আজকাল ট্রেকাররা অনেক সময় গাইড ছাড়াই পর্বতাভিযানে যান। ফলে কেউ বিপদে পড়লে উদ্ধার করার লোক থাকে না। গত বছর সান্দাকফুর কাছে টংলুতে একজন ট্রেকার এইভাবেই হারিয়ে যান এবং সারা রাত প্রবল ঠান্ডার চোটে উনি হার্ট-ফেল করেন। অতএব 'আলপাইন স্টাইল' মাথায় রেখে অন্তত হিমালয়ের বুকে পর্বতাভিযান না করাই ভাল। কারণ হিমালয়ের মত প্রতিটি খাঁজে খাঁজে নতুন চ্যালেঞ্জ পৃথিবীর কোন পাহাড়ে বা পর্বতে নেই। বিদেশীরাও তাই হিমালয়ে পর্বতাভিযান করে তবেই নিজেদের সফল পর্বতারোহী মনে করেন। এহেন অবস্থায় হিমালয়কে চ্যালেঞ্জ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

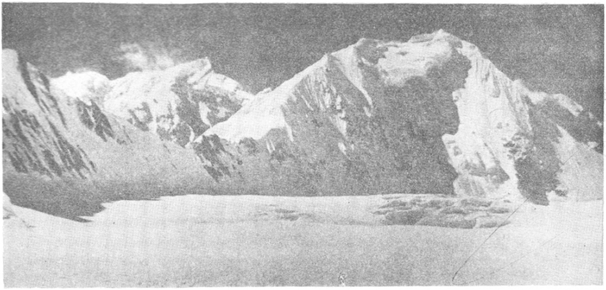
রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের পুরস্কারপ্রাপ্ত পর্বতারোহী অমূল্য সেন জানালেন – এখনকার তরুণ পর্বতারোহীদের মধ্যে কলার





তিনবার লাহুলের অভিজ্ঞ অভিযাত্রী দীপক সরকার

তুলে অনেকটা আলপাইন স্টাইলে পর্বতাভিযান করতে গিয়েই বিপদের সৃষ্টি হচ্ছে। আসলে হিমালয়ে পর্বতাভিযান করার জন্য একটা আলাদা 'অ্যাপ্রোচ' দরকার। এখন অনেকে স্টেশনে গলায় মালা পরেই যেন বিজয়ী বীর হয়ে যায়। মালা শুকোবার আগেই ফিরে আসার চেষ্টা করে। তাড়াহুড়ো করে অন্তত পর্বতাভিযান হয় না। অথচ এখন তাই হচ্ছে। এমনিতেই কলকাতার মধ্যবিত্ত পর্বতারোহীরা 'টেকনিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপড' অর্থাৎ রক ক্লাইম্বিং শ্যু, অ্যাপ্রোচ মার্চ, ক্র্যাম্পন, ফেদার জ্যাকেট, আইস অ্যাক্স, ক্যারাবিনার, পিটন, জুমার, হার্নেস, ম্যাট্রেস ইত্যাদি নিজস্ব কারোর নেই। ধার করে যেতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পর্বতারোহীরা নিজেদের টাকায় অভিযান করেন। মাঝে মধ্যে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার থেকে কিছু টাকা এবং ছুটি পাওয়া যায়। এই টাকা আর ছুটির লোভে পর্বতাভিযান হলে তা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। এছাড়া পর্বতারোহীদের কাছে আরেকটা সমস্যা হল সঠিক মানচিত্র। 'সঠিক মানচিত্র পাওয়া যায় সার্ভে অব ইন্ডিয়াতে। সেখান থেকে মানচিত্র পাওয়া শক্ত। তাই ব্যক্তিগত উদ্যোগে সঠিক মানচিত্র জোগাড় করাটাও একটা সমস্যা। এছাড়াও পর্বতাভিযানের সময় নির্ধারণ সঠিক হওয়া উচিত। হিমালয়ে সাধারণত দুটো সময়ে 'প্রি-মনসুন' অর্থাৎ বর্ষার আগে এবং 'পোস্ট-মনসুন' অর্থাৎ বর্ষার পরে পর্বতাভিযান হয়। বর্ষার আগে সাধারণত 'স্নো-ফল' অর্থাৎ বরফ কম পড়ে। তাই এভারেস্টের দিকে এবং গাড়োয়াল, কুমায়ুনের পর্বতাভিযান এইসময় হয়। এছাড়াও বর্ষার আগে দিনের আলো বেশি পাওয়া যায়। দিনের আলো যত বেশি পাওয়া যায় পর্বতাভিযানে ততই সুবিধা। তাই বেশির ভাগ 'হাই অলটিচিউড' অভিযান

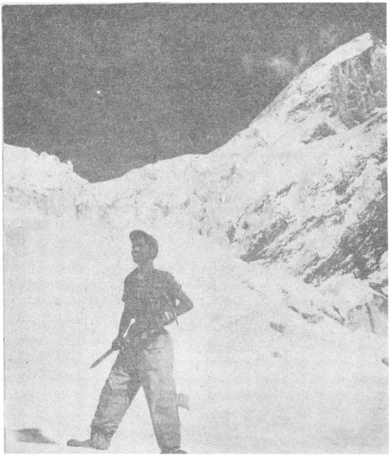


বর্ষার আগেই হয়। আর বর্ষার পরে যেমন আকাশ পরিষ্কার পাওয়া যায়। তেমনি দিনের আলো কমে যায়। এছাড়াও বর্ষার পরে তুষার ঝড়ের একটা ভয় থাকে। এই হিসাব অনুযায়ী লাহুল অঞ্চলে আগস্ট-সেপ্টেম্বরের মধ্যেই অভিযান করা সবচেয়ে ভাল। প্রসংগত জানিয়ে রাখা ভাল – পর্বতাভিযানে দুর্ঘটনা কমানোর জন্য ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশানগুলি কড়া শর্ত আরোপ করতে চাইছে।

১। অভিযাত্রী দলের শতকরা একশো ভাগ সদস্যদের উপযুক্ত ট্রেনিং থাকা চাই। আগে শতকরা ৭০ ভাগ সদস্যের ট্রেনিং থাকলেই চলত।

২। দলনেতা যিনি হবেন তাঁর ২১ হাজার ফুট পিক ক্লাইম্ব করার অভিজ্ঞতা এবং কমপক্ষে তিনটি অভিযানের অভিজ্ঞতা থাকা চাই। সর্বোপরি স্বীকৃত কোন ইনস্টিটিউটের 'অ্যাবাভ অ্যাভারেজ' সার্টিফিকেট থাকা চাই। অমূল্য সেনকে প্রসংগটা তোলার সংগে সংগে উনি জানালেন – ইতিহাস ঘাঁটলে হিমালয়ে অভিজ্ঞ পর্বতারোহীই বেশি হারিয়ে গেছেন। তাছাড়া রাস্তাঘাটে-বাসে-ট্রামে এত দুর্ঘটনা ঘটছে তা বলে কি রাস্তায় বেরনো বন্ধ হবে! তাই পাহাড়ের দুর্ঘটনা নিয়ে এত চেঁচামেচি করার কিছু নেই। উপযুক্ত শিক্ষা এবং উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে সঠিক সময়ে অভিযান করলেই সফল হতে বাধ্য। তবে বিদেশের মত এদেশেও ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশান বা ট্যুরিজম দপ্তর বা রাজ্যগুলি যদি উদ্যোগ নিয়ে কিছু 'গাইড সেন্টার' খোলেন তাহলে অনভিজ্ঞ বা কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পর্বতারোহীদের অনেক সুবিধা হয়। সংগে সংগে বিদেশের মত এখানেও 'রেসকিউ চেক পোস্ট' চালু করা উচিত। ট্রেকিং বা মাউন্টেনিয়ারিং যেভাবে জনপ্রিয় হচ্ছে তাতে রেসকিউ চেক পোস্ট থাকলে রাস্তার সঠিক আবহাওয়া এবং বিপদ থেকে দ্রুত উদ্ধার করা সম্ভব হবে। কারণ এখানকার অনেক অনভিজ্ঞ পর্বতারোহীর আবহাওয়া এবং মানচিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান কম। অথচ পর্বতারোহণে এটাই সবার আগে দরকার। এছাড়া পাহাড়ে 'অলটিচিউড সিকনেস' অর্থাৎ বমি, পায়খানা, মাথার যন্ত্রণা, রাগ, ভুল বকা ইত্যাদি হলে সংগে সংগে ফিরে আসা উচিত। তবে বিপদ যখন আসে তখন বলে আসে না। তাই পাহাড়ের বুকে সব ব্যাপারটাই ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল। □

রাজ্য ক্রীড়াপর্ষদের পুরস্কৃত পর্বতারোহী অমূল্য সেন



ট্রেকিং বন্ধ করার দাবি তোলা অযৌক্তিক

একই বছরে বেশ কিছু দুর্ঘটনা। বেহালার সরশুনার ছ'জন, ভবানীপুরের একজন, আসানসোলের দুজন – এরকম ক্রমবর্ধমান তালিকা নিয়ে এবারের দুঃসংবাদ হাজির। সকলেই হিমালয়ের অদম্য হাতছানিতে তাঁদের অমূল্য জীবনটি বিসর্জন দিয়েছেন। সেই সংগে বেদনার সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছেন তাঁদের পরিবারকে। এর সংগে যোগ হয়েছে বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই দুর্ঘটনাগুলির ব্যাপক ও কিছু মিথ্যা খবর পরিবেশন। ফলে পুজোর আগে ট্রেকিং ও পর্বতারোহণ নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। উঠেছে নানা অভিযোগ। এমন কথাও উঠেছে – এ ধরনের ট্রেকিং বা অভিযান যেন অচিরেই বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ট্রেকিং বা পর্বতারোহণ এক ধরনের স্পোর্টস। এটি অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের অন্তর্গত। এই ধরনের স্পোর্টসে জীবনহানির আশংকা সব সময়েই রয়েছে। যেমন হ্যাং গ্লাইডিং বা স্কাই ডাইভিং-এর ক্ষেত্রেও বিপদের ঝুঁকি নিশ্চয়ই ট্রেকিং-এর থেকে কম নয়। তবুও সারা পৃথিবীতে বহু মানুষ নেহাৎই রোমাঞ্চের স্বাদ পেতেই এই সমস্ত খেলা নিয়ে মেতে থাকেন। আর পাহাড়ের ডাক তো কেবল রোমাঞ্চের জন্যই নয় – সৌন্দর্যের আকর্ষণ বড় কম নয়।

এই ধরনের যেকোন খেলার ক্ষেত্রে প্রাথমিক প্রয়োজন প্রকরণগত শিক্ষা ও সাজসরঞ্জাম। দ্বিতীয়ত অভিজ্ঞতার সংগে সংগে মানের উন্নতি ঘটে এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেই অভিজ্ঞতার মূল্য অপরিসীম। প্রশ্ন উঠেছে, এবারের এই বিপর্যয়, বিশেষত সরশুনার ছজন ট্রেকারের মৃত্যু হয়েছে প্রয়োজনীয় ট্রেনিং ও সাজসরঞ্জামের অভাবে। সে বিষয়ে একটু আলোকপাত করা যাক।

প্রথমে আসা যাক সরশুনার সরকার হাটের হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের যে কজন হিমাচল প্রদেশের লাহুল উপত্যকার জাম্কার সুমডো-র কাছে মারা যান তাঁদের কথায়। দলে মোট সদস্য ছিলেন সাতজন। এদের মধ্যে একমাত্র জীবিত সদস্য হলেন বেহালায় ইউ বি আই-এর ২৪ পরগনা সেন্ট্রাল রিজিয়ন ব্রাঞ্চের কর্মী ৩২ বছরের সুঠাম চেহারার সুবীর রায়। তিনি মূল ট্রেকটি শুরু হওয়ার আগেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে তিনি বেঁচে যান।

দলের নেতা ছিলেন অমিত দাস। ৩৯ বছর বয়স। কলকাতার সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসে কাজ করতেন।

এখানে এই ক্লাবটি এ পর্যন্ত কোন কোন পথে ট্রেক করেছেন তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। ক্লাবটির নাম রেজিস্টার্ড হয় ১৯৮২ সালের গোড়ার দিকে। তার আগে ৭৯-তে পঞ্চকেদার এবং ৮১-তে রূপকুন্ড-কুঁয়ারি গিরিপথে যান। ক্লাবের সদস্যরা তখন মূলত নিজেদের উচ্ছ্বাস-আবেগ-টানেই যাওয়া। তারপরই ক্লাবটিকে রেজিস্টার্ড করার কথা চিন্তা করা হয়। ৮২-তে দ্বিতীয়বারের জন্য পঞ্চকেদার যান অন্য কয়েকজন সদস্য। এরপর প্রতি বছরই ট্রেক করতে বেরিয়েছেন ক্লাবের সদস্যরা। ৮৩-তে সাতকুন্ড-কুঁয়ারি গিরিপথ, ৮৪-তে সান্দাকফু-ফালুট, ৮৫-তে সুন্দরডোঙা-দেবীকুন্ড-নাগকুন্ড-পিন্ডারী হিমবাহ, ৮৬-তে মণিমহেশ-কুকতি গিরিপথ। ৮৭-তে দুটি ট্রেক হয়। একটি দল যায় হামতা গিরিপথ, আরেকটি দল পঞ্চকেদার। তারপর এ বছরের এই দুর্যোগ। অমিতবাবু এর মধ্যে গিয়েছিলেন পঞ্চকেদার, সাতকুন্ড-কুঁয়ারি গিরিপথ, সুন্দরডোঙা-দেবীকুন্ড এবং হামতা গিরিপথে।

সরকার হাটের রেকিট অ্যান্ড কোলম্যানের বেহালা কারখানার কর্মী ৩৬ বছরের ভানু মুখার্জি। ভানুবাবুর সাহায্যের হাত সরকার হাটের অনেকেই পেয়েছেন। সে হাত আজ স্তব্ধ। ভানুবাবু ক্লাবের সংগে প্রতিটি নতুন ট্রেকেই অংশ নিয়েছেন। তিনি এবার ছিলেন দলের সহকারী নেতা।

হাইড রোডের টি ট্রেডিং কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ায় কাজ করতেন ৩৩ বছরের আশিস চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন দলের কোয়ার্টার মাস্টার। তিনি এর আগে গেছেন পঞ্চকেদার, সুন্দরডোঙা ও হামতা গিরিপথ।

বিকাশ সরকার



অমিত দাস



ভানু মুখার্জি



বিকাশ সরকারের বয়স ৩৬। ছোটখাট ব্যবসা ছিল তাঁর। সুন্দরডোঙা ও হামতা গিরিপথে তিনি দলের সঙ্গী ছিলেন।

মৃদুল দাশগুপ্ত কাজ করতেন পি ডব্লু ডি-তে। ৩৮ বছরের মৃদুল এই ক্লাবের সংগে না গেলেও অন্যান্য কিছু ট্রেকিংয়ের অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। এই দলের সবচেয়ে কম অভিজ্ঞ ছিলেন ২৭ বছরের তপন অধিকারী। তিনি কাজ করতেন কলকাতা ট্রাম কোম্পানিতে।

এবারে আসা যাক কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তার অনুসন্ধানে। বলা প্রয়োজন, এই দলটি ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশন (আই এম এফ) থেকে যে রুটের অনুমোদন পেয়েছিলেন সেটি হল – মানালি – বারালাচা লা – ফির্তসে লা – সিংগো লা – দারচা। স্থানীয় ভাষায় লা মানে গিরিপথ। ১৮ সেপ্টেম্বর তাঁরা এই পথে কিছুটা যানও। তবে বাসে। মানালি থেকে দারচা হয়ে কেলং সরাই। ওখানে পৌঁছেই সুবীর রায়ের শরীর খারাপ করে, বমি হয়। ফলে দল ঠিক করে তাঁরা দারচা ফিরে আসবেন। প্রসংগত, মানালি থেকেই তাঁদের ট্রেক করার কথা। সপ্তাহে দুদিন চলে এমন একটি বাস পেয়ে যাওয়ায় তারা সেই বাসেই চলে যান। উদ্দেশ্য কেলং সরাই থেকে মূল ট্রেকটা শুরু করার।

যাই হোক, দারচায় তাঁরা ফিরে আসেন ২০ তারিখ। ঠিক হয়, সুবীরবাবু বাসে করে মানালিতে ফিরে যাবেন। তবে অন্য সদস্যরা একটা ছোট ট্রেক করবেন। ছালাং টাকপো – জানস্কার সুমডো হয়ে উদয়পুর। এখানে বলা প্রয়োজন, কোন কারণে অনুমোদিত ট্রেক সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হলে এ ধরনের ছোট ট্রেক বহু দলই করে থাকে। তবে করে থাকে বলেই যে সেটা ঠিক এমন নয়।

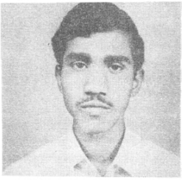
সুবীরবাবু ২১ তারিখ সকালে মানালি ফিরে যান। দলের বাকি ছজন সংগে চারজন কুলি ও একজন পথপ্রদর্শককে নিয়ে যাত্রা শুরু করেন।

এর পরের ঘটনা যা জানা যায় বেশিরভাগই কুলিদের মুখ থেকে। দলটি রাড়িরচিকা ছাড়িয়ে দুতিন কিলোমিটার দূরে পালামো গ্রামে প্রথম ক্যাম্প করে। ২১ তারিখ রাতে সেখানেই থাকে। ২২ তারিখ দ্বিতীয় ক্যাম্প করে জানস্কার সুমডোর কাছে। সে রাত থেকেই আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করে। বৃষ্টি পড়ে। ২৩ তারিখ সারাদিন তুষার ঝড় ও বৃষ্টি চলে অবিরত। সকলে ঠিক করেন, একটা দিন অপেক্ষা করবেন। ২৪ তারিখ তুষারপাত আরো তীব্র হয়। ফলে ওরা আর ওখানে থাকাটা যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। নামতে থাকেন। এরপর এক এক করে ছজনই মৃত্যুর পথে এগিয়ে যান।

এখানে বলা প্রয়োজন, এবারের মত প্রচন্ড তুষার ঝড় গত ৪৫ বছরের মধ্যে দেখা যায়নি। এ বক্তব্য হিমাচল প্রদেশের হোম এবং চিফ সেক্রেটারি, দুজনেরই। এই ব্যাপারটা সমর্থন করেছেন ডি সি কুলু এস এস চান্ডালও। এঁদের হিসাব অনুযায়ী এ বছর হিমাচলে এই ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য এর মধ্যেই ১৬৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।

কুলিরা আরো জানান, তাঁরা নিজেরা একটি শেপার্ড হাটে এসে আশ্রয় নেন। সেখানে দুদিন থাকেন। তারপর আবহাওয়া পরিষ্কার হলে তাঁরা আবার ফিরে যান এবং দেখেন যে সকলেই মৃত।

সেই সময় অর্থাৎ ২৭ তারিখ ঠিক ওই পথ দিয়ে সিংগো লা থেকে ফিরছিলেন হাওড়া বালির ট্রেকার সুব্রত ঘোষ। সুব্রতবাবু সিংগো লা-তে ২৪ তারিখ থেকে আটকা পড়ে থাকেন। তার সংগে অবশ্য ছিল একটি



তপন অধিকারী



মৃদুল দাশগুপ্ত



আশিস চক্রবর্তী

বালগেরিয়ান দল। সেই দলের সংগে ফেরার পথে তিনি পাঁচটি মৃতদেহ দেখতে পান। মৃতদেহগুলি সযত্নে বড় বড় বোল্ডারের তলায় রাখা। পরে দারচাতে ফিরে পুলিশের কাছে জানতে পারেন, ষষ্ঠজনের দেহ পাওয়া যায় ওই শেপার্ড হাট থেকে আরো বেশ কিছু নিচে অর্থাৎ দারচার দিকে।

এই দুটি বক্তব্য থেকে একটা ব্যাপার বেশ পরিষ্কার – কুলিরা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে ওই ছজনকে ছেড়ে পালিয়েছিলেন। তা নয়ত, কুলিদের মতে ছজনকে তারা মৃত বলে জানান, অথচ পাঁচজনের দেহ বোল্ডারের আড়ালে শায়িত দেখতে পান সুব্রতবাবু ও বালগেরিয়ান দলটি। তাছাড়া, পুলিশের মতে ষষ্ঠজনকে পাওয়া যায় নালায়। এ ব্যাপারে আরেকটি জোরালো যুক্তিও পাওয়া যায় ছটি মৃতদেহ কলকাতায় আসার পর। একজন ছাড়া বাকিদের মুখে স্নো ফক্সের কামড়ের দাগ দেখা যায়।

আসলে এই ঘটনাটি যদি কুমায়ুন বা গাড়োয়াল অঞ্চলে ঘটত তাহলে হয়ত এই দুর্ঘটনা নাও ঘটতে পারত। কারণ হিসেবে দলের একমাত্র জীবিত সদস্য সুবীর রায় এবং ক্লাবের সহসভাপতি দেবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (যিনি ৮৬ পর্যন্ত ক্লাবের বেশিরভাগ ট্রেকিংয়েই অংশ নিয়েছেন এবং এবারও তাঁর যাওয়ার কথা প্রায় পাকাই ছিল।) জানান, হিমাচল প্রদেশের কুলিদের মধ্যে পেশাদারী মনোভাব প্রচন্ড। যা এখনো কুমায়ুন বা গাড়োয়ালে দেখা যায়নি।

আরো একটা প্রশ্ন এই দুর্ঘটনাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। এই দলটির সংগে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম নাকি ছিল না। দলটি গিয়েছিল জানস্কার সুমডো-তে – সেখানকার উচ্চতা আনুমানিক ১২০০০ ফুট। তবে তাঁদের যাওয়ার কথা ছিল যে রুটে তার সবচেয়ে উঁচু যায়গাটি বড় জোর ১৬০০০ ফুট হবে। এই ধরনের হাই অল্টিচুড ট্রেকিংয়ের জন্য যা সাধারণত দরকার যেমন দড়ি, ক্যারাবিনর, হাই অল্টিচুড টেন্ট, স্লিপিং ব্যাগ, ফোম ম্যাট্রেস এবং প্রয়োজনীয় জামাকাপড় ও জুতো – সমস্তই তাঁদের কাছে ছিল। অনেকে ফেদার জ্যাকেটের প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু ১৬/১৭ হাজার ফুটে সাধারণত ফেদার জ্যাকেট লাগে না।

মোট কথা, এই ছজনের মৃত্যু নেহাৎই একটা দুর্ঘটনা বৈ কিছু নয়। এর জন্য পাহাড়ের ডাকে আর কেউ যাবেন না এমন ভাবারও কোন কারণ নেই। বিশেষত এই ধরনের অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে যাতে উৎসাহে ভাঁটা না পড়ে তার জন্যই এই হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন আগামী বছরে আবার ওই একই রুটে ট্রেক করার কথা চিন্তা করছেন। আর এ ব্যাপারে তাঁরা সাড়াও পেতে শুরু করেছেন। □

অনিরুদ্ধ ঘোষ

গান্ধীজির দামী চিঠি

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর লেখা চিঠির দাম কত হতে পারে তা কেউ অনুমান করতে পারেন কি ? আমাদের দেশে এই চিঠির দাম তো অনেকই, এমনকি বিদেশে খোদ ইংলণ্ডেও এর দাম অনেক। ১৯০৬ সাল থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে গান্ধীজি ইংলণ্ডে তাঁর এক ব্যক্তিগত বন্ধু আইনজীবী হেনরি পোলককে প্রায় ৮০ খানা চিঠি লিখেছিলেন। এর মধ্যে অবশ্য পোলকের পত্নী মিলিকে লেখা চিঠির সংখ্যা ছিল প্রায় অর্ধেক। সেই চিঠিগুলি সমেত গান্ধীজির কিছু লেখার পাণ্ডুলিপি ১৯৮৮ সালের জুলাই মাসের শেষের দিকে ইংলণ্ডের সাউথবির একটা নিলাম বাজারে ১ লক্ষ সাড়ে ৪ হাজার পাউণ্ড দামে বিক্রি হয়েছে।

মহাত্মাজির স্বাক্ষরিত ঐ চিঠিগুলিতে তাঁর রাজনৈতিক, দার্শনিক ও ব্যক্তিগত চিন্তাধারা ফুটে উঠেছে। তাঁর সেই স্বাক্ষরিত চিঠিগুলি ঐ নিলাম বাজারে বিক্রি হয়েছে ৩০ হাজার থেকে ৩৫ হাজার পাউণ্ড দামে। নিলাম কর্তৃপক্ষ এ খবর দিয়েছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ঐ চিঠিগুলির ক্রেতা কে ? সেদেশে ভারতীয় হাইকমিশনার আমাদের জাতীয় মহাফেজখানায় সংরক্ষণের জন্য এগুলি কিনেছেন। অর্ধেক চিঠি বিক্রি করেছেন পোলকের নাতি-নাতনীরা। এই চিঠিগুলি পোলকের পত্নীকে মহাত্মা গান্ধী লিখেছিলেন। চিঠিগুলি তাঁর নাতি-নাতনীরা এতদিন বেশ যত্ন করেই রেখে দিয়েছিলেন। বৃটিশ আইনজীবী হেনরি পোলক শুধুমাত্র গান্ধীজির একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুই ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁর সহযোগীও বটে। ভারতীয় মহাফেজখানার জন্য গান্ধীজির পোলককে উদ্দেশ্য করে লেখা স্বাক্ষরবিহীন কয়েকটি চিঠি কেনা হয়েছে ২৪ হাজার ২শো পাউণ্ডে।

এছাড়া গান্ধীজি কেন মৌনব্রত অবলম্বন করেছিলেন সে সম্পর্কে নর্মান বেনেটের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের পাণ্ডুলিপিও বিক্রি হয়েছে ২৩ হাজার একশো পাউণ্ড দামে! গান্ধীজির লেখা ও স্বাক্ষরিত একটা চিঠি ৯ হাজার ৯শো পাউণ্ড দামে কিনেছেন এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি।

দামী ডাকটিকিট

পশ্চিম জার্মানির রাফিন স্টেটের ১০৫১ সালের একটা অতি দুষ্প্রাপ্য ডাকটিকিট সম্প্রতি সেখানকার মার্কিন ব্যবসায়ীদের নিলাম বাজারে ২৩ লক্ষ মার্ক দামে বিক্রি হয়েছে। পশ্চিম জার্মানিতে এর আগে এত বেশি দামে কোন ডাকটিকিট বিক্রি হয়নি। শুধু তাই নয়, সারা বিশ্বেও সর্বোচ্চ দামে বিক্রি হওয়া ডাকটিকিটের মধ্যে এটা একটা। বৃটিশ গায়ানার ওপর ১০৫৬ সালে প্রকাশিত এক সেণ্ট দামের একটি ডাকটিকিট ১৯৭০ সালে নিলাম বাজারে ৭ লক্ষ ডলার অর্থাৎ ২০ লক্ষ মার্ক দামে বিক্রি হয়েছিল। হামবুর্গে পৃথিবীর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ একজোড়া ডাকটিকিট ৬ লক্ষ ৪০ হাজার ডলার দামে নিলামে বিক্রি হয়েছে। পূর্বতন বৃটিশ উপনিবেশ মরিশাসের এই ডাকটিকিট জোড়ার রঙ নীল ও কমলা এবং দাম এক পেনি করে। বাজারে ঐ ডাকটিকিটের মাত্র ঐ একজোড়াই অবশিষ্ট ছিল। এই ডাকটিকিট জোড়া গত ২১ অক্টোবর মিসেস রিতা লছমন নামে নিউইয়র্কের এক ভদ্রমহিলা কিনেছেন। তিনি বলেছেন যে, ডাকটিকিট দুটো এত সুন্দর দেখতে যে, তিনি সাধারণের দেখবার জন্য সে দুটির প্রকাশ্য প্রদর্শনী করবেন। এই ডাকটিকিটের অপর জোড়াগুলি হয় যাদুঘরে স্থায়ী প্রদর্শনীতে আছে অথবা বিক্রির জন্য নয়।

চোখে না দেখার খেসারত

চোখে ভাল না দেখতে পারার জন্য শিলং-এর এক ভদ্রমহিলাকে তাঁর তিন নাতির জীবন খেসারত দিতে হয়েছিল। সম্প্রতি তাঁর ঐ তিন নাতি তাঁকে জানাল যে তাদের পেটে ব্যথা হচ্ছে। ঠাকুমা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। চোখে কম দেখেন, তাই পেটে ব্যথার ওষুধের বদলে তিনি ভুল করে তাদের কীট নাশক ওষুধ খাইয়ে দিলেন। এটা খেয়ে নাতিদের পেটের যন্ত্রণা বেড়ে গেল। বমি বমি ভাব হতে লাগল। ঠাকুমা তখন নিজেই ওষুধটা ঠিক কিনা যাচাই করবার জন্য খেয়ে নিলেন। ফলে সবাই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সকলকে হাসপাতালে পাঠানো হল। কিন্তু পথেই নাতি তিনটের মৃত্যু ঘটল। আর ঠাকুমা এখন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তবে তাঁর আক্ষেপ, নিজে হাতে তিনি নাতিগুলোকে বিষ দিলেন!

হুপিং কাশির চিকিৎসা

আমাদের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি এই বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগেও কম কার্যকর নয়। দক্ষিণ চীনের উনান প্রদেশে ডাঃ ডেং গুয়ানগুয়ো ১৯৭৪ সাল থেকে একটানা গবেষণা চালিয়ে হুপিং কাশির রোগীদের কানে চাপ দিয়ে চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ নিরাময় করতে সক্ষম হয়েছেন। একটি প্রাচীন তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে তিনি গবেষণা চালান এবং সাড়ে তিনশো রোগীকে সারিয়েছেন। ১৯৭৪ সালে তিনি যখন গবেষণার কাজ শুরু করেন তখন তিন বছর ধরে হুপিং কাশিতে ভোগা এক রোগীকে হাতে পান। তার কানের বাইরের দিকে একটা ধারালো জিনিস দিয়ে দৈনিক দু-তিন মিনিট চাপ দিয়ে তিন মাসের মধ্যে তিনি ঐ রোগীকে সারিয়ে তোলেন।



আমেরিকায় বয়স্ক লোক বাড়ছে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক সরকারি রিপোর্টে জানানো হয়েছে যে, এখন থেকে আগামী পঞ্চাশ বছর পরে সেখানে প্রতি ৫ জন মার্কিন নাগরিকের মধ্যে একজন হবেন বৃদ্ধ। তিরিশ বছরের কম বয়স্ক নাগরিকরা হবেন তাঁদের ওপর নির্ভরশীল। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ২ হাজার ২০ সাল নাগাদ সেদেশে ৬৫ বছরের বেশি বয়স্ক লোকের সংখ্যা দাঁড়াবে এখনকার দ্বিগুণ। অন্যান্য বয়সের নাগরিকদের চেয়ে এখন সেখানে বয়স্ক লোকের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে।

কৃত্রিম অঙ্গ

মানুষ কোনো না কোনো কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে দিব্যি বেঁচে আছে—এ ঘটনার কথা শুনলে হয়তো অবাক হবেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি তিনজনের দুজন কোনো না কোনো কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করছেন। এইসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে আছে কৃত্রিম দাঁত, কৃত্রিম নখ, কনট্যাক্ট লেন্স, শ্রবণযন্ত্র, কৃত্রিম বাহু, ও হৃদযন্ত্র। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে।

মরা মানুষের পেনসন

ভুল পরিচয়ের দরুন একজন মরা মানুষ পুরো দুবছর ধরে অপর একজনের পেনসনের টাকা পেয়েছেন, এমন ঘটনা কদাচিৎ ঘটে থাকে। ওড়িশার বহরমপুর জেলার মাইসানা গ্রামের দুজন পেনসন প্রাপকের নাম মহকুমা অফিসের রেজিস্টারে লেখা ছিল। একজনের নাম জি পরমা আর অপরজনের নাম জি. করমা। ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঐ অফিসে খবর এল জি. পরমা মারা গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পেনসন বন্ধ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে প্রত্যেক মাসে ডাকযোগে জি. করমার পেনসন পাঠানো হতে লাগল। আর আশ্চর্য, প্রতি মাসেই ঐ পেনসনের টাকা ফেরত আসতে লাগল। একটা নোটে বলা হল, পেনসন প্রাপকের মৃত্যু হয়েছে। পুরো দুবছর ধরে এই কাণ্ড ঘটল। প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের এই ভুল সংশোধন করতে ঐ পুরো দুবছর সময় লাগল। আর তাঁদের এই ভুল ভাঙল তাঁদের রেজিস্টারে মৃত বলে চিহ্নিত জি. পরমার কাছ থেকে একটা আবেদনপত্র পেয়ে, ঐ আবেদনে তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে, গত ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে তিনি তাঁর পেনসনের টাকা পাচ্ছেন না। আসলে মারা গেছেন জি. করমা। আর খাতাপত্রে ভুল করে হয়েছে মারা গেছেন জি. পরমা। □

বরুণ মজুমদার

ভারত সম্পর্কে
রুশ জনগণের আগ্রহ বেড়েছে

ভীষ্ম সাহানী

সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন কিছুদিনের জন্য ছিলাম কিংবা যতবার সে দেশে গিয়েছি ততবারই আমার নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং আমি অভিভূত হয়েছি। দুটি দেশের মধ্যে বহু দশক ধরে যে সাংস্কৃতিক সম্পর্কে গড়ে উঠেছে তার বিভিন্ন দিক আমার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়েছে। সব চেয়ে প্রথম যে স্মৃতি মনে পড়ে তা হল পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকের কথা, যখন আমি মস্কোতে থাকতাম আর কাজ করতাম। সে সময়ে আমার কয়েকজন ভারতীয় সহকর্মীর সংগে একদিন সকালে আমি কিয়েভ মেট্রো স্টেশন থেকে ইউক্রেন হোটেলের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলাম সরকারি সফরে ভারত থেকে আগত কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সংগে দেখা করার জন্য। তখন ঐ হোটেল এবং রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যবর্তী এলাকায় কিছু নির্মাণের কাজ চলছিল। পুরো জায়গাটা লোহার রড আর ভাঙা ইটপাথরে ভরা ছিল। আমরা যখন ইট-কাঠ-লোহার স্তূপ পেরিয়ে এগোচ্ছিলাম তখন সামনে একজন বয়স্কা রুশ মহিলা এসে পড়লেন, কাঁধে তাঁর ঝোলানো ব্যাগ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশ

আমাদের পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে গিয়ে ভদ্রমহিলা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং কৌতূহল ভরে আমাদের খানিকক্ষণ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কি ভারতীয়?' আমাদের সহকর্মী জো আনসারি রুশ ভাষা কিছুটা জানতেন, তিনি ভদ্রমহিলার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা ভারতীয় এবং আমরা মস্কোতেই কাজ করি।' ভদ্রমহিলা আমাদের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হল তিনি খুব খুশী হয়েছেন। তারপর তিনি যা করলেন তা অদ্ভুত। তিনি নিচু হয়ে মাটি ছুঁলেন আর বললেন, 'আপনারা টেগোরের দেশের লোক, আপনাদের সংগে পরচিত হয়ে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি।'

কিছুক্ষণ সৌজন্য বিনিময়ের পর তিনি চলে গেলেন। ওঁর কথা শুনে আমাদের খুব ভাল লাগল। তবে তাঁর মাটি ছোঁয়ার ব্যাপারটা অনেকদিন আমার কাছে রহস্য হয়ে ছিল। পরে জানতে পারলাম যে, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর দেশের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবার জন্য মহিলাটি ঐভাবে ভূমি স্পর্শ করেছিলেন।

সে সময়ের ঐ অল্পক্ষণের সাক্ষাৎকার গভীর অর্থ বহন করেছিল। তখন মস্কোয় রবীন্দ্র রচনাবলীর ৮টি খণ্ড রুশ ভাষায় ছাপা হচ্ছিল। প্রত্যেকটি খণ্ড প্রকাশিত হবার সংগে সংগে বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল। অথচ রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী যে সেই প্রথম ওদেশের ভাষায় অনূদিত হচ্ছিল, তা নয়।

বই পড়া ওঁদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য

সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষরা বই পড়তে খুব ভালবাসেন। ওদেশের প্রত্যেকটি মানুষ যখন কাজে যান তখন তাঁদের এক পকেটে থাকে বাজারের থলি, অন্য পকেটে বই। মেট্রোতে, বাসে, বেঞ্চে বসে তাঁদের বই পড়তে দেখা যায়। বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নই হল একটি দেশ যেখানে বইয়ের দোকানের সামনে লম্বা লম্বা লাইন দেখা যায়। বইয়ের দোকানে নতুন কোনও বই আসলে কয়েক দিন বা কয়েক ঘন্টার মধ্যে তা বিক্রি হয়ে যায়। দুঃখের বিষয় এই যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের লোকদের মধ্যে বই পড়ার রুচি ও আগ্রহ যতটা আছে



রামায়ণের রাম চরিত্রে পেচনিকোভ

আমাদের ভারতবাসীদের মধ্যে তার অর্ধেকও নজর পড়ে না। কতবার এমনি হয়েছে যে, আমার পাশে বসে কোনও রুশ নাগরিক কোনও ভারতীয় লেখকের লেখা বই সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করেছেন, অথচ আমি তাতে অংশ নিতে পারিনি। কারণ সেই লেখকের নাম ছাড়া আমি আর কিছুই জানতাম না। নিজের কাছে নিজে ছোট হয়ে গেছি, লজ্জিত বোধ করেছি। রুশ জনসাধারণের বই পড়বার সখ শুধু ভারতীয় পুস্তকেই সীমাবদ্ধ নই, তাঁরা বিশ্ব-সাহিত্যের সংগেও সুপরিচিত – তা সে সমসাময়িক পাশ্চাত্য সাহিত্যই হোক, লাতিন আমেরিকান সাহিত্যই হোক বা পৃথিবীর অন্য কোনও প্রান্তের সাহিত্য হোক।

অনূদিত সাহিত্যের প্রাচুর্য

এর কারণ এই যে, সোভিয়েত সরকার অনুবাদ-সাহিত্যকে সবিশেষে গুরুত্ব দেন। আর তার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে বিভিন্ন ভাষায় বিশ্বের নানা প্রকার সাহিত্যের অনুবাদ করার জন্য বড় বড় প্রকাশন সংস্থা রয়েছে। কোথাও কোনও, তা সে যে কোনও বিষয়ের

ওপরই হোক – উল্লেখযোগ্য বই প্রকাশিত হলেই তার অনুবাদের কাজ হাতে নেওয়া হয়। এই পন্থা অবলম্বন করার জনাই সোভিয়েত ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক জীবন সমৃদ্ধ হয়েছে। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ১১০০ ভারতীয় পুস্তক রুশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। পৃথিবীর আর কোনও দেশ বোধহয় ভারত সম্বন্ধে এত গভীর আগ্রহ দেখাননি। ইউরোপ, আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশের ভারততত্ত্ববিদ পণ্ডিত ও গবেষকরা বিস্তর বই লিখেছেন, ভারতের চিন্তাধারা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তা জনসাধারণের মধ্যে সাড়া জাগাতে পারেনি। অথচ ভারতীয় লেখকদের রচনাবলী সোভিয়েত ইউনিয়নে নিপুণতার সঙ্গে অনুবাদ করে আকর্ষণীয় ভাবে ছাপানো হয়।

মঞ্চে ভারতের প্রাচীন সাহিত্য

গোড়ার দিকে পঞ্চাশের দশকে আমি যখন মস্কোয় ছিলাম তখন এক স্থানীয় মঞ্চে শূদ্রক রচিত প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক 'মৃচ্ছকটিক' অর্থাৎ মাটির শকটের সুষ্ঠু রুশী প্রযোজনা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিছুদিন পর জানতে পারলাম যে, নাতালিয়া গুসেভা নাম্নী এক রুশ মহিলা, যিনি এখন একজন খ্যাতনামা ভারততত্ত্ববিদ – রামায়ণের কাহিনীর নাট্যরূপ দিয়েছেন এবং ঐ নাটক বাচ্চাদের জন্য বলশয় থিয়েটারের নিকটস্থ এক শিশু রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হচ্ছে। আমি ঐ নাটক দুবার দেখেছিলাম এবং দু'বারই হলটা শিশুদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।

আর এক দেশের বাচ্চারা আমাদের দেশের একটি মহাকাব্যের নাট্যরূপ গভীর আগ্রহে দেখছে, তার রস আস্বাদন করছে সংলাপের প্রতিটি কথা বুঝতে, এটা আমার কাছে একটা অভিনব অভিজ্ঞতা। রামায়ণের ঐ নাট্যরূপ মস্কোতে ২০ বছর চলেছিল। বোধ হয় মস্কোর প্রতিটি শিশু ঐ নাটক দেখেছে, কেউ বাদ যায়নি। শিশুরা বড় হয়ে গেছে, নাটকের পাত্রপাত্রী বৃদ্ধ হয়ে সরে গেছেন, কিন্তু নাটক বন্ধ হয়নি। ভারতীয়দের মতো রামচন্দ্রের কাহিনীর সঙ্গে সবিশেষ পরিচিত নন মস্কোয় এমন লোক বোধহয় আজ একজনও নেই।

সাজ্জাদ জাহিরের মৃত্যু

বহুকাল পর ১৯৭৪ সালে আমার আর একটি হৃদয়স্পর্শী অভিজ্ঞতা হল। ঐ বছর আলমা আটা শহরে আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনের পর ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যদের সমরখন্দ শহরে নিয়ে যাওয়া হল। ঐখানে পৌঁছে আমরা সজ্জাদ জাহিরের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ পেলাম। আলমা আটা সম্মেলনে উনি আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্য ওঁকে ঐ শহরের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জাহিরের মৃত্যু আমাদের সকলকে মর্মান্তিক আঘাত দেয়। কারণ তিনিই প্রগতি লেখক আন্দোলনের সূচনা থেকে আমাদের প্রেরণা হয়েছিলেন। তিনি একজন নিরহঙ্কারী ও সংবেদনশীল ব্যক্তি ছিলেন। এবং এই কারণে তিনি ভারতীয় ও বিদেশি লেখকদের কাছে অতি প্রিয়জন ছিলেন। ওঁর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্য আমরা হোটেলের লবিতে একটি ছোট শোকসভার আয়োজন করেছিলাম। ঐ শোকসভা সমাপ্ত হবার পর আমায় ভারতে জাহিরের স্ত্রীকে ঐ দুঃসংবাদ জানাবার ভার দেওয়া হয়। তারবার্তার খসড়া তৈরি করে নিকটতম টেলিগ্রাফ অফিসে যাবার জন্য বেরুলাম। সঙ্গে এলেন দীর্ঘদেহী এক রুশ দোভাষী। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, পথ প্রায় জনবিরল। বিষণ্ণ মন আরও ভারাক্রান্ত। হঠাৎ আমার সঙ্গী আমায় ছুঁয়ে মুখ নামিয়ে ধীর স্বরে শ্রীমদ্‌ভগবৎ গীতার শ্লোকটি আবৃত্তি করলেন –

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।

(অর্থাৎ মনুষ্য জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীর পরিগ্রহ করে) তাঁর মুখে গীতার ঐ শ্লোক শুনে আমি বিস্ময়ে আবেগে অভিভূত হয়ে গেলাম। ভাল করে বুঝলাম, আমাদের ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান



রুশ শিল্পী জি পোপলাভস্কির আঁকা রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি



মস্কোতে বিদেশি বই বিক্রির কেন্দ্র

ছিল বলেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, গীতার অমন একটি শ্লোকই কোনও ভারতীয়কে শোকে সান্ত্বনা দিতে পারে।

প্রাচ্য সাহিত্য অধ্যয়নে রুচি

মস্কোর প্রাচ্য সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ প্রতিষ্ঠান লেনিনগ্রাদ ও তাসখন্দেও আছে। এইসব প্রতিষ্ঠানে উচ্চস্তরের গবেষণা ও অধ্যয়নের সংস্থান আছে। মস্কোর ঐ প্রতিষ্ঠানে একদিন এক যুবক শিক্ষার্থী আমাকে ভারতের মধ্য যুগের 'নাথ সম্প্রদায়' সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানবার জন্য প্রশ্ন করেন। ঐ যুবকটি তখন ঐ বিষয়ে পন্ডিত হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদীর একটি প্রবন্ধের অনুবাদ করছিলেন এবং কোনও একটা বিষয়ে সংশয় নিরসনের জন্য আমার কাছে আসেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারায় আমি অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলাম। বিশেষজ্ঞদের কথা আলাদা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, ওখানকার সাধারণ লোকদেরও ভারত, ভারতের সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সিনেমার প্রতি অত্যধিক আগ্রহ ও আকর্ষণ দেখা যায়। সকলেরই জানা আছে যে, ভারতের চলচ্চিত্র যেমন ওখানে লোকপ্রিয়, তেমনি ভারতীয় সংগীত, নৃত্য, শিল্পকলা এবং দর্শন ওদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। ভারতের সংস্কৃতি সম্বন্ধে অন্য বিদেশিদের বিশেষ করে বৃটিশদের যে দৃষ্টিকোণ ও প্রতিক্রিয়া ছিল তার সংগে আমরা পরিচিত ছিলাম। হতে পারে তারা আমাদের সংস্কৃতির মূল্য ঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি, যদিও ম্যাক্স মূলার, ডব্লু বি য়েটস প্রমুখ এই সংস্কৃতির স্তুতি করেছিলেন। সত্য কথা এই যে, বিদেশিরা ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের মনে তাঁদের দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সাহিত্য, মূল্যবোধ এমন কি আমাদের নিজেদের ভাষাগুলির বিষয়ে পর্যন্ত একটা ভ্রান্ত ধারণার বীজ বপন করে দেয়।

ভারতীয় জীবনধারা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সোভিয়েত জনগণের এই আগ্রহের পেছনে কয়েকটি কারণ আছে। তাঁদের দৃষ্টিকোণ আন্তর্জাতিক এবং তাঁরা মানব-মনের নিত্যনতুন সৃষ্টিগুলিকে বিশ্ব সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ বলে গণ্য করেন।

এইসব সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এই যে, এগুলি আংশিকভাবে ইতিহাসের আধারে গড়ে উঠেছে ও আংশিক ভাবে বিশেষ এক গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আকার পেয়েছে। আমরা দেখতে পাই যে, ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন ও রাশিয়ায় জারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ একই সময়ে ঘটেছিল। দুটি দেশের জনগণ একই রকম অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছিলেন। সুতরাং রুশ বিপ্লব যখন ১৯১৭ সালে সফল হল তখন ভারতের দেশভক্ত বুদ্ধিজীবীরা এই সফলতাকে সানন্দে স্বাগত জানালেন। বিখ্যাত কবি সুব্রহ্মণ্যম ভারতী জার রাজত্বের অবসানকে এক নূতন প্রভাতের সূচনা বলে আবাহন করেন। মুন্সী প্রেমচন্দ সেই সময় একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। সেই উপন্যাসে তিনিও ঐ ঘটনার সপ্রশংস উল্লেখ করেন। তাঁর সেই উপন্যাসের একটি চরিত্র একজন কৃষক অন্য কৃষকদের বলছেন –

'তোমরা এমন হাসছ যেন কৃষকদের নিজেদের কোনও সত্তা নেই, তারা যেন জন্ম নিয়েছে শুধু জমিদারদের জমিতে কঠোর পরিশ্রম করার জন্য। কিন্তু আমি যে খবরের কাগজ পাই তাতে রাশিয়ায় কৃষকরাই হল জমির মালিক আর তারা যা ভাল বোঝে তাই করে। হালে ওখানকার অত্যাচারী রাজাকে ঐ কৃষকরাই সিংহাসনচ্যুত করেছে। এখন সেখানে কৃষক আর শ্রমিকদের পঞ্চায়েত রাজ কায়েম হয়েছে।' (প্রেমাশ্রম, ১৯১৯)

সাহিত্য-সামাজিক স্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে

দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন মহাত্মা গান্ধী লিও তলস্তয়ের রচনাবলী পড়তেন এবং তাঁর সংগে পত্রালাপ করতেন। তলস্তয়ের লেখা গান্ধীজীকে এতই প্রভাবিত করেছিল যে, তিনি তলস্তয়কে নিজের গুরুর আসনে বসিয়েছিলেন। ম্যাকসিম গর্কির রচনাগুলিও গান্ধীজীকে খুব প্রভাবিত করে। গান্ধীজীর ভাষায় গর্কির মত লেখক বিশ্বে খুব কমই আছেন যাঁরা শ্রমজীবী মানুষদের দুঃখকষ্ট ও সংগ্রামকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। বহু বছর ধরে ধীরে ধীরে দুটি দেশের মধ্যে পারস্পরিক মমত্ববোধ ও বোঝাপড়ার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে। শোনা যায় যে, বৃটিশ শাসকরা ভারতের তরুণ দেশপ্রেমিকদের যখন জেলে পাঠিয়েছিলেন তখন নির্জন কারাবাসে তাঁরা ম্যাকসিম গর্কির লেখাগুলি পড়ে অনুপ্রাণিত হতেন।

যখন বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের তীব্র সংগ্রামের বৃত্তান্ত ভারতের জনগণ আকুল আগ্রহে পড়তেন। সোভিয়েত জনগণের সংগে একাত্মতা ও সংহতি প্রকাশ করে বহু কবিতা রচনা করা হয়েছিল। রেড আর্মির অসীম বীরত্বের প্রশংসা করে হিন্দি কবি শিবমংগল সুমন একটি কবিতায় লিখেছিলেন –

'ওদের সংগে কে যুদ্ধ করবে ?
ওদের বিরুদ্ধে এগোবার সাহস কার আছে
দশ সপ্তাহের যুদ্ধ দশ বছরে পরিণত হবে।'

অদৃশ্য বন্ধন

ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠতার মূলে আরও কিছু কারণ প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। যেমন, আমাদের দেশে আমরা অতি সম্প্রতি কনজিউমারিজম-কালচারের কুফল সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছি। অথচ সোভিয়েত ইউনিয়নে গোড়া থেকেই বিলাস-পণ্যের উৎপাদনকে উৎসাহিত করার প্রবণতাকে মাথা তুলতে দেওয়া হয়নি। দুটি দেশের মধ্যে আরও একটি সাদৃশ্য রয়েছে। জিনিসপত্রের অভাব, অর্থনৈতিক অবনতি কিংবা ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের প্রবল বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সোভিয়েত জনগণের মনে ছাপ ফেলতে পারেনি। তাঁরা আত্মিক ও নৈতিক মনোবল অটুট রেখেছেন – ভারত যার গুণগ্রাহী।

অতএব, ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের বিষয়টিকে রাজনৈতিক সুবিধাবাদ কিংবা আধুনিক কালের কূটনীতির কোনও চাল বলে গণ্য করাটা খুব ভুল হবে। আমাদের সংগ্রামের প্রকৃতি, সেই সংগ্রামের অন্তর্নিহিত দৃষ্টিভঙ্গি, আদর্শবাদ এবং যে মানবতাবাদী ঐতিহ্য আমরা অতীত থেকে পেয়েছি তাই ঐ যোগাযোগকে উৎসাহিত করেছে। আর এইগুলিই বিদেশিদের, বিশেষ করে, সোভিয়েত জনগণকে আকৃষ্ট করেছে, বিস্মিত করেছে। ভারতের জনগণও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক সম্পদের সংগে পরিচিত হবার জন্য গভীর আগ্রহ প্রকাশ করছেন। এই বহুমুখী মৈত্রী বন্ধনের মূল সত্যই অত্যন্ত গভীরে। □

বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে

নিউ জার্সি থেকে আলোলিকা মুখোপাধ্যায়

সুপার মার্কেটে গেলেই চোখে পড়ে দুধের বাক্সের গায়ে চারটি ছেলে-মেয়ের ছবি। পাশে নাম বয়স ও নিরুদ্দেশের তারিখ লেখা। মনে পড়ে বহুদিন আগে দেখা হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ কলমে অস্পষ্ট এক বালকের মুখ। নিচে লেখা – 'খোকা ফিরে এসো... ..।'

আমেরিকায় এরকম শত শত খোকা-খুকু প্রতিদিন হারিয়ে যাচ্ছে। বাড়ি থেকে পালিয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে। কখনো খবর মেলে। কখনো মেলে না। কেন এরা সুখের আশ্রয় ছেড়ে অজানা, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ডাকে সাড়া দেয়? কী আছে সেই জীবনে যার আকর্ষণে বাবা, মা, ভাই, বোন তুচ্ছ হয়ে যায়?

অনেক কারণেই এরা ঘর ছাড়ে। অ্যাডভেঞ্চারের নেশা, নয়তো কৈশোরে স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ – এরকম প্রবণতা যে থাকে না তা নয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে বাড়ির প্রতি বিদ্বেষ, আতংক এবং অভিমান। বাবা-মায়ের মধ্যে তুমুল অশান্তি, বিবাহ-বিচ্ছেদ, সৎ বাবা নয়তো সৎ মায়ের সংগে থাকা, অতিরিক্ত দৈহিক নির্যাতন, মানসিক অত্যাচার, স্কুলের নানা সমস্যা, নিজের উদ্বেগের কথা কাউকে বলতে না পারার কষ্ট – এসব কারণে তাদের ধারণা হয় বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। বার বছর থেকে সতের বছর বয়সের মধ্যে একবার না একবার বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে এরকম ছেলে-মেয়ের সংখ্যা এদেশে প্রায় ১২ শতাংশ। বাবা-মা দুজনেই বর্তমান এরকম বাড়ি থেকেই সব থেকে বেশি নিরুদ্দেশের খবর পাওয়া যায়। ৪৬% নিরুদ্দিষ্ট ছেলে-মেয়েই এরকম পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে চেষ্টা করে। দেড়শ' জন ছেলে-মেয়ে যারা নিরুদ্দেশ হবার পর ধরা পড়েছে তাদের নিয়ে সমীক্ষায় এই সব তথ্য জানা গেছে। এদের মধ্যে ৩১% হচ্ছে এমন পরিবারের সন্তান, যেখানে হয় শুধু মা, নয়তো শুধু বাবা আছেন। আর ২৩% নিরুদ্দেশ হয়েছে সৎ বাবা নয়তো সৎ মা-র সংসার থেকে।

এইসব ছেলে-মেয়েরা সাধারণত পারিবারিক সমস্যার দরুন শারীরিক ও মানসিক ভাবে পীড়িত। শারীরিক নির্যাতনই হচ্ছে প্রধান কারণ। প্রচন্ড মারধোর, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে শাস্তি দেওয়া, দুঃসহ শীতের রাতে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া, অত্যধিক পরিশ্রমের কাজ করতে বাধ্য করা। নয়তো অমানুষিক নির্যাতন সাধারণত ছেলে-মেয়েদের মনে আতংক সৃষ্টি করে। এর ওপর আছে যৌন অত্যাচার। এর কবল থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অনেক মেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। সৎ বাবা নয়তো সৎ দাদা, কখনো কোন নিকট আত্মীয় তাদের ওপর লুকিয়ে সুযোগ নেবার চেষ্টা করে। ভয়ে কাউকে বলতে পারে না। ক্রমশ নিজের ওপর ঘৃণা জন্মায়। মানসিক দুশ্চিন্তায় পড়াশোনার ক্ষতি হতে থাকে। স্কুলেও পিছিয়ে পড়ার ফলে ভীষণ উদ্বেগ শুরু হয়।

বাবা-মায়ের অতিরিক্ত প্রত্যাশা থেকেও ছেলে-মেয়ের মধ্যে বিক্ষোভ জন্মায়। ক্রমাগত প্রত্যেক বিষয়ে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করলে আশানুরূপ ফল না পেলে বাবা-মায়েরও হতাশা শুরু হয়। বাড়িতে অশান্তির সূত্রপাত হয়। অক্ষমতার দুঃখ থেকে অপরাধবোধ, সব শেষে পলায়নী মনোবৃত্তি পরিত্রাণের পথ খোঁজে।

অনেক সময় কুসংগে পড়ে কিছু ছেলে-মেয়ে ড্রাগ, অ্যালকহলে আসক্ত হয়। চুরি করার প্রবণতা দেখা দেয়। পড়াশোনা বন্ধ করে স্কুল পালাতে শুরু করে। অথচ দেখা গেছে, এদের কোন পারিবারিক অশান্তি নেই। নিজের দুর্বলতায় নিজের ক্ষতি করে বসেছে। কেউ বা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। বাবা-মাকে আঘাত দেবার ভয়ে এরা নিজেদের উদ্বেগের কথা কাউকে বলতে পারে না। আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয়, শুরু হয় বিষণ্ণতা। তার পর একদিন মরীয়া হয়ে ঘর ছেড়ে পালায়। বাস্তবের সংগে মোকাবিলা করার মত মানসিক বল না থাকার ফলে আবেগ-তাড়িত হয়ে পথে নামে।

বিষাদগ্রস্ত ছেলে-মেয়ের সংখ্যা এদেশে নেহাৎ কম নয়। আর্থিক সাচ্ছল্যের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েও এরা মনে করে, বাড়িতে সেরকম আন্তরিকতা, ভালবাসা নেই। উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাবা, মা নিজের নিজের কর্মজগৎ নিয়ে ব্যস্ত। অন্য আত্মীয়-স্বজনের সংগে এদের সংযোগ কম। পাড়ায় অথবা স্কুলে এরা সহজে জনপ্রিয় হতে পারে না। ফলে কোন বন্ধু-বান্ধব পায় না। ভেতরে ভেতরে ক্ষোভ ও অভিমান দানা বাঁধতে থাকে। এ ধরনের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কিছুটা অকারণ বিষণ্ণতা থাকে নিজের স্বভাবেই। মনোবিদ্যা বিশারদরা বলেন – সময় মত গুরুত্ব দিলে এবং চিকিৎসা করালে এদের জীবনে স্ফূর্তি এবং প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

সংসারে দারিদ্র্যে ও আর্থিক নিরাপত্তার অভাব থেকেও ছেলে-মেয়েরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার চেষ্টা করে। ভাবে নিজে চেষ্টা করে দেখবে যাতে অন্য কোন উপায়ে সেই সুখ খুঁজে পাওয়া যায় কি না।

কিন্তু বাইরের জগৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের মোহভংগ ঘটায়। ১২/১৪ বছরের এই কিশোর-কিশোরীরা যতদিন সংগে ডলার থাকে ততদিন উন্মাদনার ঘোরে এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে ঘুরে বেড়ায়। তারপরই অবস্থা হয় সংগীন। রুজি-রোজগারের সহজ রাস্তা বন্ধ। কারণ ১৬ বছরের নিচে বয়স হলে কেউ চাকরি দেবে না।

ন্যানেট আর বাড়ি থেকে পালাতে চায় না



স্কুলের লেখাপড়া সম্পূর্ণ না করার ফলে তার বেশি বয়স হলেও ভদ্রগোছের কোন কাজই পাওয়া যাবে না এর মধ্যে যদি নেশা করার অভ্যেস থাকে তবে কুসংগে পড়ে সমাজবিরোধী কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা খুবই প্রবল। সহানুভূতি দেখিয়ে, আশ্রয় দেবার লোভ দেখিয়ে দালালরা মেয়েদের পৌঁছে দেয় তথাকথিত আমেরিকান 'মাসী'-র ঘরে। নিউ ইয়র্কের লাল আলো এলাকায় খদ্দের ধরতে দাঁড়াতে হয় সুদূর মফঃস্বল শহরের অ্যানামেরী অথবা ক্যাথীকে। ক্রমে এদের মধ্যেই অপরাধ প্রবণতা, চুরি, জোচ্চুরি, খুন-খারাপির নেশা ধরিয়ে দেয় অপরাধ জগতের রাঘব-বোয়ালরা। মার্কা মারা হয়ে যাবার পর হাজার ইচ্ছে সত্ত্বেও স্বাভাবিক জীবন যাপনের পথ ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকে।

কিন্তু এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যে এদেশে বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ চেষ্টা শুরু করেছে। 'ইউনাইটেড স্টেটস জাস্টিস' বিভাগের এক সমীক্ষা থেকে জানা গেছে এই ঘর-পালানো ছেলে-মেয়েদের অপরাধ প্রবণতা, হীনমন্যতা, ক্ষোভ ও বিষণ্ণতার মূল খোঁজার জন্য কিছু নির্দিষ্ট পরিকল্পনার সাহায্য নেওয়া দরকার। এ জন্যে বাবা-মাকেও সচেষ্ট হতে হবে। সমস্যাকে এড়িয়ে না গিয়ে ছেলে-মেয়ের সংগে খোলাখুলি আলোচনা করতে হবে, কোথায় কেন সংঘর্ষ বাঁধছে। দু পক্ষকেই সমঝোতায় আসার চেষ্টা করতে হবে। এ জন্যে স্কুলে আছেন কাউন্সেলর। প্রত্যেক স্কুলেই বয়ঃসন্ধিক্ষণের সমস্যা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ-মনোবিজ্ঞানী যুক্ত থাকেন। প্রয়োজনে তাঁরা এগিয়ে এসে সাহায্য করেন। যদি অতিরিক্ত বিষাদ বা আত্মহত্যার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তখন মানসিক রোগের চিকিৎসা করাতে হবে। পারিবারিক পরিবেশ কোথায় তাকে অশান্তি দিচ্ছে তার কারণ খুঁজে দেখা দরকার। ছেলে-মেয়ের যদি ড্রাগ অথবা অ্যালকোহলে আসক্তি থাকে, তবে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের সাহায্য নেওয়া দরকার। অপরাধ প্রবণতার জন্যেও উপযুক্ত চিকিৎসা, সাময়িকভাবে ডিটেনশন সেন্টার ইত্যাদির সাহায্য নিতে হবে। সর্বদা বাবা-মাকে দায়ী করার বদলে বেয়াড়া ছেলে-মেয়ের উগ্র স্বভাব সংশোধনের জন্য বিভিন্ন 'জুভেনাইল হোমের' সুযোগ সুবিধার কথা চিন্তা করা যেতে পারে। মোট কথা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে।

নিউইয়র্ক, হিউসটন, ফ্লোরিডা ইত্যাদি জায়গায় ২১ বছরের নিচে নিরুদ্দিষ্ট ছেলে-মেয়েদের জন্যে সাময়িক আশ্রয়ের ব্যবস্থা আছে। মোটামুটি আমেরিকার সব স্টেটেই এ ধরনের সাময়িক আশ্রয়ের ব্যবস্থা আছে। এখান থেকে যোগাযোগ করে তাদের নিজেদের পরিবারে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে ফিরে যাওয়া নিরাপদ না হলে তখন (যদি পরিস্থিতি একেবারেই প্রতিকূল থাকে) তাদের জন্যে ফস্টার হোম বা অ্যাডপশন হোমের ব্যবস্থা করা হয়। বহু নিঃসন্তান দম্পতি, এমনকি ছেলে-মেয়ে থাকা সত্ত্বেও অনেকে এরকম ঘর ছাড়া কিশোর-কিশোরীকে কয়েক বছর অথবা প্রয়োজনে দীর্ঘ সময়ের জন্যে আশ্রয় দিতে রাজি থাকেন। সরকার থেকে এ জন্যে কিছু অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়। আশ্রিত ছেলে অথবা মেয়েটির থাকা, খাওয়া, জামাকাপড়, চিকিৎসা, পড়াশোনার খরচ সব কিছুই ১৮ বছর পর্যন্ত দেওয়া হয়। প্রয়োজনে ২১ বছর পর্যন্তও দেওয়া হয়ে থাকে।



রিচার্ড ভরহিস : হারিয়ে যাওয়া ছেলেমেয়েদের ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী

বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে অনুতপ্ত হয়ে বাড়ি ফিরছে, এমন ছেলে-মেয়ের সংখ্যাও কম নয়। সাময়িক আবেগ ও উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে বেরিয়ে পড়ে তারপর পথে-ঘাটে ঘুরে ঘুরে আবার বাড়ির কথা মনে হয়েছিল ষোলো বছরের ছেলে ডেনিসের। এখন তার কপর্দকহীন অবস্থা। শেষ পর্যন্ত সে একটি প্রতিষ্ঠানের খবর পেল যারা এরকম নিরুদ্দিষ্ট ছেলে-মেয়েকে বাড়ি ফেরত পাঠানোর দায়িত্ব নেয়। কানেকটিকাটের ছেলে ডেনিস তখন মায়ামীতে বসে তাদের ফোন করল সাহায্য পাওয়ার জন্যে। প্রথমে স্থানীয় পুলিশকে সব জানাতে হল। তারা একটি ইয়ুথ শেলটারে থাকতে দিল। পরদিন ট্রেইলয়েজ অপারেশন হোম ফ্রি প্রোগ্রামের বাসে চড়ে ডেনিস তার বাড়ি ফিরে গেল। এইভাবেই বাড়ি ফিরেছে ১৭ বছরের মেয়ে নিকোল, ১৫ বছরের মেয়ে ন্যানেট ক্রুপা। গত দু বছরে সারা আমেরিকায় এই বাস সার্ভিসের দৌলতে মোট সাত হাজার নিরুদ্দিষ্ট ছেলে-মেয়ে ঘরে ফিরতে পেরেছে। এই ব্যবস্থার মূলে আছেন নিউ জার্সিরই একজন পুলিশ অফিসার ক্যাপ্টেন রিচার্ড ভুরহিস। ২৫ বছর ধরে তিনি পথে পথে অনেক দিশেহারা কপর্দকহীন ছেলে-মেয়েকে দেখেছেন। দেখেছেন অপরাধ জগতে জড়িয়ে পড়া কিশোর, দেহবিক্রির ব্যবসার শিকার নিরুপায় কিশোরীদের। প্রতি বছর প্রায় ২,০০০ কিশোর-কিশোরীর মৃতদেহ পাওয়া যায়। যাদের কেউ শনাক্ত করার নেই। ক্যাপ্টেন ভুরহিস এ নিয়ে প্রায়ই চিন্তা ভাবনা করতেন। শেষ পর্যন্ত 'দি ট্রেইলওয়ে করপোরেশন' নামে প্রাইভেট বাস কোম্পানির কাছে আবেদন জানালেন, যদি তারা হারিয়ে যাওয়া ছেলে-মেয়েদের বিনা ভাড়ায় বাড়ি পৌঁছে দেয়। তিনমাস বাদে এই কোম্পানি সারা আমেরিকায় এই সার্ভিস চালু করে। সংগে স্পনসর করলেন ইন্টার-ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ চীফস অফ পুলিশ। ১,৫০০ বাস সারা আমেরিকায় ১২ হাজার শহরে যায়। যদি কোন ছেলে-মেয়ে এই বাসে চড়ে বাড়ি ফিরতে চায়, তাকে প্রথমে স্থানীয় পুলিশের কাছে যেতে হবে। পুলিশের কাছে নিরুদ্দিষ্টের তালিকা থাকে। সেই অনুযায়ী পুলিশ তাকে ট্রেইলওয়ের বাসে বসিয়ে ড্রাইভারকে জানিয়ে দেবেন। ছেলে অথবা মেয়েটির বাবা-মাকে ফোন করে বাসে পৌঁছোনোর সময় ইত্যাদি জানিয়ে দেবেন। তাঁরা তাঁদের শহরের পুলিশ অফিসারকে সংগে নিয়ে ছেলে-মেয়েকে নামিয়ে নেবেন।

এই ব্যবস্থাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বহু সংস্থা। 'ন্যাশন্যাল সেন্টার ফর মিসিং চিলড্রেন' (ওয়াশিংটন) থেকেও এই ব্যবস্থার সপক্ষে সমর্থন জানানো হয়েছে। আগে যেখানে গড়ে প্রতিদিন ৯টি ছেলে-মেয়ে বাড়ি ফিরতো, এখন সেখানে ১৬ জন করে বাড়ি ফিরছে। বহু শিশু আছে, যারা বন্ধুর প্ররোচনায় পথে বেরিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল অথবা কেউ ধরে নিয়ে যাবার পর একসময় পথে ছেড়ে দিয়েছিল।

'ন্যাশন্যাল রানঅ্যাওয়ে সুইচবোর্ড', 'রান অ্যাওয়ে হটলাইন', 'ন্যাশন্যাল সেন্টার ফর মিসিং অ্যান্ড এক্সপ্লয়েটেড চিলড্রেন' ইত্যাদি সরকারি সংস্থাগুলি আছে বাবা-মাকে সাহায্য করার জন্যে। ছেলে-মেয়ে হারিয়ে গেলে অথবা বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে এইসব দপ্তর থেকে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়।

জীবনে যেরকম পরিস্থিতিই আসুক, বাড়ি থেকে কম বয়সে পালিয়ে গিয়ে যে কত বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, সে প্রসংগে কিছু ছেলে মেয়ে বলেছে – 'পথে বেরিয়ে বুঝেছি ঘর না থাকার কষ্ট। অভাবে পড়ে দু/পাঁচ পয়সার জন্যে কী না করতে হয়েছে। বাজে লোকের পাল্লায় পড়ে বিপথে যেতে বসেছিলাম। অভাবের মাশুল দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত হয়ত একদিন বড় অপরাধী হয়ে উঠতাম। বাড়িতে থাকতে বুঝতে পারিনি বাইরে কত বিপদ লুকিয়ে থাকতে পারে। এখন ঠেকে শিখলাম। ঝোঁকের মাথায় পালিয়ে না গিয়ে বাড়িতে ইস্কুলে নিজের সমস্যার জন্যে সাহায্য চাওয়াই দরকার।' □

'কাঞ্চন'-এর রোগ নিরাময় কি অসম্ভব ?

'কাঞ্চন' বড় আদরের ব্র্যান্ডনেম। জ্যাম, জেলি, স্কোয়াশের বাজারে ভারতজোড়া খ্যাতি ছিল। কিন্তু দার্জিলিং ফুড অ্যান্ড ভেজিটেবল প্রসেসিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের দৈন্যদশা এতই চরমে পৌঁছেছে যে তার হাতে আজ চিনি কেনার পয়সা পর্যন্ত নেই। ওয়ার্কিং ক্যাপিটল শূন্য, হাতে পেনসিল অথচ কাঁধে দেনার দায় ২৮ লক্ষ টাকা। কাঞ্চনে উৎপাদন বন্ধই বলা চলে, হঠাৎ টুকটাক কাজ, প্রাইভেট পার্টির অগ্রিম হাতে নিয়ে। স্থায়ী কর্মীরা জানেন না এরপর তারা আর মাইনে পাবেন কি না। ১১ এপ্রিল থেকে ৩৪ জন ক্যাজুয়েল শ্রমিককে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজ নেই তাই লে-অফ। প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা জমা পড়েনি সুদীর্ঘ পাঁচ বছর। প্রত্যহ দুই মেট্রিক টন ফিনিশড প্রোডাকটের উৎপাদনক্ষমতা - সম্পন্ন কাঞ্চনকে বাঁচাতে এই মুহূর্তে চাই ৩৭ লক্ষ টাকা, হিসাব সরকারি স্তরের। কাঞ্চনকে গলা টিপে হত্যা করছে কো-অপরেটিভ দপ্তর, অভিযোগ সরকারি – বেসরকারি সমস্ত স্তরেই। কর্মীদের তো বটেই। কাঞ্চনে অর্থনৈতিক ধস নামা শুরু ১৯৮৪ থেকেই। ছিয়াশিতে একবার বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। ২৮ জন স্থায়ী কর্মী তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যখন চিন্তিত, তখন রাজ্যের সমবায় দপ্তরের নিদ্রা কিন্তু কুম্ভকর্ণের মতই। সংস্থার একমাত্র কর্মী ইউনিয়ন সিটুর, তাদের উদ্যোগেই চলছে লাগাতার ধর্না এখানকার সমবায় দপ্তরের সামনে।

পঁচাশি সালে কাঞ্চনের বোর্ড অফ ডিরেক্টদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কাঁড়ি কাঁড়ি অভিযোগ দাখিল করা হলে ওই বোর্ডের সদস্যরা পদত্যাগ করেন। তারপর থেকে চলতে থাকে কাঞ্চন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। জুলাই সাতাশিতে দার্জিলিঙের জেলাশাসক দেবীপ্রসাদ পাত্রকে সংস্থার প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ করা হলে উনি ওই বছরের অক্টোবর মাসে জেলার রুরাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা ঋণদানের বন্দোবস্ত করেন। সংস্থার কলকাতা অফিস তুলে দিতে খরচা হয় এক লক্ষ টাকা। সেন্ট্রাল একসাইজের বকেয়া মেটাতে খরচা হয় ৬৮০০০ টাকা।

১৯৭৮ সালে কাঞ্চন এরকম ডেডলক অবস্থায় পৌঁছালে ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাগ্রো ইনডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন এটিকে ৫০ বছরের লিজে নিতে আগ্রহী হয়, তৈরি হয় চুক্তির খসড়া। কিন্তু তৎকালীন সমবায় মন্ত্রী সেটিকে প্রেস্টিজ ইস্যু করায় তা সম্ভব হয়নি। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ার মত এখন দেখা যাচ্ছে জোড়াতালি দিয়ে কোনক্রমে '৮২ – '৮৪ পর্বে হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যবসা করা গেলেও ওই পর্বের বোর্ড কর্তাদের দুর্নীতি ও গাফিলতিই কাঞ্চনকে লাটে তুলে দেবার বন্দোবস্ত করে। সংস্থার তৎকালীন চেয়ারম্যান যিনি একদা দার্জিলিঙের এ ডি এম, পরে জলপাইগুড়ির জেলাশাসক সুনীল মিত্র, একজিকিউটিভ অফিসার বি জি গুপ্তচৌধুরী, মার্কেটিং ম্যানেজার পি সেনগুপ্তর সম্মিলিত অদূরদর্শিতার ফল ভুগছে কাঞ্চন। ওই আমলে কলকাতা ও দিল্লিতে গোডাউন-অফিস ভাড়া নিয়ে এন্তার খরচা করা হয়। শেষের দিকে এক আর্থিক বছরে শুধু বিজ্ঞাপনের পেছনেই খরচা করা হয় ৩ .৮৫ লক্ষ টাকার মত। কেন্দ্রীয় সরকারের 'নাফেড' দিল্লিতে এর আগে পর্যন্ত কাঞ্চনের মার্কেটিং করলেও ওই কোম্পানির তৎকালীন মার্কেটিং ম্যানেজার জনৈক জি জি সেখানে অফিস-ব্যবসা সামলানোর দায়িত্ব নেন। মার্কেটিং ম্যানেজার পি সেনগুপ্ত কাঞ্চনের মানি রিসিপ্ট ব্যবহার না করে সাদা কাগজে ও প্যাডে লিখে বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা আদায় করেন। কাঞ্চনের নামে রসিদ দিয়ে নেন সেলফ চেক। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ডানলোপিলো ম্যাট্রেস থেকে আরম্ভ করে পিলো কভার পর্যন্ত কেনেন কাঞ্চন একাউন্টে। প্রচুর ভুয়ো বিল জমা পড়ে কাঞ্চন একাউন্টে। নয়'শ ছ টাকার মুদ্রণ বিলের অঙ্কটিকে 'টুয়েন্টি নাইন হানড্রেড সিক্স' লিখে পেমেন্ট করার মত ঘটনা তো বহু। তা সেনগুপ্ত মহাশয়ের বিরুদ্ধে পুলিশি মামলাও রুজু করা হয়। ওঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কলকাতায়। একজিকিউটিভ অফিসার মিঃ গুপ্তচৌধুরী সাতদিনের ছুটি নিয়ে বসে যান। অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার অব কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ তদন্ত করলে সব গরমিলই ধরা পড়ে। কিন্তু শাস্তি কারও হয় না।

তৎকালীন ডিরেকটরদের মধ্যে ডেপুটি রেজিস্ট্রার অব কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ এন লেপচা অন্যতম। এখন ওই লেপচাবাবুর অফিসের সামনেই চলছে কাঞ্চন বাঁচাতে কর্মীদের অবস্থান। হিমুলে একদিন ওঁর সঙ্গে দেখা, বললাম কথা আছে। পরে হবে, নিজেই আসবেন জানালেন। বাস তারপর দেখা নেই আর। কাঞ্চন বাঁচাতে ২৮ লক্ষ টাকার একটি প্রজেক্ট জেলাশাসক দেবীপ্রসাদ পাত্র প্রশাসন নিয়োজিত হবার পর পাঠান সমবায় দপ্তরে, সেটি কলকাতায় পর্যন্ত পাঠায়নি সমবায় দপ্তর, অভিযোগ বিভিন্ন মহলের। এমনকি নাফেড যে ছিয়াশি সালে কাঞ্চনকে গোডাউন তৈরির জন্য সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দিয়েছিল সেটির দেড় লক্ষ টাকা আটকে রেখেছে সমবায় দপ্তর।

পঁচাশিতে প্রতি পিস দশ টাকা বাজারদরের টেবিল ক্যালেন্ডার ২৫০ পিস কেন আশি টাকা দরে কেনা হয়েছিল বা দেড় টাকা দরের দুহাজার পিস ক্যালেন্ডার কেন দশ টাকা পিসে কেনা হয়েছিল তা নিয়ে এখন ভাববার সময় কোথায় কাঞ্চন কর্মীদের। কর্মী ইউনিয়নের সম্পাদক শশাঙ্ক মোদক জানালেন হয় সংস্থাটিকে নাফেডের হাতে তুলে দেওয়া হোক, নতুবা দেওয়া হোক জয়েন্ট সেকটরে। এসব সম্ভব না হলে জলপাইগুড়ির তিস্তা ফ্রুট প্রোডাকশন লিমিটেড নামের সংস্থাটিকে জুড়ে দেওয়া হোক কাঞ্চনের সঙ্গে, কেন না ওদের প্রসেসিং ইউনিট নেই। পরিহাসের মত শোনালেও কাঞ্চনে রাজ্য সরকারের শেয়ারের পরিমাণ ৯৬ শতাংশ। এদিকে জেলাশাসক দেবীপ্রসাদ পাত্রের উদ্যোগে ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ মিলক প্রোডিউসার ফেডারেশন লিমিটেডের সঙ্গে এক চুক্তি হয়েছিল। জুলাই মাসে মালও সরবরাহ করা হয় ২০,০০০ টাকার। কিন্তু তারপর ? 'কাঞ্চন'; চোদ্দ বছরের এই কিশোরটির হাত পা সবই যে পঙ্গুত্বের শিকার ! এই রোগ নিরাময় কী সম্ভব নয় ? □

তুষার প্রধান



ফটো সৌগত রায় বর্মণ

শত্রু-সম্পত্তিঃ ভুয়ো দলিল দেখিয়ে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ

নেহরু-লিয়াকত চুক্তি স্বচ্ছন্দে তৈরি করতে পারত ভাব-ভালবাসার বাতাবরণ। কিন্তু দুর্ভাগ্য তা হল না। ফলে জন্ম নিল 'শত্রু-সম্পত্তি' নামের এক জটিল এবং সংঘাতময় বিষয়। যাকে ঘিরে গড়ে উঠল দালালচক্র। প্রকৃত দাবিদারদের অজ্ঞাতে তাঁদেরই সম্পত্তির বিনিময়ে অর্জিত কোটি কোটি টাকায় পুষ্ট হতে থাকল একশ্রেণীর সুবিধাভোগী। পরিবর্তন-এর প্রতিনিধি উজ্জ্বল পাল তাঁর একনিষ্ঠ তদন্তে তুলে এনেছেন সেই জাল-জালিয়াতির নেপথ্যকাহিনী।

১৪ নং নেতাজী সুভাষ রোডে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য দপ্তরের একটি অফিস আছে। নাম – কাসটডিয়ান অব এনিমি প্রপার্টি অফিস। এর সদর দপ্তর বোম্বাই। কলকাতার অফিসকে বলা হয় প্যানেল অফিস। '৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর তৎপরতায় তৎকালীন জনতা সরকার কলকাতায় এই অফিসটি খোলেন। পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে সম্পত্তি ফেলে যে সকল হিন্দু উদ্বাস্তু ভারতে চলে আসে, তাদের সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ দেওয়াই কাসটডিয়ান অব এনিমি প্রপার্টি অফিসের কাজ। কিন্তু বোম্বাইতে সদর দপ্তর হওয়ার জন্য শতকরা ৯৯জন বাঙালি হিন্দুই জানতো না যে ফেলে আসা সম্পত্তির জন্য ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়। '৭৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত এই ক্ষতিপূরণের সিংহভাগই পেয়ে এসেছে পশ্চিম পাকিস্তানের হিন্দু শরণার্থীরা অর্থাৎ পাঞ্জাবিরা।

কেন্দ্রীয় সরকার বরাবরই স্বীকার করেছেন, পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সমস্যা অনেক বেশি। তুলনায় পাঞ্জাবিদের কম। পশ্চিম পাকিস্তান বরাবরই মুসলমানদের দখলে ছিল। সেখানকার শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্য সংস্কৃতি সবই দখলে ছিল মুসলমানদের। অপরদিকে পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও সেখানকার শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্য সংস্কৃতি জমিদারি মায় শাসনব্যবস্থা সবই ছিল হিন্দুদের হাতে। হিন্দুদের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৪৩ শতাংশ। স্বাধীনতার আগে এবং পরে পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এমনভাবে মাথাচাড়া দেয় যে তার ধাক্কা সামলাতে না পেরে হিন্দুরা দলে দলে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে চলে আসতে আরম্ভ করে পশ্চিমবঙ্গে। ফলে শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্য এবং জমিদারি সবই পড়ে থাকে পূর্ববঙ্গে।

দুই দেশের মধ্যেই যখন একটা জাতি বিরোধ সংঘাত তীব্র আকার নেয়, তখনই ১৯৫০ সালে দুই প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং লিয়াকত আলি খান দুই দেশের মধ্যে সম্প্রীতি সৌহার্দ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং জাতি-দাঙ্গা বন্ধ করতে এগিয়ে আসেন। সম্পাদিত হয় ঐতিহাসিক নেহরু-লিয়াকত চুক্তি। কিন্তু লিয়াকতের মৃত্যুর পর পাকিস্তান ভারতের প্রতি বৈরিতা দেখাতে শুরু করে। ইতিমধ্যে দাঙ্গার ভয়াবহতায় অনেক মুসলমান বাড়ি ঘর ছেড়ে চলে যায় পাকিস্তানে। পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা একইভাবে তাদের বাড়িঘর ছেড়ে চলে আসে ভারতে। প্রথমে পাকিস্তান সরকার সেখানে ছেড়ে আসা হিন্দুদের সম্পত্তিগুলিকে শত্রু-সম্পত্তি বলে ঘোষণা করে। ভারত সরকার প্রথমে কিন্তু এই পদক্ষেপ নেয়নি। কিন্তু লিয়াকতের মৃত্যুর পর পাকিস্তানের বৈরি মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারও মুসলমানদের ছেড়ে যাওয়া বাড়িগুলিকে শত্রু সম্পত্তি বলে ঘোষণা করে। এবং ১৯৫৪ সালে কমপেনসেশন অ্যাক্ট অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ আইন চালু করা হয়। সেই সঙ্গে তৈরি হয় কাসটডিয়ান অব এনিমি প্রপার্টি। এই অফিসের কাজ নির্ধারিত হয় প্রথম শত্রু-সম্পত্তিগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং দ্বিতীয়ত পাকিস্তান থেকে সম্পত্তি ফেলে আসা হিন্দুদের সেই সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ দেওয়া।

এনিমি প্রপার্টির অফিসের সদর দপ্তর বোম্বাইতে হওয়ায় অধিকাংশ বাঙালিই ক্ষতিপূরণের বিষয়টি জানতো না। ফলে শুধুমাত্র স্থায়ী পুনর্বাসন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নয় ক্ষতিপূরণের সিংহভাগই পেয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের হিন্দুরা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য পশ্চিম পাকিস্তানের হিন্দুদের পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে খরচ করেছেন ৫০০ কোটি টাকা, সেখানে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের জন্য খরচ করেছেন মাত্র ২০০ কোটি টাকা। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু এসেছে ৪৭ লক্ষ। আর পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দু বাঙালি এসেছে প্রায় ৮০ লক্ষ। পাঞ্জাবিদের সমস্যার সমাধান হয়েছে। সমস্যার সমাধান হয়নি পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বাঙালি হিন্দুদের।

এই বৈষম্যর বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে '৫০ সাল থেকেই বামপন্থীদের নেতৃত্বে উদ্বাস্তু আন্দোলন তীব্র আকার নিয়েছে। '৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন এবং ক্ষতিপূরণের বিষয়টি নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। কলকাতায় কাসটডিয়ান অব এনিমি প্রপার্টি অফিস খোলার জন্য বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রের তৎকালীন জনতা সরকারের কাছে দাবি জানান। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু নিজে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হন এবং প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই-এর সঙ্গে কথা বলেন। '৭৮ সালে ১৪ নং নেতাজী সুভাষ রোডের শত্রু-সম্পত্তি বলে চিহ্নিত বাড়িটিতে খোলা হয় কাসটডিয়ান অব এনিমি প্রপার্টি অফিস। এটিকে বলা হয় প্যানেল অফিস।

এই অফিসের বিরুদ্ধে এখন চরম দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এই অফিসেই ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়ে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের দরখাস্ত করতে হয়। এই অফিসের টাকা মঞ্জুর করার কোন অধিকার নেই। এই অফিস শুধু বোম্বাইতে সদর দপ্তরে সুপারিশ করে মাত্র। এই অফিসটির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে যে ভুয়ো দলিল দেখিয়ে অনেক লোক কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। এর সঙ্গে কলকাতা অফিসের কিছু অফিসার এবং কর্মচারী জড়িত বলে অভিযোগ উঠেছে। ক্ষতিপূরণের দরখাস্ত এবং দলিল খতিয়ে দেখেই এই অফিস বোম্বাইতে সুপারিশ করে। অফিসার এবং কর্মচারীদের যোগসাজস না থাকলে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করা যায় না। এই ধরনের বহু অভিযোগ সি বি আই দপ্তরে আসার পরই সি বি আই অফিসাররা তদন্তে নেমেছেন। এই সম্পর্কে কিছু জানতে চাওয়া হলে একজন সি বি আই অফিসার এই প্রতিবেদককে বলেন, তদন্তের স্বার্থে এখন কিছু বলা যাবে না। কারণ কোটি কোটি টাকা কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে আত্মসাৎ হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। সি বি আই অফিসাররা এখন মাঝে মাঝেই এই অফিসে এসে কাগজপত্র পরীক্ষা করছেন। কিছু কিছু কাগজপত্র তাঁরা তাঁদের দপ্তরেও নিয়ে গেছেন। জানা গেল, এর মধ্যে রয়েছে, অনেক ভুয়ো দলিল। সি বি আই অফিসাররা সন্দেহ করছেন এই দুষ্কর্মের পেছনে একদল দালাল সক্রিয় রয়েছে। এই দালালরা অর্থে বলশালী। এদের সঙ্গে কলকাতা বোম্বাই অফিসের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। একজন সি বি আই অফিসারের ভাষায় – এটি একটি চেন। এমনকি এই দালালদের বাংলাদেশেও এজেন্ট রয়েছে। শুধু ভুয়ো দলিল নয়, প্রকৃত দাবীদাররাও টাকা পাওয়ার জন্য এই দালালদের শরণাপন্ন হন। কারণ টাকা পেতে তিন চার বছরেরও বেশি সময় লেগে যায়। তাই তাড়াতাড়ি পাবার জন্য প্রকৃত দাবীদাররা এই দালালদের সাহায্য নেন। দালালরা কমিশন নিয়ে টাকা পাইয়ে দেয়।

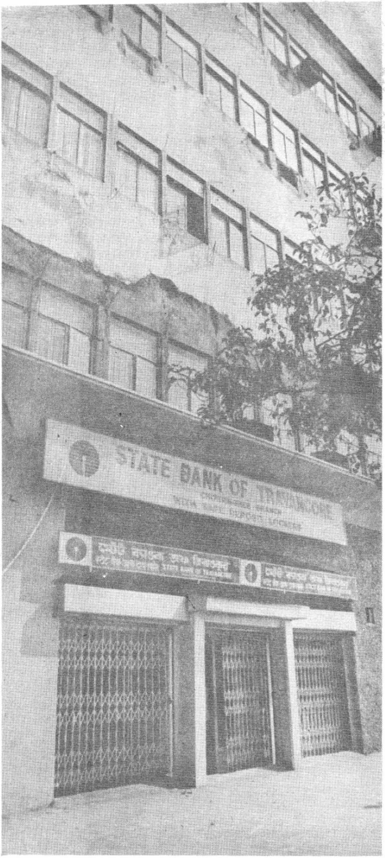
'৮৪-'৮৫ সালেও একবার এই অফিসটির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এসেছিল। তখনও সি বি আই তদন্তে নেমেছিল। ঐ সময় প্রায় এগার মাস ঐ অফিসে সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ ছিল। এই তদন্তের ফলেই তৎকালীন এই অফিসের ডিরেক্টর যোগীন্দর সিংকে অন্যত্র বদলি করা হয় বলে অনেকে বলেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে এই অফিসারের অভিজ্ঞতা থাকায় তাঁকে কলকাতার অফিসে এনে বসানো হয়। বর্তমানে এই অফিসে কোন ডিরেক্টর নেই। অফিসটি বাণিজ্য দপ্তরের অধীন। তাই বাণিজ্য দপ্তরের বিভিন্ন শাখার কর্মচারীদের এই অফিসে ডেপুটেশনে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে এই অফিসের দায়িত্বে আছেন একজন সহকারী ডিরেক্টর বি বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি এসেছেন এজরা স্ট্রিটের এক্সপোর্ট ইন্সপেক্সন অফিস থেকে। এই প্রতিবেদক কাসটডিয়ান অফিসের কাজকর্ম সম্পর্কে বি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে জানতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কোন কথাই বলতে চাননি। দুর্নীতির বিষয় বা সি বি আই তদন্ত সম্পর্কে তিনি কোন মন্তব্য করতেই অস্বীকার করেন। এই প্রতিবেদক এরপর সাধারণ কতকগুলি বিষয় জানতে চান। কেমন করে এই অফিস

স্থাপিত হয়েছে, কীভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে উদ্বাস্তুদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় ইত্যাদি। এর জন্য তিনি একদিন সময় চান। পরের দিন এই প্রতিবেদক সেখানে হাজির হলে তিনি বলেন, দুঃখিত আপনাকে কোন কথাই বলতে পারছি না। বোম্বাই অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। কিন্তু তাঁরা সাংবাদিকদের সঙ্গে কোন কথা না বলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর একজন অফিসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্টেনোকে নোট দিলেন – বোম্বাই অফিসকে চিঠি লিখুন এবং জানতে চান তাঁরা সাংবাদিকদের কোন কথা বলতে পারেন কি না।

দুর্নীতির কথা তো দূরের ।এই অফিসের নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কেও কেউ কিছু বলতে রাজি নন। অফিসার বলেন, কোন দাবিতে জটিলতা দেখলেই তাঁরা পুলিশকে জানিয়ে দেন। কোন একটি নির্দিষ্ট ঘটনা জানতে চাই। কিন্তু তিনি বলেন – আর কোন কথা নয়। এর পর লালবাজারে গোয়েন্দা দপ্তরে খোঁজ নিই, কাস্টডিয়ান অব এনিমি প্রপার্টি অফিস কর্তৃপক্ষ কোন জালিয়াতির ঘটনায় তাঁদের তদন্তের জন্য বলেছেন কি না। গোয়েন্দা দপ্তর এরকম কোন ঘটনার কথা মনে আনতে পারেনি।

'৮৪-'৮৫ সালের সি বি আই তদন্তে কী প্রকাশ হয়েছিল সে সম্পর্কেও কোন কিছু জানা যায়নি। উদ্বাস্তু আন্দোলনের একজন নেতা এ সম্পর্কে বলেছেন, কে কার তদন্ত করবে ? সরষের মধ্যেই ভূত। কিন্তু বিষয়টি বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভাবিয়ে তুলেছে। এবারে যেন সি বি আই একটু নড়েচড়ে বসছে। ভুয়ো দলিল এবং জাল পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দেখিয়ে কাস্টডিয়ানের অফিস থেকে কোটি কোটি টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। কীভাবে এই কাজগুলি হয় সে কথাই বলি।

ক্ষতিপূরণ পেতে হলে জমিজমার হিসেব দিয়ে দলিলসহ দরখাস্ত কলকাতা অফিসে জমা দিতে হয়। কাস্টডিয়ান অফিসে এই দরখাস্ত খতিয়ে দেখার জন্য কতকগুলি প্যানেল তৈরি হয়। এই প্যানেলগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব দপ্তরের অফিসাররাও থাকেন। তাঁরাই দলিল তৈরির সালের ওপর ভিত্তি করে সম্পত্তির পরিমাণ নির্ধারিত করেন। প্রথম দিকে দেওয়া হত নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের এক-চতুর্থাংশ। এখন দেওয়া হয় এক-দশমাংশ। কলকাতার দালালদের সঙ্গে বাংলাদেশের দালালদের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। শোনা যায় কলকাতার দালালরা এসব কাজ করার জন্য ট্রেনের টিকিটের দালালদের মতো রীতিমতো অফিস সাজিয়ে গুছিয়ে বসেছে। পঞ্চাশ বা একশ বছর আগেকার দলিলের কপি এখন আর পাওয়া যায় না। দেশ বিভাগের পর



ফটো : অভিজিৎ রায়

প্রশাসন ভাগ হয়ে যাওয়ায় এসব আর ঠিক মতো গচ্ছিত রাখা যায়নি। আগেই বলেছি অধিকাংশ পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা ক্ষতিপূরণের বিষয়টি জানতেন না। এই সুযোগ নিয়েছে দালালরা। কলকাতা অফিসে তারা দেখে নিতেন কাদের দরখাস্ত জমা পড়েছে। এ ছাড়াও তারা বাংলাদেশের দালালদের দিয়ে দরখাস্ত যাদের জমা পরেনি তাদের জমিজমা সংক্রান্ত খোঁজ খবর নিতেন। এবং বাংলাদেশ থেকে ঐ জমির ভুয়ো দলিল তৈরি করিয়ে আনতেন। সেই জমির কাগজপত্র কলকাতা অফিসে জমা দিতেন। এছাড়া মালিকের নামে পাওয়ার অব অ্যাটর্নিও করিয়ে নেওয়া হয়। দালালরা পাকিস্তান এবং ভারতের বৈরি সম্পর্কের সুযোগ নিয়েছে। কারণ এই সব দলিল সঠিক কি না তার সত্যতা যাচাইএর কোন সুযোগ কলকাতা অফিসের ছিল না। কলকাতায় বসেই এখন সম্পত্তির দলিল জাল করা হয়। বাংলাদেশের অফিসগুলিতে পুরানো আমলের দলিল দেখে তার স্ট্যাম্প সই সমস্ত কিছু জাল করে দলিল তৈরি করা হয়েছে। পঞ্চাশ বছর আগে কলকাতাতেও দলিল তৈরি করা হতো। পূর্ববঙ্গের অনেক লোকই জমিজমা সংক্রান্ত দলিল কলকাতায় করতেন। তাদের দলিল কলকাতার রেজিস্ট্রি অফিসেই থাকার কথা। কাজেই কলকাতায়ও দালালরা এই সব দলিল এবং ম্যাজিস্ট্রেটের সইও জাল করে স্ট্যাম্প বানিয়ে ফেলেছে। এবং ভুয়ো নামে এসব দলিল জাল করা হয়েছে। এবং তা দেখিয়ে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। যা ধরা কাসটডিয়ান অফিসের অসাধ্য হয়েছে।

দালালদের উচ্ছেদ করা শুধু সি বি আই বা সৎ অফিসারের পক্ষেও সম্ভব নয়। যদি না প্রকৃত দাবিদাররা এ ব্যাপারে সচেতন না হন। কারণ পূর্ববঙ্গে সম্পত্তি ছেড়ে আসার পর তারা কখনও চিন্তা করতে পারেননি যে ক্ষতিপূরণ পাবেন। ফলে দালালদের কমিশন দিয়ে যদি কিছু টাকা পাওয়া যায় ক্ষতি কী? কলকাতা অফিসে কয়েকদিন ঘোরাঘুরির সময় এই প্রতিবেদক অনেক প্রকৃত দাবিদারের দেখা পেয়েছে। কাসটডিয়ান অফিসে বসেই তারা বিলম্বের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু বিস্তারিত কিছু বলতে এই প্রতিবেদককে অস্বীকার করেছেন। একজন মহিলা তো বলেই বসলেন, খবর কাগজে নাম ছাপিয়ে টাকা পাবার পথটাও বন্ধ করব নাকি। শুধু তিনি বললেন, বাংলাদেশের টাঙ্গাইলে তাদের কয়েকশো বিঘা জমি ছিল। অবশ্য জমি তার নিজের নয়। তার বোনের। বোন মারা গেছে। মরার আগে তাকে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দিয়ে গেছে। কলকাতার ব্যাংকশাল কোর্টে একসময় দলিল জাল করা হতো এবং ঘুষ দিয়ে নোটারিকে দিয়ে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি করানো হতো। '৮৪-'৮৫ সালে সি বি আই-এর তদন্তের পর ব্যাংকশাল কোর্টে এ জিনিস বন্ধ করা হয়েছে। সাধারণত একজন দাবিদারের ক্ষতিপূরণের টাকা পেতে চার পাঁচ বছর সময় লাগে। কিন্তু ঘুষ দিয়ে দালালের মাধ্যমে এক বছরের মধ্যে পাওয়া যায় বলে শোনা গেছে।

প্রয়াত সি পি আই নেতা সংসদ সদস্য ভূপেশ গুপ্ত '৭৬ সালে সংসদে বিষয়টির অবতারণা করেন। তখন দেখা গেছে প্রভাবশালী লোকেরাই শত্রু-সম্পত্তি থেকে টাকা পাচ্ছে। তাই ভূপেশ গুপ্ত, কারা টাকা পেয়েছে তাদের একটি তালিকা পেশ করে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, আপনারা তেলা মাথায় তেল দিচ্ছেন। রাজার ছেলে ভূপেশ গুপ্তর বাংলাদেশে প্রচুর সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি তার দাবি ছেড়ে দেন। অবশ্য তার ভাইয়েরা তাদের অংশের ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। প্রভাবশালী বড়লোকেরা যারা পূর্ববঙ্গ থেকে চলে এসেছেন এপারে, তারা সকলেই তাদের ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন।

নেহরু-লিয়াকত চুক্তি অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানে যারা সম্পত্তি ছেড়ে চলে আসে তাদের সম্পত্তি যাতে বেদখল না হয়ে যায় তার জন্য পাকিস্তান সরকার ইভাকুই প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। ভারতেও সেভাবে একটি কমিটি করা হয়। তাতেই ঠিক হয়েছিল দুই দেশেই বাড়িগুলিকে ভাড়া দিয়ে যা আয় হবে, সেই আয় থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। তখন শত্রু-সম্পত্তি বলে কথা ওঠেনি। শত্রু কথাটা এল ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পর। পাকিস্তান ভারতকে শত্রু বলে ঘোষণা করল এবং পাকিস্তানে ভারতীয় সব সম্পত্তিই শত্রু-সম্পত্তি বলে গণ্য হল। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অধিকাংশ হিন্দুই স্বাধীনতার পরেই চলে এসেছিল। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা সেভাবে আসেনি। '৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা দলে দলে ভারতে চলে এল। এসে মাথা গুঁজল পশ্চিমবঙ্গে।

আগেই বলেছি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যেসব হিন্দুরা ভারতে চলে আসে তাদের মধ্যে কম সংখ্যকই ছিল বড়লোক। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের একটি বড় অংশ ছিল ধনিক সম্প্রদায়। পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের কী না ছিল? চটকল, চিনির কল, কটন মিল, হাসপাতাল জমিদারী সবই ছিল হিন্দুদের। এই সকল মিল মালিকরা সকলেই কিন্তু ক্ষতিপূরণ পেয়ে গেছে। বাঙালিদের মধ্যে যারা ক্ষতিপূরণ পেয়েছে তাদের মধ্যে আছে পাত্রভোলা টি এস্টেট – এক কোটি টাকা, ভাগ্যকুলের কুন্ডুরা – এক কোটি টাকা, স্নেহাংশু আচার্য ও তাঁর দুই ভাই – ৬৬ লক্ষ টাকা, মোহিনী মিল – তেত্রিশ লক্ষ টাকা প্রমুখ। এছাড়া জমিদাররা কম বেশি ৪ থেকে ৫ লক্ষ টাকা করে তো পেয়েছেই।

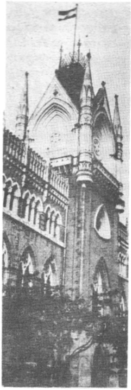
'৭৭ সালের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত দরখাস্ত জমা দেবার শেষ তারিখ ছিল। ৪০ লক্ষ বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে এসেছেন। কিন্তু দরখাস্ত করতে পেরেছেন মাত্র ৬৫ হাজার। একটি বেসরকারী হিসাবে জানা যায় কাসটডিয়ান অব এনিমি প্রপার্টি থেকে প্রায় একশ কোটি টাকা এ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। কলকাতায় কাসটডিয়ান অফিসের কর্তারা বলেছেন তারা কোন হিসাব রাখেননি। এরকম কোন হিসাবও কখনো করা হয়নি। সরকারও কখনো চাননি।

ভারতেও মুসলমানদের যে একেবারে কোন সম্পত্তি ছিল না তা নয়। তবে হিন্দুদের তুলনায় কম। যেমন লিয়াকত আলি নিজেই ছিলেন উত্তরপ্রদেশের জমিদার। জুলফিকার আলি ভুট্টোর বাবার ছিল সিমলায় জমিদারী। জুনাগড় রাজ্য ভুট্টোদের ছিল। তাঁরা পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন কিনা তা অবশ্য জানা যায় না। স্থাবর সম্পত্তি নিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু ভুট্টোর বাবার অস্থাবর সম্পত্তি ছিল ২০টি কুকুর। তিনি কুকুরগুলিকে নিয়েই পাকিস্তান পাড়ি দিয়েছিলেন। এসব ইতিহাস থেকেই জানা যায়।

ইন্দিরা গান্ধী উদ্বাস্তুদের প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল ছিলেন। শ্রীমতী গান্ধীর রাজত্ব কাল থেকে মোরারজী দেশাই পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ বাবদ সম্পত্তির মোট মূল্যের এক-চতুর্থাংশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চরণ সিং প্রধানমন্ত্রী হয়ে ক্ষতিপূরণ দেওয়া বন্ধ করে দেন। তারপর আবার যদিও চালু হয়েছে কিন্তু তাও এক-দশমাংশ। এখন ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারটা একেবারেই ঢিমেতালে চলছে। কলকাতা অফিসে ১২০০ আবেদনকারীর টাকা মঞ্জুর হয়ে থাকা সত্ত্বেও তাঁরা টাকা পাননি।

যে অফিসের পিছনে রয়েছে অনেক ইতিহাসের কাহিনী সে নিজেই হয়ে উঠেছে এখন তদন্তের কাহিনী। ১৪ নং নেতাজী সুভাষ রোডের অফিসটিতে প্রবেশ করামাত্র কতগুলি বড় বড় নোটিশ চোখে পড়বে। নোটিশগুলিতে লেখা আছে – 'কেউ যদি বলেন যে তিনি প্যানেল মেম্বার, চেয়ারম্যান বা অন্য কাউকে দিয়ে কোন কাজ করিয়ে নিতে পারবেন তিনি মিথ্যাবাদী ও প্রতারক। তার সম্বন্ধে গোপন রিপোর্ট করুন অথবা অফিসের নালিশের বাক্সে রিপোর্ট ফেলে দিন।' আবার লেখা আছে, 'অনুদান কর্মীদের সুবিধার্থে জানানো যাচ্ছে তাহারা অনুদান সংক্রান্ত বিষয়ে যেন দালাল শ্রেণীর লোকের প্রলোভনের স্বীকার না হন'। দুটি নোটিশ-বিরোধী কাজই এখন কলকাতার অফিসে চলছে। তাই শুরু হয়েছে সি বি আই তদন্ত। □

ছেলে বাবাকে খুন করেও পাগল বলে রেহাই পেয়ে গেল



ঘটনাস্থল ওড়িশার রানপুর থানার অন্তর্গত একটি ছোট গ্রাম। উচ্ছব সাহু বাস করত ছেলে-বৌ নিয়ে ঐ গ্রামটিতে। উচ্ছবকে গ্রামের লোকজন 'পাগলা' বলে ডাকত। মাঝে মধ্যেই উচ্ছব তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলত। দেখা যেত তার মধ্যে একটা দারুণ উত্তেজনা। উচ্ছব সাহু স্ত্রী ছেলে নিয়ে বছর দশ আগেই বাবার সংসার থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। বাবার সংগে যোগাযোগ খুবই কম ছিল। ১৯৮১ সালের ২৫ নভেম্বর সন্ধের সময় হঠাৎ উচ্ছবের বাবা উচ্ছবের বাড়িতে এসে হাজির হয়। উচ্ছবের বাড়িতে ঢুকে তার বাবা শুনতে পেল, উচ্ছব তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করছে। বৌকে এভাবে গালমন্দ করতে বাবা উচ্ছবকে বারণ করল, বৌয়ের সংগে এই ধরনের অশোভন ব্যবহার করতে নিষেধ করল। বাবা বারণ করায় উচ্ছব আরো চটে গেল। উত্তেজিত হয়ে উঠল বাবার উপর। উত্তেজনায় বাবাকে ধাক্কা মেরে বাড়ির বাইরে বের করে দিল। চোখ বাড়িয়ে বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলল –বাবা যেন তার বাড়িতে আর কোনদিন না আসে। তার ব্যাপারে তার বাবা নাক গলালে সে তীর মেরে বাবাকে প্রাণে শেষ করে দেবে। উচ্ছবের বাবা ছেলের এই ধরনের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে চলে যাচ্ছিল। এই সময় হঠাৎ উচ্ছব তার তীর-ধনুক বার করে আনে। তীর-ধনুক বার করেই বাবার বুক লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ে মারল। তীরের ফলাটি বাবার বুকে ঢুকে তার হৃৎপিন্ড ভেদ করে গেল। তীরবিদ্ধ অবস্থায় উচ্ছবের বাবা চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল। উচ্ছবের বাবার আর্তনাদ শুনে লোকজন ছুটে এল। তীরটি বুকে গেঁথে যাওয়ায় এই অবস্থায় তীর বার করে আনা গেল না। উচ্ছবের বাবাকে গ্রামবাসীরা রাজসুনখালা হাসপাতালে নিয়ে গেল। অবস্থা বিবেচনা করে ডাক্তারবাবু আহত বাবাকে তাড়াতাড়ি একটি ইনজেকশন দিলেন। তীরের ফলাটি অপারেশন না করে ডাক্তারবাবুও বার করতে পারলেন না। আধঘন্টার মধ্যেই মৃত্যু ঘটল উচ্ছবের বাবার। তীরটি তখনও তার বুকে আটকে ছিল।

এরপর লিখিতভাবে ঘটনাটি জানানো হল রাজসুনখালা পুলিশ চৌকিতে। একজন এ এস আই লিখিত রিপোর্টের ভিত্তিতে পুলিশ চৌকির ডাইরিতে ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করে নিল। লিখিত রিপোর্টটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল রানপুর থানায়। নিয়মমাফিক রানপুর থানা একটি খুনের মামলা রুজু করল খুনী উচ্ছবের বিরুদ্ধে।

শুরু হল হত্যা মামলার তদন্ত। তদন্ত শেষে তদন্তকারী পুলিশ অফিসার উচ্ছবের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০২ ধারায় চার্জশিট দাখিল করল। বিচারের জন্য মামলাটি পাঠানো হল দায়রা আদালতে।

শব ব্যবচ্ছেদকারী ডাক্তারের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, উচ্ছবের বাবার বুকে বিঁধে থাকা তীরের ফলাটি তিনি বার করেছিলেন শব ব্যবচ্ছেদের সময়। তীরটি আদালতে এগজিবিট হিসেবে দাখিল করা হয়। ডাক্তার আদালতকে জানালেন –তীরবিদ্ধ হয়ে আহতের দেহে যে ক্ষত হয়েছিল, সেই ক্ষতই মৃত্যুর কারণ।

দায়রা মামলা চলাকালীন আসামী উচ্ছবের তরফে বলা হল, আসামী উচ্ছব অপরাধ করার সময় ছিল পাগল। উন্মত্ত অবস্থায় তার হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। ভাল বা মন্দ কাজ সম্বন্ধে বোঝার মত তার মানসিক অবস্থা ছিল না। ঘটনার সময় উচ্ছব পাগল থাকায় মামলার আসামী ভারতীয় দন্ডবিধির ৮৪ ধারার পরিধির মধ্যে আসবে। তা যদি আসে তাহলে আসামী অপরাধ করলেও মুক্তি পাওয়ার হকদার। পাগলের সাজা হতে পারে না।

দায়রা আদালত আসামী তরফের যুক্তি মেনে না নেওয়ায় ও উচ্ছবের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণ হওয়ায় উচ্ছবকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিলেন ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০২ ধারায়। পাগল অবস্থায় আসামী উচ্ছব বাবাকে তীর মেরে হত্যা করেছে বলে দায়রা আদালত আসামী পক্ষের যুক্তি মেনে নিতে পারেননি।

যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হয় ওড়িশা হাইকোর্টে। দন্ডিত আসামীর পক্ষে হাইকোর্টে সওয়াল করা হয় যে – ভারতীয় দন্ডবিধির ৮৪ ধারাটি উচ্ছবের মামলায় প্রয়োগ করা যুক্তিসংগত ছিল। উচ্ছব উন্মত্ত অবস্থায় তার বাবাকে তীর মেরেছিল। কাজটি তার পক্ষে অপরাধ এই ধারণাই তার ছিল না। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলায় সে তার বাবার বুক লক্ষ্য করে তীর মেরেছিল। সাময়িক উত্তেজনার বশে সে অপরাধ করেছে। উচ্ছবের উন্মত্ততা প্রকাশ পেত এরকম হঠাৎ হঠাৎ উত্তেজনার মাধ্যমে।

ঘটনার দিন গ্রামবাসীরা পর্যন্ত বলছিল 'পাগলা' বাবাকে খুন করেছে। উচ্ছব যে আগে থেকেই পাগল ছিল তা বোঝা যায় গ্রামবাসীদের এই ধরনের কথাবার্তায়।

উচ্ছবের পক্ষে দায়রা আদালতে ঘটনার পূর্বের ও পরের চিকিৎসার কাগজপত্র দাখিল করা হয়েছিল। এই কাগজপত্র ও তার পক্ষ থেকে তিনজন সাক্ষীর সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় উচ্ছবকে পাগল হিসেবে ইতিপূর্বে চিকিৎসা করা হয়েছিল। উত্তেজনাই ছিল তার রোগের বহিঃপ্রকাশ। আসামী পক্ষের তিনজন সাক্ষীই ছিলেন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। তাঁদের সাক্ষ্য থেকে জানা গিয়েছিল, বছর ৫/৬ আগে উচ্ছব মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তিনজন ডাক্তারের মধ্যে প্রথমজন আদালতকে বলেছিলেন উচ্ছব এমন হিংস্র হয়ে উঠেছিল যে, তাকে ইনজেকশন দিয়ে নিস্তেজ করেছিলেন তিনি।

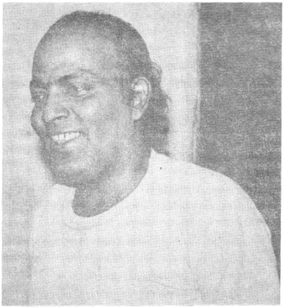
আসামী পক্ষের ২ নম্বর সাক্ষী ছিলেন প্রফেসর ডাক্তার। পড়াতেন এস সি বি মেডিক্যাল হাসপাতালে। তিনি জেলেরও ডাক্তার ছিলেন। উচ্ছব তাঁর চিকিৎসাধীন ছিল। ডাক্তারটি মেন্টাল হেলথ ইনস্টিটিউটে উচ্ছবকে বার ৫/৬ ইলেকট্রিক শক দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়ার সময় কিছু ওষুধপত্র খেতে বলেছিলেন মাস কয়েক, কিন্তু উচ্ছব প্রেসক্রিপশনমত ওষুধপত্র না খাওয়ায় তার পুরনো রোগ আবার দেখা দেয়। এমনকি গ্রেপ্তার হওয়ার পর উচ্ছবকে যখন জেলে আটক রাখা হয়েছিল, তখন তার অবস্থা ছিল পুরোপুরি মানসিক ভারসাম্যহীন। মাঝে মাঝে তার মধ্যে দেখা যেত দারুণ উত্তেজনা। আসামী পক্ষের ২ নম্বর সাক্ষী ছিলেন নয়াগড় সাব-জেলের ডাক্তার। তিনি নয়াগড় সাব-জেলে উচ্ছবকে ১৯৮৩ সালের ১ আগস্ট ও ১২ নভেম্বর পরীক্ষা করেছিলেন। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, উচ্ছব ছিল একজন মানসিক ভারসাম্যহীন রোগী। ভাল-মন্দ বোঝার মত অবস্থা রোগীটির ছিল না। রাতের পর রাত উচ্ছব জেলে ঘুমতো না। অনিদ্রাও ছিল তার রোগের একটি দিক।

হাইকোর্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ ভালভাবে বিবেচনা করে সিদ্ধান্তে এলেন, ঘটনার সময় হত্যাকারী ছিল পাগল। সুতরাং তার অপরাধ ভারতীয় দন্ডবিধির ৮৪ ধারায় আসবে। হাইকোর্ট উচ্ছবের বিরুদ্ধে দেওয়া দন্ডাদেশ বাতিল করে উচ্ছবকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। হাইকোর্ট মুক্তির আদেশটি দিয়েছিলেন ১৯৮৮ সালের ১৩ মে।

বাবাকে হত্যা করেও বিশেষ কারণে ছেলে রেহাই পেয়ে গেল। □

চিন্ময় চৌধুরী

নাচই আমার জীবনের সমস্ত সুন্দরের উৎস : শক্তি নাগ



'১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমার একটা মাইল্ড স্ট্রোক হয়েছিল। অবনীশ ব্যানার্জির 'রানীমা' ছবিতে নাচের ডিরেকশন দিতে গিয়ে পড়ে যাই। তখন বুঝিনি ওটা স্ট্রোক। ঐ অবস্থাতেও তখন নেচেছিলাম। সেদিন থেকেই শরীরের বাঁ দিকটা পক্ষাঘাতে পুরোপুরি অবশ হয়ে যায়।'

'কেমন আছেন?' প্রশ্নের উত্তরে এইভাবে শুরু করলেন শক্তি নাগ। তাঁর কণ্ঠস্বর নম্র। বাচনভঙ্গি স্পষ্ট, ধীর। ষাট ছোঁয়া যে কোন পুরুষের মতই মাথার সামনের দিকটা কেশহীন। সুঠাম দেহ, উজ্জ্বল মুখ আর রোমান্টিকতায় ঘেরা দুটো চোখ। নাচের মুদ্রা দেখানো নিটোল আঙুলের ইশারায় চমৎকার মেজাজে কথা বলছিলেন, 'সেদিন পড়ে গিয়েও নাচটা আমার অন্যায় হয়েছে। এমনিতে আমার ডায়াবেটিস আছে। এখন পা-টা অচল হয়ে গিয়ে অসুবিধেয় ফেলেছে। চিকিৎসা চলছে। বছর খানেকের মধ্যে আবার মঞ্চে নামতে পারব এরকম আশ্বাস চিকিৎসকেরা দিয়েছেন। তবে আগের ক্ষিপ্রতা নিয়ে হয়তো পারব না।' কথা শেষ করেই তিনি সেদিন কীভাবে পড়ে গিয়েছিলেন দেখাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাড়াতাড়ি বাধা দিলাম। পক্ষাঘাতে কাবু হয়ে এখন বেহালার সরশুনায় রাম নারায়ণ পল্লীতে আছেন ভাগ্নের বাড়িতে।

কিছুদিন আগেও বড় বড় নাচের আসরে, বিশেষ করে রবীন্দ্র-নৃত্যে অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকতেন শক্তি নাগ। সিনেমা, যাত্রা, দূরদর্শন প্রতিটি মাধ্যমেই তিনি সমানতালে ছুটেছেন। ষাটের কোঠায় পৌঁছেও অফুরন্ত তাঁর প্রাণশক্তি। শারীরিক প্রতিবন্ধকতায় গৃহবন্দী হয়েও হৃদয় তাঁর আজও ময়ূরের মত নাচে। চিকিৎসকের পরামর্শ উপেক্ষা করে ফিরে যেতে চান শ্যামার 'কোটাল', চণ্ডালিকার 'দইওয়ালা' অথবা চিত্রাঙ্গদার 'অর্জুন' চরিত্রে।

আলাপের মাঝে চা এল। ভাগ্নে এগিয়ে দিলেন দুটো অ্যালবাম। দেওয়াল থেকে নামিয়ে দেখালেন স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে শিল্পীকে দেওয়া মানপত্রটি। অ্যালবামের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে দেখলাম প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্রধানমন্ত্রী নেহরুজী থেকে শুরু করে ভারতের তাবড় তাবড় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তোলা শিল্পীর ছবি। কিন্তু বিদেশের মাটিতে তোলা শিল্পীর কোন ছবি চোখে না পড়ায় একটু অবাক হলাম। কৌতূহল চেপে না রেখে খোলাখুলি জানতে চাইলাম, বাংলাদেশ বাদে বিদেশের অন্য কোথাও নৃত্যপ্রদর্শনের আমন্ত্রণ কোনদিন তিনি পেয়েছেন কিনা?

অকৃতদার শিল্পী হাসতে হাসতে বললেন, 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সদস্য ছিলাম আমি। সংঘের ব্যালে স্কোয়াডের সম্পাদকও ছিলাম বহুকাল। তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত 'অহল্যা' নৃত্যনাট্যকে ঘিরে তখন চারিদিকে হৈ-চৈ। বুদ্ধিজীবী মহল আলোড়িত। ডাক পেলাম রাশিয়া থেকে অনুষ্ঠান করার। ভারত সরকার সেখানে যাবার অনুমতি দিল না। ওদের যুক্তি ছিল নৃত্যশিল্পী হলেও মতাদর্শের দিক থেকে আমি কমিউনিস্ট। আমন্ত্রণ পেয়ে একই কারণে যেতে পারিনি ওয়ারশ এবং বুখারেস্টের যুব উৎসবে। তবে আমন্ত্রিত প্রথম ভারতীয় শিল্পী হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশে যেতে পেরে আমি গর্বিত।'

ধীরে ধীরে তিনি স্মৃতির অতলে ডুব দিলেন। তুলে আনলেন মুছে যাওয়া দিনগুলিকে। 'চলচ্চিত্রে নৃত্য পরিচালনার সুযোগ আমায় করে দিয়েছেন দুজন। প্রয়াত বিমল রায় এবং মোহিনী চৌধুরী। 'পহেলা আদমী'-তে ছিলাম বিমল রায়ের সহকারী। স্বাধীনভাবে নৃত্য পরিচালনা শুরু করি মোহিনী চৌধুরীর 'সাধনা' ছবি দিয়ে। এ পর্যন্ত ৭০-৮০টা চলচ্চিত্রে নাচের নির্দেশ দিয়েছি। দেবকী বসু, তপন সিংহ, পীযূষ বসুর মত পরিচালকদের ছবিতে যেমন নৃত্য পরিচালনা করেছি তেমনি উৎপল দত্ত, সমীর মজুমদার, শ্যামল সেন প্রমুখ পরিচালকদের সঙ্গে যাত্রাতেও কাজ করেছি।'

শিল্পীকে বর্তমানের মুখোমুখি দাঁড় করাবার উদ্দেশ্যে ওঁর কথার মাঝখানে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলাম।

পরিবর্তন : আচ্ছা, শিল্পীর জীবনে ফুলফিলমেন্ট বলতে যা বোঝায় আপনি তা কি পেয়েছেন?

শক্তি নাগ : 'হ্যাঁ, পেয়েছি। যখনই যেখানে নেচেছি দর্শকরা এমনভাবে উৎসাহিত করেছেন সেটাই আমার চরম প্রাপ্তি।' একটু থেমে বললেন, 'তবে সত্যি কথা বলতে কী, পেশা হিসেবে এ লাইন এখন আর সচ্ছলতার নয়।'

পরিবর্তন : কেন?

শক্তি নাগ : 'কারণ, শিল্পীর সংখ্যাধিক্য। শিল্পীর তুলনায় সুযোগ দেবার জায়গা কম। বেকার সমস্যার মত এও এক সমস্যা। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখানেও।'

পরিবেশটা একটু শিথিল করার জন্য ভিন্নমুখী হলাম।

পরিবর্তন : আপনি তো পুরোপুরি পেশা হিসেবে নাচকেই বেছে নিয়েছেন। আর্থিক টানাটানিতে পড়তে হয়েছে কোনদিন?

শক্তি নাগ : আমাদের সময় চলে যেত। টাকা পয়সা কী পেয়েছি হিসেব কষিনি। আমি আমার প্রাপ্যটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থেকেছি।

পরিবর্তন : অসুস্থতার জন্য আগের মত কাজকর্ম করেন না বললেন। এখন আপনার চলে কী করে?

শক্তি নাগ : প্রায় দুশো জন ছাত্রছাত্রী আছে আমার। তাদের শেখাই। এখন বসে বসেই নির্দেশ দিই। রাজ্য সরকার থেকে মাসিক দুশো টাকার পেনসন পাই। এছাড়া বিভিন্ন সংস্থাও সাহায্য করে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

পরিবর্তন : অনেকে অভিযোগ করেন, রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য ক্রমশ একটা নিয়মরক্ষার অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছে। আপনি কী বলেন?

শক্তি নাগ : অনেকটা তাই। আসলে মননশীলতার অভাব। রবীন্দ্র-ভাবধারার সঙ্গে চিন্তা-ধারার যোগসূত্র রক্ষা হচ্ছে না এর জন্য নির্দেশকরাই দায়ী।

পরিবর্তন : এই বয়সে আপনার রোজনামচা একটু বলবেন?

শক্তি নাগ : ভোরে উঠে একটু যোগব্যায়াম করি। সেটা করি চিকিৎসকের পরামর্শেই। পা-টা সচল রাখার জন্য। শিক্ষার্থীরা এলে ক্লাস করাই। অবসর সময়ে নাচ সম্পর্কিত বইপত্র পড়ি। কিছু লেখালেখি করি। ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই আজ প্রতিষ্ঠিত। মাঝে মাঝে আসে ওরা। গল্প করি।

উঠে আসার আগে জিজ্ঞেস করেছিলাম, শিল্পীর জীবনে সাধারণত একটা অকথিত বেদনা থাকে। শক্তি নাগ কি তার ব্যতিক্রম?

মৃচকি হেসে ধীর কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'আমার জীবনে যা কিছু সুন্দর, তার উৎস নাচ। নাচকে ঘিরে যা পেয়েছি মাথায় করে নিয়েছি। এতেই আমি সুখী।' □

অরুণকুমার চক্রবর্তী

ফটো : লেখক সংগৃহীত

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কারসাজিতে ২১ ভূমিহীন চাষী জমি পেলেন না

পাটনা থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি

বিহারের প্রায় প্রতি গ্রামেই সামন্তরাজ, অর্থাৎ ভূস্বামীদের রাজত্ব এখনও কায়েম আছে। অর্থবল বা লাঠি বন্দুকের জোরে মালিক পক্ষের কায়েমী স্বার্থ এখনও বর্তমান। এই ভূস্বামীরা প্রায়শই কোন না কোন রাজনৈতিক নেতার মদত পেয়ে থাকেন। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই সামন্তকূল গরিব দিন-মজুরদের খুন করতেও দ্বিধা করেন না। এর নিদর্শন জাহানাবাদ, ভাগলপুর, রোহতাস ইত্যাদি গ্রামগুলিতে বহুবার পাওয়া গেছে।

এমনই একটি গ্রাম সিওয়ান জেলার গভীরার। এই গ্রামের হরিজন এবং অন্যান্য গরিব ভূমিহীনের ২৯ একর ২৮ ডে: মি: চাষের জমি কয়েক বছর ধরে জবর দখল করে রেখেছেন খোদ কেন্দ্রীয় রাজ্যমন্ত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণা শাহী।

গভীরার গ্রামটি সিওয়ান জেলার রঘুনাথপুর অঞ্চল থেকে সাত কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। জনসংখ্যা প্রায় ছ' হাজার। গ্রামে পঞ্চায়েতও আছে। শ্রীমতী শাহীর শ্বশুরালয় এই গ্রামে। ঘটনাসূত্রে জানা যায় গত ১৯৭৬-এ কৃষ্ণা শাহীর ২৯ একর ২৮ ডে: মি: জমি সিলিং-এর আওতায় পড়ে। নিয়মানুসারে ঐ জমি উক্ত গ্রামের ২১ জন ভূমিহীনের মধ্যে বণ্টন করা হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আজ অবধি ঐ জমির অধিকার জমির প্রকৃত প্রাপকেরা পাননি। প্রশাসন, পঞ্চায়েত, অঞ্চল সকলেই এ বিষয়ে অবগত কিন্তু যেহেতু জবরদখলকারিণী কেন্দ্রীয় রাজ্যমন্ত্রী তাই আজও ঐ ২১ জন ভূমিহীন ভূমিহারা হয়েই দিন কাটাচ্ছেন।

সরকারি কার্যালয়ের রেকর্ড অনুযায়ী গভীরার গ্রামে এখনও কৃষ্ণা শাহীর নামে একশ বিঘা জমি বর্তমান। কিন্তু রঘুনাথপুরের অঞ্চলপ্রধান বিনোদকুমার সে কথা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে কৃষ্ণা শাহীর নামে মাত্র ২০ একর জমি আছে, বাকি জমি শ্রীমতী শাহীর পুত্র এবং অন্যান্য আত্মীয়ের নামে রয়েছে।

অঞ্চল কার্যালয়ের সূত্র অনুসারে জানা যায় শ্রীমতী শাহীর ২৯ একর ২৮ ডে: মি: উদ্বৃত্ত জমি ২১ জন ভূমিহীনের মধ্যে বণ্টন করা হয় ১৯৭৬ সালে যার আদেশ সংখ্যা ১/৭৫/৭৬।



শ্রীমতী কৃষ্ণা শাহী ছবি : মীরা কিষাণ

এদিকে অঞ্চলপ্রধান বলেন, কৃষ্ণা শাহীর সিলিং-এর আওতায় আসা জমির দখল নিয়ে তা ২১ জন ভূমিহীনের মধ্যে বণ্টন করা হয় ২৪ অক্টোবর ১৯৮৫-তে। বোর্ড অফ রেভেনিউ শ্রীমতী শাহীকে একটি সুবিধা দেন যে শ্রীমতী শাহী উক্ত পরিমাণ জমি নিজের পছন্দমত দিতে পারেন। অর্থাৎ, যে জমি ভূমিহীনদের প্রাপ্য তার পরিবর্তে শ্রীমতী শাহী সমপরিমাণ যে কোন জমিই ভূমিহীনদের দিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি এখনও অবধি এক কণা জমিও দেননি। এই প্রশ্নটি অঞ্চলপ্রধানকে করায় তিনি সযত্নে তা এড়িয়ে যান এবং বলেন জমির পরচা বহুদিন আগেই একুশ জনের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

ঘটনাটির সত্যতা যাচাই করবার জন্য গভীরার গ্রামে যাই। ঐ গ্রামে কৃষ্ণা শাহীর শ্বশুরবাড়িটি দরবার নামে পরিচিত। এই দরবারের দেখাশুনা করেন দেবদত্ত শর্মা। গ্রামে তিনি শাস্ত্রীজী নামেই খ্যাত। ইনি কৃষ্ণা শাহীর স্বজাতি।

শাস্ত্রীজী ছাড়া দরবারের তিন রক্ষী হলেন – সীতারাম কুঁওর, সীতারাম রায় এবং স্বামীনাথ কুঁওর। পাচকের কাজ করেন গণেশ গোঁড় এবং বাড়ির ঝাড়-পোঁছ করবার জন্য নিযুক্ত লোকটির নাম রবি গোঁড়। সত্তার নট নামে আর একজন আছেন যার কাজ গরু, বলদ, মোষের দেখাশুনা করা। দরবারে জমিদারী প্রথা এখনও চালু আছে। উপস্থিত মালিক (সম্পর্কে শ্রীমতী শাহীর কাকা) ধনুষধারী প্রসাদ নারায়ণ শাহীর সঙ্গে দেখা হল। উনি বললেন কৃষ্ণা শাহীর নামে একশ বিঘা জমি আছে এবং ঐ জমি শ্রীমতী শাহীর দখলেই আছে। ২১ জন ভূমিহীনের জমির কথা উল্লেখ করাতে শ্রীশাহী বলেন, শ্রীমতী শাহী ঐ জমির মালিক। কাজেই জমি তাঁর দখলেই থাকবে। অর্থাৎ, সিলিং-এর ব্যবস্থা উনি মানেন না। বিজাতীয় আক্রোশও ভদ্রলোকের মধ্যে প্রচুর।

পরচাপ্রাপ্ত মংগরু চামার বলেন – পরচা পাওয়া জমিতে (দাগ ১০৭৬) যাওয়ার সংগে সংগেই ফসল চুরির অভিযোগে তাঁকে মামলায় (ধারা ৩৭৯) জড়িয়ে দেওয়া হয় যার কেস নং – ৫৫/৮৪।

পরচাপ্রাপ্ত বসুলী রাম, মোনাকা হলখোর, রঘুবীর দুসাদ, দ্বারিকা দুসাদ সকলেরই একই অভিযোগ, সরকার পরচা দিলেন কিন্তু জমির ধারে গেলেই শ্রীমতী শাহীর লোকেরা লাঠি-বন্দুক নিয়ে মারতে আসে।

গভীরার গ্রামের বাসিন্দা রাম অজয় সিং-এর মতে ১৯৫৭-র ভূমি সংশোধন আইন অনুসারে রাজ্যের যে কোন অংশে ভূস্বামীর যত জমি আছে সবই যোগ করা হবে। যদি ভূস্বামী কোন জমি বিক্রি করে থাকেন সে জমিও ভূস্বামীর সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই নিয়ম অনুসারে কৃষ্ণা শাহীর পরিবারের এক কণা জমিও থাকা উচিত নয়। কারণ শ্রীমতী শাহীর পরিবার পশ্চিম চম্পারণের বেতিয়ার কাছে সাঁঠিকোঠি গ্রামে ২৫০ একর জমি ৪ লাখ ৩৫ হাজার টাকায় সীতা রাজগড়িয়াকে বিক্রি করেন ১৯৬২ সালে।

গভীরার গ্রামে স্থানীয় লোকেদের বক্তব্য, আইন শুধু গরীবদেরই শৃংখলিত করে। ধনী এবং নেতাদের জন্য নয়। তাই পরচা থাকা সত্ত্বেও অন্যায়ভাবে শ্রীমতী শাহী অপরের জমি ভোগ-দখল করছেন। নেতার সামনে প্রশাসন অক্ষম, আইন অকেজো।

বিহার রাজ্য ক্ষেত ইউনিয়ন-এর মহাসচিব নগেন্দ্রনাথ ওঝা বলেন – গভীরার গ্রামে বিহার সরকার বা ভারত সরকার নয়, ঐ গ্রামে হুকুম চলে দরবারের। কৃষ্ণা শাহী গ্রামে যখন আসেন তখন সরকারি আমলারা ভিজে বেড়ালের মত পিছু পিছু ঘুরতে থাকেন।

উপস্থিত অবস্থা এই যে কৃষ্ণা শাহীর উদ্বৃত্ত জমির মালিকানা যে হতভাগ্য ভূমিহীনেরা পেয়েছেন আজও তাদের কাছে এককণা জমি নেই, আছে শুধু পরচা নামের এক টুকরো কাগজ মাত্র।

যে সকল ভূমিহীনদের মধ্যে শ্রীমতী শাহীর জমি বন্টন করা হয় তাদের নাম ও জমির বিবরণ

নাম	দাগ	খতিয়ান	পরিমাণ
১। বসূলী ডোম	২	২৪৪১	0.৮১
	২৩১	১৯৭৪	0.২৮
	৬৩৯	২৪0২	
২। নথুনী ডোম	৬৩৯	৩৪২৫	0.১১
	১২৩	১৪১৯	0.১৯
৩। মোনাকা হলখোর	২৬১	১৯৮২	১.0১
	২0৩	২৩২৬	0.৭৪
	১২৩	১৩৬৯	0.১৬
	৯0৩	১৩৮0	0.১৬
	২	১৩৭৬	0.১0
	১৪৭	৯৫৩	0.৬0
৪। সীতরাম হলখোর	১২৩	৪৫0	0.0৮
	১২৩	৮৭১0	0.৫৭
	৫৩৯	১৯৫৬	0.২৬
৫। রঘুবীর দুসাদ	১৫৩	৩৪0৮	0.৩৭
	১৫৩	২৩২৬	0.৭৪
৬। বীজু চামার	১২৩	২৬২0	0.৪৮
	৪৩৫	২0৫৬	0.২৯
	৪৩৮	৭১৯	0.৬২
৭। রামগোবিন্দ চামার	৭৬৩	৭0৮	0.২৯
৮। রামপূজন চামার	৭৬৩	৯৬৮	১.২0
	১৯	৯৬৮	0.৮0
	১৫৩	৫৭৩	0.২৩
	২৩১	১৯৬	0.0৬
৯। মংগরু চামার	১৪৪	১৯৭	0.১0
	১৪৪	২১১৪	0.৩0
	৪৩৬	১0৭৬	0.৩৮
	৪৩৬	১৪	0.৪১
১0। রাজবলী চামার	১৫৩	১৫	0.১৮
	১১৪	৫৮৮	0.২৯
	১১৪	১৯৫	0.৮৫
১১। অসরফী চামার	১১৪	১৯ঘ	0.১৫
	১১৪	২৯১	১.৫0
১২। দ্বারকা দুসাদ	৪৪৯	২৯২	
	৪৪৯	৯৬২	
	১৯২	৯৬৩	
	১৯৩	৬২৭	
	১৯৪	৬২৮	
	১৯৫	৬২৯	১.৫0
	১৯৬	৬৩0	
	১৯৭	৬৩১	
		৬৩২	
১৩। গফুর নট	৪৪৯	৯৬২	
	৪৪৯	৯৬৩	
	১৯২	৬২৭	
	১৯৩	৬২৮	
	১৯৪	৬২৯	১.৫0
	১৯৫	৬৩0	
	১৯৬	৬৩১	
	১৯৭	৬৩২	
১৪। সুদামা চামার	১১৪	২৯১	
	১১৪	২৯২	১.৫0
১৫। গণেশ মালী	৪৪৯	৯৬২	
	৪৪৯	৯৬৩	
	১৯২	৬২৭	
	১৯৩	৬২৮	
	১৯৪	৬২৯	
	১৯৫	৬৩0	
	১৯৬	৬৩১	১.৫0
	১৯৭	৬৩২	
	১৭২	৪২২	
	১৭২	৪২৩	
	৪৪৯	৯৫৭	
	৪৪৯	৯৬১	
১৬। নন্দলা ভর	১৭২	৪২২	
	১৭২	৪২৩	
	৪৪৯	৯৫৭	১.৬0
	৪৪৯	৯৬১	
১৭। মোনারকা নোনিয়া	১৭২	৪২২	
	১৭২	৪২৩	
	৪৪৯	৯৫৭	১.৬0
১৮। রাজবংশি চামার	১৭২	৪২২	
	১৭২	৪২৩	
	৪৪৯	৯৫৭	১.৬0
	৪৪৯	৯৬১	
১৯। বৃক্ষা চামার	১৭২	৪২২	
	১৭২	৪২৩	১.৬0
	৪৪৯	৯৫৭	
	৪৪৯	৯৬১	
২0। রম্না চামার	১৭২	৪২২	
	১৭২	৪২৩	১.৬0
	৪৪৯	৯৫৭	
	৪৪৯	৯৬১	
২১। জয়রাম বিন	১৭২	৪২২	
	১৭২	৪২৩	১.৬0
	৪৪৯	৯৫৭	

মোট জমির পরিমাণ : ২৯ একর ২৮ ডেসিমিল

ছত্র সুব্বা পাহাড়ের নতুন নায়ক ?

কালিম্পঙ বাজারে দাদাগিরি করার জন্য যে চারজন জি ভি সি জওয়ানকে জঙ্গী ও রাগী তেতাল্লিশ বছর বয়সী প্রাক্তন ভারতীয় সৈনিক যুবক শুট করবার অর্ডার দিয়েছিলেন, আজ তারাই ঘিসিঙের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জেহাদ ঘোষণার পরও ছত্র সুব্বার অতন্দ্র প্রহরী। নিয়মানুবর্তিতায় এতটাই কঠোর ছত্র সুব্বা। জনতার ওপর অত্যাচার করা হয়েছে একথা তার কানে গেলে রক্ষে নেই সংশ্লিষ্ট অত্যাচারীদের। ছত্র সেখানে নিষ্ঠুর, ক্ষমাহীন। জি এন এল এফের তরফে সীমাহীন অত্যাচার চালানো হয়েছে জি ভি সি-র যুবকদের ওপর, হয়েছে হত্যা ও অপহরণ দিনের পর দিন, ন্যূনপক্ষে বারটি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে এখনও অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে সি কে প্রধান, এন টি মোক্তানের মত ঘিসিং-অনুসারী জঙ্গী নেতারা। তবুও ছত্র-র বাড়িতে জনা পঁচিশেক যুবকের এখনও আপোসহীন অবস্থান। ভাতের হাঁড়িতে চালের বদলে সেদ্ধ হচ্ছে ইশকুশের (কোয়াশ) তরকারি আর লবণ। কতদিন ভাত খায়নি জানাল যুবকেরা নির্দ্বিধায়, কিন্তু তাতে আক্ষেপ নেই কোন তাদের। একটাই বক্তব্য : ছত্রর উচিত কোন রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা নেওয়া, তবে তা কংগ্রেস বা সি পি আই (এম) দল হলে চলবে না। যারা আধুনিক অস্ত্র এস এল আর বা এ কে ফরটি সেভেন দিতে পারবে সহযোগিতা চাই সেরকম রাজনৈতিক দলের। এক ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত যুবক তো বলেই ফেললেন ছত্র দাজুর উচিত নকশালদের 'হেল্প সিক' করা। একমাত্র ওরাই দিতে পারে ঘিসিং তথা তার সুযোগ-সন্ধানী আপোসকামী সাগরেদদের বিরুদ্ধে লড়বার বুদ্ধি ও দাওয়াই।

বি এস এফ ক্যাম্প থেকে ছত্রর লোকজনদের ওপর সবসময়ের সতর্ক দৃষ্টি রাখা সত্ত্বেও তিন সপ্তাহ আগে সি কে প্রধানের লোকেরা গভীর রাতে এসে গোলাগুলি চালিয়েছিল ছত্রর বাড়ি তথা ক্যাম্পের ওপর। মিনিট পনেরর মধ্যে বি এস এফ এসে পড়েছিল ঠিকই, কিন্তু সর্বনাশ একটা হয়েই যেতে পারত, জানালেন যুবকেরা। ছত্রর বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরেই বি এস এফ ক্যাম্প, তবু তারা লক্ষ্য রাখছেন একথা জানাতে দ্বিধা করলেন না ছত্র সুব্বা। বাড়িতে বসে থাকার পাত্র নন তাই অন্যত্র ছিলেন এতক্ষণ। 'দুঃখও জীবনে একটা মজার মত, তা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছি আমি' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন।



ছবি : তুষার প্রধান

বিদ্রোহী ছত্র সুব্বা

বললেন 'কোন রাজনৈতিক দলকে ঘৃণা করি না আমি। তবে আপনাদের শিলিগুড়ি শহর গুজবের শহরে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন সূত্রে সেখানে রটিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমি সি পি আই (এম) দলে যোগদান করছি। কলকাতা ও দেশের অন্যত্র পৌঁছে যাচ্ছে রটনা অনেকটা মৃত্যু সংবাদের মতই' – ক্রুদ্ধ ও ভয়াল চোয়ালের মুখব্যাদন করে হাসলেন। আবার স্বাভাবিক হলেন। পরক্ষণেই বললেন এখানকার সি পি আই বিধায়ক মোহন সিং রাই-এর চেহারাই দেখিনি আজ পর্যন্ত অথচ আপনার বন্ধুরা লিখছে মোহন দুখুন আমার পেছনে আছে। তা যাই হোক, রিপোর্টারদের এমনিতে আমি শ্রদ্ধা করি খুব, আপনাদের পর্যালোচনা ভাল লাগে আমার, বুদ্ধি যোগায়। নিজের হাতে চা বানাতে বানাতে কানে কানে বললেন, কটা এস এল আর অন্ততপক্ষে ব্যবস্থা করে দিতে পারেন না, যাতে ঘিসিঙের চামচা তথা কালিম্পঙের লুটেরা, হত্যাকারী ও বলাৎকারকারীদের শেষ করে দিতে পারি। ল্যেক তো আমি বুলেটের, আগে বুলেটিকস বুঝিয়ে দিই – পরে শিখব পলিটিকস, কী বলেন ?

'শেষ পর্যন্ত কি হিল কাউন্সিলের নির্বাচনে লড়ছেন ?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন ছত্র, কেন আপনাদের ওদিকে কি নতুন করে রটনা শুরু হচ্ছে যে আমি বা আমার লোকেরা নির্বাচনে লড়ছে না। হিল কাউন্সিলে সারা দার্জিলিং পাহাড়ের জি এন এল এফের বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করাবে জি ভি সি। সমস্ত জায়গার মানুষজন কাউন্সিল চুক্তিতে ক্ষুব্ধ। মুখে বলতে ভয় পাচ্ছে সন্ত্রাসের ভয়ে, ভোটের বাক্সে তার প্রমাণ দেবে তারা। একটি দুটি আসন বের করাই মুশকিল হয়ে যাবে ঘিসিঙের পক্ষে, তাই হয়ে যাবে প্রেস্টিজ ফাইট ! কালিম্পঙের প্রতিটি আসনই জিতবে আমার যুবকেরা। কেননা মানুষ জানে ভারতবর্ষের কোন ব্যাঙ্কেই তেমন পরিমাণ টাকা নেই যা দিয়ে ছত্র সুব্বাকে কেনা যেতে পারে। ছত্র ঘিসিং ও তার অনুগামীদের মত লক্ষ্মীর আরাধনা করেনি, করবেও না। কালিম্পঙের মানুষ জানে ৪০ দিনের বন্ধে নির্দোষ মানুষ হত্যা, টাকা ও সম্পত্তি লুট, বলাৎকারের সঙ্গে সি আর পি এফ যতটা জড়িত ছিল তার চাইতে বেশি জড়িত ছিল জি এন এল এফের লোকেরা। জি ভি সি-র ছেলেদের আমি সি আর পি এফের হাত থেকে বুক আগলে

ছত্রকে দাদার মত শ্রদ্ধা করি : মোক্তান

গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের মাধ্যমে গোর্খাল্যান্ড স্থাপনের প্রথম ধাপ হল দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউনসিল। আন্দোলন শেষ হয়ে যায়নি, গোর্খাল্যান্ড না আদায় অব্দি শেষও হবে না। একদিকে কাউনসিল চলবে অন্যদিকে চলবে আন্দোলন। কতবার বুঝিয়েছি ছত্র সুব্বাকে স্টেপ বাই স্টেপ এগোতে হবে। কথাগুলি সি কে-র ডান হাত বলে পরিচিত জি এন এল এফ-র সহ সম্পাদক এন টি মোক্তানের।

তিনি বলেন, ছত্র সুব্বাকে এখনও আমি দাদার মত শ্রদ্ধা করি। ভালবাসি। কিন্তু ও আমাকে ভালবাসে না, দেখতে পারে না। আমার শরীর থেকে মাথা আলাদা করে দেবে বলেছে। আমি আপনাকে আবারও বলছি আমি ছত্র সুব্বার অধীনে কাজ করতে রাজি আছি, আমি চাই ও আন্দোলনের মূল স্রোতে ফিরে আসুক। একসঙ্গে একই থালায় বসে খাব আমরা, করব আন্দোলন। এর চাইতে সুখের কী হতে পারে ? □

বাঁচাতে পেরেছিলাম, কিন্তু ওদের হাত থেকে বাঁচাতে পারিনি। হঠাৎ করেই বিষাদের মলিন ছাপ লক্ষ্য করলাম ছত্রর চোখেমুখে। বললেন, লাভা, আলগড়া, পুদুং, সীড ফার্ম, আট মাইল, বোমবস্তি, হোমস, কাফের, সুরুক-সমথার, ইচ্ছে বস্তি প্রভৃতি জায়গায় এখনো কনসেনট্রেশন ক্যাম্প চালানো হচ্ছে। রাতে যুবকদের শোওয়ার জায়গা থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওরা, ক্যাম্পগুলিতে চালাচ্ছে অত্যাচার। নির্দোষ মানুষ যারা জি ভি সি-র কাজকর্মের সমর্থক ছিলেন তাদেরকেও একই হাল করা হয়েছে। আগে আমার ক্যাম্পে মানুষজন রেশন পৌঁছে দিত, এখন পারে না, ওদের হুমকি দিয়েছে সি কে প্রধানের লোকেরা। এভাবে আমাদের ভাতে মারা যাবে না, পাপ বাপকেও ছাড়ে না। কালিম্পঙে যে সি কে প্রধান নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেছে তাকে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে ঘুরতে হবে লোকের দ্বারে দ্বারে। যাদের বাড়ির ছেলেদের হত্যা করেছে ওরা, মেয়েদের বলাৎকার করেছে, সম্পত্তি ও অর্থ লুঠ করেছে, নাক কেটে দিয়েছে, চোখ অন্ধ করে দিয়েছে, মুখে শাবল ঢুকিয়ে মেরেছে, কেটে বস্তাবন্দী মাথা পাঠিয়েছে, তিস্তার জলে ভাসিয়ে দিয়েছে, ফরেস্টে জমা করেছে কাতারে কাতারে, তাদের বাড়ির লোকজন বদলা নেবে না? এই নেতাদের কি ছেড়ে দেবে?

জি ভি সি-র সংগে যুক্ত থাকার অপরাধে হত্যা করা হয়েছে এমন বত্রিশ জনের সূচি হাতে দিয়ে বললেন, এটা হচ্ছে হাংগু সুব্বা, সি কে প্রধান, আই বি সুব্বা, বিবেককিশোর পান্ডে, এস বি সুব্বা, খুশনারায়ণ সুব্বাদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের ফল। লাভা এলাকায় মানুষ খুনের পেছনে হাত ছিল এন টি মোক্তানের, আলগড়াতে উইলিয়াম ইয়োনজন ও স্যামুয়েল গুরুঙের, ১৬ মাইল হোমসে এন টি মোক্তান, দাবা শেরপার, কাফেরে ছিরিং শেরপার, বোমবস্তিতে প্রকাশ দাহাল, মরিশ কালিকোটের, পুদুঙে আই বি সুব্বা, এস বি সুব্বা, বিজয় কুমার রাই-এর। টোটাল কনসপিরেসির পেছনে জি এন এল এফ হাইকমান্ডের ছক ছিল। প্রমাণ আছে হাতে আমাদের। সময়ে জেরক্স করে বিলি করব জনতার মাঝখানে। এই বলে বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেও দিলেন তিনি।

উত্তেজনাভরা কণ্ঠস্বরে ছত্র বললেন জনতা এখন ঘিসিংকে জিজ্ঞাসা করবে গোর্খার ইজ্জত বিক্রি করে তুমি আমাদের জন্য কী এনে দিয়েছ? হিল কাউনিসল নামক ভিক্ষার মুষ্টি। চুক্তিতে সই করে বন্ধ করে দিয়েছ ভাষার স্বীকৃতির মত গুরুত্বপূর্ণ দাবি, বন্ধ করেছ আলাদা গোর্খা রেজিমেন্টের দাবি, বিনা-মতলবে নাগরিকত্বের বিষয়ে সই করে সিকিমে বসবাসকারী নেপালীদের ফেলেছ বিপদে। জনতা ঘিসিংকে জিজ্ঞাসা করবে এত রক্ত, এত সম্পত্তিহানির পরিবর্তে কী পেলাম আমরা? লক্ষ্মীর আরাধনায় তোমরা আমাদের কী দামে বিক্রি করেছ রাজ্য ও কেন্দ্রের কাছে?

কালিম্পঙের জনতা জানে জি ভি সি এখানে চুরি ডাকাতি বন্ধ করেছে, যেখানে – সেখানে জংগল ও গাছ কাটা বন্ধ করেছে, চাঁদা ফাইন বন্ধ করেছে, জি এন এল এফ নেতাদের লুটকরা বন্দুক নিয়ে শহর বস্তিতে যে হানাদারির সাম্রাজ্য তৈরি হয়েছিল তা বন্ধ করেছে, জনতার কাছ থেকে ওদের লুটে নেওয়া টাকা পয়সা সহ ৫০-৬০ লক্ষ টাকার মত সম্পত্তি সংশ্লিষ্টদের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে। ধ্বংসপ্রাপত অফিস বাড়ির টিন, অ্যাসবেসটস্ পৌঁছে দিয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের বাড়িতে। ৪০ দিনের বন্‌ধের সময় যখন বাড়ির পুরুষেরা সিকিম, নেপাল ও ভুটানে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল তখন প্রত্যেক বাড়িতে বৃদ্ধ মা-বাবা ও ছোট ছোট শিশুদের জন্য রেশন-পানি পৌঁছে দিয়েছে। এক নাগাড়ে বলে গিয়ে থামলেন ছত্র সুব্বা। বললেন, ওরা অস্ত্র সমর্পণ করার পর এই জনতাই হবে আমার সম্পদ। পালকিতে করে বসে গিয়ে ভোটের মনোনয়নপত্র দাখিল করব আমি, দেখব কার হিম্মত আছে রোখে আমাকে!

ভাবগতিক দেখে যা মনে হল ছত্র আগামী লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন ভালভাবেই। জানা গেছে জি এন এল এফের অত্যাচার সম্পর্কিত লিফলেট ছাপতে দিয়েছেন প্রেসে। সারা পাহাড় জুড়ে বিলি করবেন তা। ভোটের লড়াইয়ে মূল শ্লোগান থাকবে গোর্খাল্যান্ড।

সমষ্টির স্বার্থে একজন গাধাকেও নেতা করে দিলে আপত্তি নেই তার। এমনকি গোর্খাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী যদি একজন বাঙালিও হন তাও তিনি মেনে নিতে রাজি। সমর্থন করছেন ঝাড়খণ্ডের দাবি। উত্তরবংগের রাজবংশী ও আদিবাসীদের জন্যও স্বায়ত্তশাসন দরকার রাখবেন এই বক্তব্যও। তলে-তলে কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের সংগে যে শলা-পরামর্শ চলছে আঁচ করা যায় তা বেশ। তবে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে, এর মধ্যে আন্ডারগ্রাউন্ডেও যাবেন ছত্র, নাকি গোপন মিটিং হবে কোন? নবরূপে আবির্ভূত হবেন পাহাড়ের ঘিসিং তথা কাউন্সিল-বিরোধী একমাত্র প্রকাশ্য নেতা ছত্র সুব্বা, হয়তবা। □

তুষার প্রধান

অস্ত্র সমর্পণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সপ্তাহখানেক আগেও ছত্র-র চোখে-মুখে ছিল দীপ্ত প্রত্যয়। সাক্ষাৎকারটি অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে নেওয়া হয়েছিল। অস্ত্র সমর্পণ সত্ত্বেও ছত্র সুব্বার মতামত এখনও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

কালিম্পঙে ‘রাজা’ আমি : সি কে প্রধান

□ আপনি হিল কাউন্সিল প্রাপ্তিতে নিশ্চয়ই খুশি হয়েছেন। কিন্তু কালিম্পঙের জনতা তা মেনে নিয়েছে কী?

সি কে : কালিম্পঙের ‘রাজা’ আমি। কালিম্পং চালাই আমি। আমি মেনে নিয়েছি আর ওরা মানবে না!

□ আপনি নিজেকে হিটলারের চেয়েও বেশি ভয়ানক বলে দাবি করেছেন সেদিনের জনসভায়?

সি কে : করেছি, করব। আন্দোলন চলাকালীন আমাকে অনেক যুঝতে হয়েছে। অনেক মানুষের গালি, আশীর্বাদ পেয়েছি আমি। সারা পাহাড়ে বিস্ফোরক দ্রব্য বহন করেছি। তবু পুলিশ আমার চুলও স্পর্শ করতে পারেনি। তা বলুন আমার চেয়ে নটোরিয়াস মানুষ কেউ ছিল কী পাহাড়ে?

□ হিল কাউন্সিলের নির্বাচনে লড়ছেন না কেন?

সি কে : শরীরের ঘামরক্ত ঝরিয়ে কাউন্সিল এনেছি। আদায় করেছি নাগরিকত্ব। এর চেয়ে বেশি আনন্দের আর কী হতে পারে? কাউন্সিল নির্বাচনে অন্যান্য বন্ধুরা দাঁড়াবে। সবাই থাকবে আমার হাতের মুঠোয়।

□ অভিযোগ, খুব রাজসিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছেন আপনি?

সি কে : রাজা কী কখনও ভিখিরীর মত চলতে পারে! চল্লিশ দিনের বন্‌ধের সময় গ্যাংটকে থাকাকালীন এই অভিযোগগুলি তৈরি হতে থাকে। তা কালিম্পঙের জনতা ক্রাউন প্রিন্স বানিয়েছে আমাকে, তাদের সম্মান রক্ষার্থে আমি সেখানকার দামি হোটেলে থেকেছি, দামি খাবার খেয়েছি, মদ্যপানও করেছি দামি দামি বোতল। আমি রাজা বলেই না কালিম্পঙের জনতাকে নির্দেশ দিতে পেরেছি নেপালের রাজার মুখচ্ছবি দেখার যেন দরকার না হয়, কালিম্পঙের রাজার মুখচ্ছবি বা ফটো দর্শন করে টীকা লাগাতে হবে। আর কালিম্পঙের রাজা হিসাবে জনতা আমাকে ইতোমধ্যেই স্বীকার করেছে। □

হুগলি

ধনিয়াখালির ঐতিহ্যময় তাঁত শিল্প চরম সংকটের মুখে

নানান সমস্যা হুগলি জেলার ধনিয়াখালির ঐতিহ্যময় প্রাচীন তাঁত শিল্পকে চরম সংকটের মুখে ফেলেছে। অর্থের অভাব, সুতোর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, মহাজনের শোষণ ও সর্বোপরি কেন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্রনীতি জনপ্রিয় এই শিল্পের হাজার হাজার শিল্পীকে ঠেলে দিচ্ছে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। অথচ ইংরেজ আমলে বা তারও আগে থেকে ধনিয়াখালির তাঁতের শাড়ি ঠাস বুনন, উৎকর্ষতা ও টেকসই পাকা রঙের,জন্য বিদেশীদেরও মনোহরণ করেছে। এখনও আরবের কুয়েত, হংকং, জাপান, সিংগাপুর, বাংলাদেশ ও আরও নানা দেশে



ধনিয়াখালির তাঁত শিল্পী ফটো : প্রদীপ দত্ত

ধনিয়াখালির তাঁতের শাড়ির বেশ উল্লেখযোগ্য চাহিদা রয়েছে। কিন্তু বেশ কয়েক মাস ধরে সুতোর দাম হু হু করে বেড়ে যাওয়ায় এখানকার তাঁত শিল্পীরা তাঁত চালাতে পারছেন না। গভীর হতাশায় দিন কাটাচ্ছেন ছোট ছোট তাঁত শিল্পীরা। এছাড়া সরকারের কাছে বহু টাকা দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকায় মার খাচ্ছে তন্তুবায় সমবায় সমিতিগুলোও।

ধনিয়াখালিতে আগে শশী ও শিশংকর নামে এক ধরনের রেশমের কাপড় তৈরি হত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই কাপড়ের চাহিদা ছিল। চালানও যেত। কিন্তু সে কাপড় তৈরি এখন বন্ধ হয়ে গেছে। এখন ধনিয়াখালিতে তৈরি হচ্ছে শাড়ি ছাড়াও উন্নত মানের লুঙ্গি, গামছা, রুমাল, জ্যাকেট, পলিয়েস্টার শার্টিং ইত্যাদি। ডবি এবং জ্যাকার্ড মেশিনের ব্যবহারে তৈরি হচ্ছে নানান ডিজাইনের বৈচিত্র্যময় ধনিয়াখালি শাড়ি। আরও তৈরি হচ্ছে ধুতি, পিওর সিল্ক, আসাম মুগা ও তসরের কাপড়। সেমি অটোমেটিক তাঁতে তৈরি হচ্ছে পলিয়েস্টার শার্টিং।

ধনিয়াখালি থানায় মোট ৬টি প্রাথমিক তন্তুবায় সমবায় সমিতি আছে। এদের মধ্যে ধনিয়াখালি ও সোমসপুর সমিতি প্রধান। ধনিয়াখালি ইউনিয়ন তাঁত শিল্প সমবায় সমিতির তাঁত শিল্পীর সংখ্যা ৪০০ এবং বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৬৭৯। সমিতিগুলি ছাড়া আরও প্রায় তিন হাজার শিল্পী বেসরকারি সংস্থা ও মহাজনের কাছে কাজ করছেন। এখন সব মিলিয়ে প্রায় পাঁচ/ছ' হাজার তন্তুবায় পরিবার ধনিয়াখালিতে তাঁত শিল্পের সংগে জড়িত।

তাঁত শিল্পের সংকটে ধনিয়াখালির তন্তুবায় সমিতিগুলি হতাশাগ্রস্ত। তাদের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্রনীতির ফলে সুতোর দাম প্রতিনিয়তই বেড়ে চলেছে। ফলে তাঁত বস্ত্রে রিবেট বন্ধ হতে চলেছে। উৎপাদিত বস্ত্রের বাজার নেই, ফলে সমিতিগুলিতে বস্ত্রের পাহাড় জমে থাকছে। মজুরি কমে যাচ্ছে শিল্পীদের। তাঁত শিল্পীদের আশংকা, যে কোন সময় সমিতিগুলি বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

ধনিয়াখালি ইউনিয়ন তাঁত শিল্প সমবায় সমিতির সম্পাদক বেচারাম দত্ত ও হিসাবরক্ষক সুজিত নন্দী জানালেন, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে গত '৮০ সাল থেকে '৮৭ এপ্রিল পর্যন্ত সরকারি রিবেটের ৫ লাখ ১৭ হাজার ৪৯৭ টাকা ৩০ পয়সা এবং রাজ্য সরকারের কাছে '৮৬ থেকে '৮৭-র এপ্রিল পর্যন্ত ১ লাখ ৫০ হাজার ৬২০ টাকা ২৯ পয়সা পড়ে আছে। ফলে ঋণের সুদ গুনতে গিয়ে নাভিশ্বাস উঠছে। এদিকে বাজার মন্দা এবং মূলধনের অভাবে সমিতি বাকি শিল্পীদের কাজ দিতে পারছে না। তাঁরা আরো বলেন – এ বছরে মার্চ-এপ্রিলে তাঁত বস্ত্রে রিবেট বন্ধ হওয়ার ফলে ৫ থেকে ৬ লাখ টাকার মত সমিতির ক্ষতি হয়েছে। এর ফলে সমিতির উৎপাদিত ১৫-১৬ লক্ষ টাকার মত বস্ত্র গুদাম ঘরে জমা রয়েছে। শিল্পীদের মজুরী এবং কর্মীদের মাইনে সমিতি দিতে পারছে না। অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই এই সমিতি বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে আশংকা রয়েছে।

সমিতিভুক্ত নয় এমন ছোট ছোট দরিদ্র তাঁত শিল্পীরা মহাজনী শোষণের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের দুর্দশা দিন দিন অবর্ণনীয় হয়ে উঠছে। হুগলী জেলায় আনুমানিক ২৩ থেকে ২৫ হাজার হস্তচালিত তাঁত চলে। এইসব তাঁতের একটা বড় অংশের মালিক মহাজন শ্রেণী। তাঁতহীন তন্তুবায়ীরা দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে এদের কাছে কাজ করে থাকে। অনেক তাঁত শিল্পী মহাজনের কাছে আগাম টাকা নিয়ে নিজের তাঁতটি বন্ধকী দিয়ে দেয়। যতদিন না ধার শোধ হয় ততদিন তারা উৎপন্ন বস্ত্র মহাজনের কাছে পৌঁছে দিতে বাধ্য থাকে বিনা পারিশ্রমিকে। আবার বাজারের অভাবেও মহাজনের কাছে নিজেদের উৎপন্ন বস্ত্র সস্তায় বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে তারা। আবার কোন কোন মহাজন সুতো ও রঙ সরবরাহ করে। বিনিময়ে উৎপন্ন বস্ত্রের মালিক হয়ে বসে তারা। শিল্পী নামমাত্র মজুরী পায়।

সোমসপুর ইউনিয়ন কোঃ অপারেটিভের সম্পাদক মদনমোহন ভড় ও সভাপতি হরেন্দ্রনাথ লাহা জানালেন সুতোর দাম অত্যাধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় শিল্পীদের ঠিকমত কাজ দিতে পারছে না। সমিতির কাপড় ভাল বিক্রিও হচ্ছে না। এ বছরে মার্চ-এপ্রিলে তাঁত বস্ত্রে রিবেট বন্ধ হওয়াতে বহু কাপড় এই সমিতিতে পড়ে আছে। ফলে এই সমিতিও চরম দারিদ্র্যের কবলে পড়ে নানা সমস্যায় ধুঁকছে। বর্তমানে এই সমিতির সদস্য সংখ্যা ৪৬০ এবং তাঁত শিল্পীর সংখ্যা ২৫২। সরকার থেকে তাঁদের রিবেটের টাকা পাওনা আছে ৩ লাখ ৮২ হাজার ৫০০ টাকা। এছাড়া তন্তুজতে ১ লাখ টাকা, হ্যান্ডলুম হাউসে ৯৮ হাজার টাকা, তন্তুশ্রীতে সাড়ে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এবং মঞ্জুষায় দু লাখ সাড়ে আঠার হাজার টাকা বাকি পড়ে আছে।

ধনিয়াখালি থানা এলাকায় তাঁত শিল্পে মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। তারাও পুরুষদের সংগে তাল মিলিয়ে তাঁত বুনে স্বনির্ভর হতে চলেছে।

ধনিয়াখালির জাত শিল্পী পতিত লাহা ও তারক লাহা জানালেন – বর্তমানে সুতোর দাম অত্যাধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় কাপড়ের দাম বাড়াতে হচ্ছে। কিন্তু দাম বাড়িয়ে বিক্রি না হওয়ার আশংকায় মজুরী কমিয়ে

দেওয়া হচ্ছে। তিনি দুঃখের সংগে জানালেন, বর্তমান সরকার যদি এই শিল্পের প্রতি নজর দেন তবেই এই শিল্প ও শিল্পীরা টিকে থাকবে নচেৎ এর ধ্বংস অনিবার্য।

ধনিয়াখালির ঘনরাজপুরে রমা ভড় বললেন রঙিন ঝকঝকে শাড়িগুলোর মত এই শিল্পের সাথে যুক্ত শিল্পীদের জীবন কিন্তু ততটা বর্ণময় নয়। এর বহুবিধ সমস্যা আছে। যেমন গরিব তাঁত শিল্পীদের ভাল তাঁতঘর নেই। বর্ষায় জল পড়ে সুতো ভিজে নষ্ট হয়, শীতকালে কুয়াশা ঢুকে তাঁতের সুতো ভিজিয়ে দেয়। আবার গ্রীষ্মের প্রচন্ড তাপে সুতোর ক্ষতি হয়। এখানে কোন সরকারি তাঁত বস্ত্র ক্রয় কেন্দ্র নেই। নেই কোন সরকারি ব্যবস্থাপনায় সুতো বিক্রির দোকান। এই দুটি ব্যবস্থা চালু থাকলে শিল্পীরা সুতো কিনে কাপড় বুনে ন্যায্য দামে বিক্রি করতে পারতেন। তাদেরকে সইতে হত না বঞ্চনা ও শোষণের তীব্র জ্বালা। তিনি আরো জানালেন ধনিয়াখালির তাঁত শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে সরকারের উচিত অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূল্যে সময়মত সুতোর যোগান দেওয়া। রিবেটের টাকা, শিল্পীদের মজুরী অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিরও প্রয়োজন।

ধনিয়াখালির আলা গ্রামের গুণী শিল্পী ধরণীধর লাহা জানালেন – সুতোর দাম বাড়ার সংগে সংগে সোমসপুর সমিতির কর্মকর্তাগণ কম দামের সুতো তাঁত শিল্পীদের সরবরাহ করছেন। ফলে চরম অসুবিধা দেখা দিয়েছে। কেননা, উচ্চমানের সুতোয় যে পরিমাণে কাপড় তৈরি হওয়ার কথা নিম্নমানের সুতোয় তার চেয়ে অনেক কম কাপড় তৈরি হচ্ছে। ফলে শিল্পীকে বাইরের থেকে সুতো কিনে কাপড় তৈরি করে দিতে হয়। এই দুর্মূল্যের বাজারে যখন অন্যান্য শিল্পের শ্রমিক ও কর্মচারীরা তাদের মজুরী বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন চালাচ্ছে তখন তাঁত শিল্পীরা চরমভাবে মার খেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাদের উন্নতির কোন আশাই দেখা যাচ্ছে না। ধনিয়াখালির সনৎ ভড় বললেন সুতোর দাম বৃদ্ধি হওয়ায় বড় বড় মহাজনের কাছে চড়া দামে সুতো কিনতে তাঁরা বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু মহাজনদের কাছে কাপড় বিক্রি করার সময় চড়া দামে পাচ্ছেন না। ফলে তাঁত শিল্পে লাভের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণই দিন দিন বাড়ছে। এভাবে বেশি দিন চললে এ শিল্পের ধ্বংস অনিবার্য।

শেখ সিরাজ

নদীয়া

শান্তিপুর, রানাঘাটে গংগার ভাঙনে হাজার হাজার মানুষ বিপন্ন

গংগার বিধ্বংসী ভাঙনে নদীয়া জেলার রাণাঘাট এক নম্বর ব্লক ও শান্তিপুর ব্লকের ছ'টি গ্রামের প্রায় ১৫ হাজার মানুষ নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছেন। ঐ অঞ্চলগুলির প্রায় ১০ হাজার একর জমি এখন গংগার করাল গ্রাসের কবলে। সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে দুটি স্কুলকে ও ফুলিয়া গ্রামের বাংলা রামায়ণ রচয়িতা মহাকবি কৃত্তিবাসের বসত ভিটেসহ আশেপাশের আরও ২০ হাজার মানুষ বিপন্ন। যেকোন সময় গংগার ভাঙনে তাদের বাড়িঘর ছেড়ে চলে যেতে হতে পারে অন্য কোথাও।

শান্তিপুর ব্লকের বয়রা, পূমলিয়া ও মালিপোতা এবং রাণাঘাটের এক নম্বর ব্লকের তারাপুর, তিলডাংগা, নতুন শিবপুর, গোসাইচরা গ্রামের কাছে গংগার ভাঙন শুরু হয় ১৯৬৮ সাল থেকে। স্থানীয় অধিবাসীদের অভিযোগ, ফরাক্কায় গংগার ওপর বাঁধ হওয়ার পরে গংগার স্রোত প্রচন্ড বেড়ে যায়। তখন থেকেই অল্পবিস্তর ভাঙনের শুরু। ১৯৮৫ সালে গংগাতীরের বিপন্ন গ্রামগুলিকে বাঁচাতে একটি বাঁধ তৈরি হয়। কিন্তু স্থানীয় ঠিকাদার অমিতাভ মুখার্জীর অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, সেই সময়ের পর থেকে গংগা তারাপুর গ্রামের দিকে প্রায় তিন হাজার ফুট ভেতরে ঢুকে এসেছে। বাঁধের বেশ কিছুটা অংশও চলে গেছে গংগার গর্ভে। ঐ এলাকায় মাটির অল্প নিচেই আছে বালির স্তর। গংগার জলরাশি বামতীরের এই বালির স্তরে আঘাত করায় অতি দ্রুত এলাকার পর এলাকা চলে যাচ্ছে গংগাগর্ভে।

গংগাতীরের পূমলিয়া গ্রামের অবস্থাও অত্যন্ত করুণ। গ্রামের মোট এলাকার ৭০ শতাংশের ইতিমধ্যেই সলিল সমাধি ঘটেছে। দুরু দুরু বুকে গ্রামের অন্য অংশের অধিবাসীরা দিন গুনছেন নিজেদের ভিটে-বাড়ি ভেঙে সরে যাওয়ার অপেক্ষায়। স্থানীয় গংগা ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির সম্পাদক বনমালি বিশ্বাস জানালেন, গংগার এই সর্বনাশা ভাঙন প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ১৯৮৪ সালে ঐ কমিটি গঠিত হয়। তারপর থেকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছে তাঁরা বহু আবেদন নিবেদন করেছেন, চিঠিচাপাটি দিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত সরকারি তরফ থেকে কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাঁর হিসেবমত, শান্তিপুর ব্লকের ফুলিয়া এক নম্বর, গংগাধরপুর, ঘোষড়া, রানীরডাংগা, চম্পকতলা মৌজার আজ কোন চিহ্নই নেই। এছাড়া, পূমলিয়া বৃত্তিচর ও মালিপোতা মৌজার অধিকাংশ জমিই গংগাগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। বনমালিবাবু জানান, গংগার ভাঙন প্রতিরোধে কার্যকরী ব্যবস্থার দাবিতে ১৯৮৪ সালে তাঁরা লোকসভা নির্বাচনও বয়কট করেছিলেন।

পূমলিয়া নিম্ন বুনিয়াদি স্কুলটিকেও অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে। নদীয়ার জেলাশাসক প্রসন্নকুমার প্রধানের তৎপরতায় সম্প্রতি সামান্য কিছু কাজ আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু গৃহহীনদের পুনর্বাসনের জন্য এখনও পর্যন্ত কোন সরকারি সাহায্য পাওয়া যায়নি।

শুভেন্দুকুমার ভৌমিক

জেলায় জেলায়

খেলার মাঠ চাই

সিউড়ির হাটজন বাজারে মিলের পাশে যে খেলার মাঠটি আছে সেটি বর্তমানে অধিগ্রহণ করে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে স্থানীয় ছেলেরা খেলাধূলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে চলেছে। ঐ মাঠটি স্থানীয় মানুষের কাছে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই জরুরী। তাই স্থানীয় জনগণ ঐ মাঠটি অধিগ্রহণের তীব্র বিরোধিতা করে জেলা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

(বীরভূম হিতৈষী/বীরভূম)

সাংবাদিকদের মৌনমিছিল

সম্প্রতি নদীয়া জেলা ডব্লিউ বি ইউ জে ইউনিটের উদ্যোগে কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে জেলার বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকবৃন্দ একটি মৌনমিছিল করে জেলা শাসকের দপ্তরে হাজির হন। ইউনিটের ফেস্টুন, পঃ বঃ সরকারের প্রেস কার্ড সংক্রান্ত সার্কুলার বাতিলের দাবিতে বিভিন্ন পোস্টার নিয়ে মিছিলের যাত্রা শুরু হয়। জেলা শাসকের অনুপস্থিতিতে অতিরিক্ত জেলা শাসকের নিকট বিভিন্ন দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পরে জেলা শাসকের দপ্তর থেকে মৌনমিছিল জেলা তথ্য আধিকারিকের দপ্তরে পৌঁছয় এবং জেলা তথ্য আধিকারিক নারায়ণচন্দ্র বসুর নিকট ডেপুটেশনের প্রতিলিপি দেওয়া হয়। সাংবাদিকদের মৌনমিছিলে জনমানসে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

(স্রোতস্বনী/নদীয়া)

চোরাই কাঠ

রায়দীঘি বাজার ও সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় প্রচুর চোরাই কাঠ দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন লোকেরা অবৈধভাবে এইসব কাঠ কেনাবেচা করছেন। সুন্দরবনের কোন এলাকা থেকে এই কাঠ পাচার হচ্ছে? ২৪ পরগনা ফরেস্ট ডিভিশন ও সুন্দরবন প্রকল্প এই দুই বন বিভাগের মাঝখানে সূয়া নদী অবস্থিত। এই নদীতে শক্ত প্রতিরক্ষা প্রয়োজন। এবং যথাযথভাবে টহলদারী পাহারার ব্যবস্থা করলে কিছুটা কাঠ পাচার বন্ধ হতে পারে। বনদপ্তর এ বিষয়ে উদাসীন কেন?

(সুন্দরবন সমাচার/দঃ ২৪ পরগনা)

বেড়াচাঁপায় মদের হাট

বেড়াচাঁপায় টাকী রোডের প্রায় ওপরে সম্প্রতি সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় মদ খাওয়ার প্রতিযোগিতা। যখন সারা দেশে মদের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি হচ্ছে তখন বেড়াচাঁপাতে ব্যাপক প্রসার লাভ করছে এই মারাত্মক ব্যবসা। গ্রামের তিন-চার জায়গায় এই ব্যবসা চলছে রমরমাভাবে। বছরে দু একবার অবশ্য পুলিশ যায়। তখন বিক্রেতারা সরে পড়ে কয়েক ঘন্টার জন্য। আবার যেমন তেমন। সন্ধ্যার পর ছেলেমেয়েদের রাস্তার ওপর দিয়ে চলতেই ভয় করে। এ ব্যাপারে আবগারী দপ্তরের আন্তরিকভাবেই তৎপর হওয়া প্রয়োজন।

(প্রতিবেদন/উত্তর ২৪ পরগনা)

সংকলক : প্রীতম দে চৌধুরী

ফুলকি



প্রায় এক বছর জুটমিল বন্ধ থাকাতে বাড়ির কর্তা আকবর আলি মল্লিক বেকার অবস্থায় সব কিছু বেচে বন্ধক দিয়েছে। চার-পাঁচটা মুদিখানায় তার অনেক দেনা – ধারে আর দশ পয়সার নুনও দেয় না কেউ।

দুদিন অনাহারে চলেছে। বড় ছেলে নয়মদ্দি কানে বন্ধ কালা, তার বউ আর চারটে ছেলেমেয়ে নিয়ে পুরনো ঝুপড়িটার মধ্যে আলাদা খায়। সে যে জুটমিলে কাজ করে ছ মাস বন্ধ যাবার পর এখন খুলেছে, তবে শ্রমিক সংস্থা সমবায় ভিত্তিতে লাভ-ক্ষতির দায় ঘাড়ে নিয়ে মিল চালাতে গিয়ে অর্ধেক মাত্র মজুরি দিচ্ছে। মেজো ছেলে কসিমদ্দি কখনো কখনো চাষের জন্য খাটে। তার হাতে বালা। গলায় লকেট, মাথায় বড় বড় চুল। দুদিন কাজ করে তো দশদিন মস্তানি করে বেড়ায়। কখনো কখনো মদ খেয়ে বাড়ি ফিরে খেতে না পেলে 'উল্কোপাত' করে।

ছোট ছেলে রহিমদ্দি পাতলা রোগাটে রোগাটে চেহারা হলে কি হবে আঠারো বছর বয়সেই সে অনেক বুদ্ধি ধরে। পঞ্চায়েত সদস্যের সংগে মিঠে ব্যবহার করে। সাগর গ্রামীণ ব্যাংক থেকে একটা চমৎকার চকচকে রিকসা পেয়ে গেছে। তাতেই তার বিয়ে হয়ে গেল। বউ নাজমা গরিব ঘরের মল্লিকদের মেয়ে হলে কি হবে, দেখতে যেমন ফরসা তেমনি সুন্দরী। সবাই অবাক হয়েছিল, এমন ঘরের এমন ছেলের এইরকম পরীর মতন বউ? ডাক নাম ফুলকি। আগুনের ফুলকি? তাই বটে।

পাড়ার মেয়েরা বলে, 'হলে কি হবে, দু-মাসেই ঐ মেয়ে খারাপ হয়ে যাবে যেরকম ঝগড়াটে বাড়ি। আকবরের বউয়ের সংগে তার জা বা ননদের যেরকম তুলকালাম ঝগড়া হয় দুদিন ছাড়া তাতে ভিটের খড়কুটো উড়তে থাকে। ননদ চার পাঁচবার নিকে করার পর কারো ঘর করতে না পেরে চারটে ছেলে নিয়ে বাপের কুঁড়েটা দখল করে ভিক্ষে করে বেড়ায়। তার বড় ছেলে হেই লম্বা, পাড়ার এক মাতালের ঘরজামাই হয়ে থাকে। আর দুটোর একটা মোটঘাট বয়, মাতাল হয়ে ফেরে। তবে চেহারাখানা মজবুত আর উঁচু। রঙটাও ফরসা। ছোটটার বুক কুঁজো, অ্যাজমা রোগ আছে চিরকাল। বুড়ো বরের ছেলে।

আকবরের গাছ ছাড়ানে ভাই আনসারের ঘর ডোবার পাশে। দোচালা ভুঁইকুঁড়ে। তার বউ মদ্দানী মেয়ে। বাজারে আনাজ বেচতে যায়। কম দামে পাড়ার ছেলেদের কাছ থেকে চুরির কলা, নারকেল, পেঁপে, কুমড়ো কেনে। রাত্রে বিনা সাক্ষীতে সে মাল নেয়, বেচে এসে পয়সা দেবার কথা বলে কিন্তু আর দেয় না। কিছু বললেই বলে, 'বলে দোব।' ভোর চারটের সময় সে লম্ফ জেলে নিয়ে বাঁশতলার ভেতর দিয়ে চলে যায় চা দোকানে। পুরুষদের মধ্যে বসে বসে নোংরা রসের গপ্পের নায়িকা হয়ে চা খেয়ে হাটে চলে যায়। তার তিনটে মেয়ের বিয়ে-নিকে দিয়েছে, আছে দুটি নাবালক ছেলেমেয়ে।

আকবরের একটি মাত্র মেয়ে, আবলুস কালো, নাম আদুরী। তার স্বামী এখন নাকি দিল্লিতে চলে গেছে। ছ-মাস এক বছর পরে একবার দেখা দিতে এসে মাস খানেক পড়ে থাকে। তখন দু একশো টাকা দেয়। আদুরীর চারটে ছেলেমেয়ে। তার বড় মেয়েটা পালতে নেওয়া ছাগল চরায় – আর তুংগ বুকে টেপ ফ্রক পরে সে তির্যক চোখে হাসে। গোবর কুড়োয়। পাতা ঝাঁট দিয়ে আনে। ঝগড়া লাগলে নানী আর মায়ের সংগে বোড়া সাপের মন্তর-ঝাড়া পচাল পাড়ে দুলে দুলে।

এগারো জন লোক দুদিন শুকিয়ে পড়ে আছে। ভাত হয়নি। রহিমদ্দির রিক্সাও ম্যাটাডোরের সংগে ধাক্কা খেয়ে গ্যারেজে পড়ে আছে – টাকার অভাবে ছাড়ানো হয়নি। একশো আশি টাকার বিল হয়েছে। ব্যাঙ্কের চিঠি এসেছে তিনটে। ইনস্টলমেন্টের টাকা আদায় দেবার জন্যে।

আবার সন্ধ্যা হয়ে এল। হাঁড়ি চড়ার কোনোরকম আশা নেই। আঁচল পেতে মাত্র এক কেজি চাল বা আটা ধার নেবার জন্যে আকবরের বউ পাড়ার সব বাড়ি থেকে ঘুরে এসেছে, কেউ দেয়নি। আদুরীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ক্ষিদের জ্বালায় 'ভিমরি' লেগে যাচ্ছে শুনেও কারো প্রাণে একটু দয়া হয়নি।

বউ নাজমা খুঁটি ধরে বসে থাকে। বাড়িতে আলো জ্বলে না।

আকবরের বউ বলে, 'তুই মা না হয় কদিনের জন্যে বাপের বাড়ি চলে যা – রহিমদ্দিকে রেখে আসতে বলতিছি – কই যাচ্ছে ছেলে। বলি দ্যাখ, তোর শ্বশুরকে যেয়ে বল, 'রিক্সা' ছাড়াবার টাকাগুলো দিক। তাও যাচ্ছে কোথা? বউয়ের রূপ নিয়ে ধুয়ে খাক।'

নয়মদ্দি-কালার বউ রাঁধাবাড়া শেষ করে হাঁড়ি-কুড়ি তুলে নিয়ে ঘরের মধ্যে বাচ্চাদের খাইয়ে দেবার সময় আদুরীর ছেলেমেয়েগুলো বন্ধ দোর-গোড়ায় গিয়ে কাঁদতে থাকলে গালাগালি করে নড়া ধরে মেরেপিটে টেনে আনে।

রাত আটটার পর এক ঠোঙা মুড়ি, কতকগুলো আলুর চপ আর দেশি ধেনো মদের বোতল নিয়ে রহিমদ্দির সংগে ফেরে তার পিসির মেজ ছেলে গফুর। মুদিখানার গাড়ি খালাস করা মাল বয়ে সে যে পনেরো টাকা কামাই করেছিল এক কেজি চাল, আধ কেজি আলু আর এইসব কিনে নিয়ে ফিরতে সব টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। তার মা চাল-আলু বাঁধা গামছাটা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। গফুরের তখন বেশ মৌতাত, নেশা ধরেছে দু-গেলাস সাদাপানি অন্যের পয়সায় সেবা করে আসার ফলে। মুড়ির ঠোঙাটার দিকে এখন সবায়ের লক্ষ্য!

দু কামরা মাটির ঘর তুলেছে আকবর গত তিন সন হল। বাঁশ নিয়েছিল 'ষোল আনা'র কবরস্থানের ধারে। ১২০০ টাকার জন্যে পাড়ার পাঁচজন ঈদগাঁর নামাজের পরে আকবরকে বলে, 'সামনের ঈদ পর্যন্ত যদি টাকা না মেটাও ঘরের সব টালি-খোলা খুলে আনব আমরা।'

রহিমদ্দি আদর করে জড়িয়ে ধরে নিজের ঘরে ঢোকায় গফুরকে। গফুর নেশা করে এসে গত পরশু উন্মাদ কীর্তি-কলাপ করতে থাকলে তাকে আকবর, তার বউ নসিমন, আদুরী সবাই ধরে মেরেছিল। মাও পিটেছিল কিন্তু সেই গফুর নেশার ঘোরে ঘুমন্ত আদুরীর সংগে কি করেছে না করেছে আজ আর তার মনে না থাকলেও এটা বেশ মনে আছে ওরা সবাই তাকে মেরেছিল। এখন মুড়ি-তেলেভাজার ঠোঙার দিকে তাকালে কি হবে?

আকবর দাবায় বসে বলে, 'হাঁর‍্যা বাপ গফুর, কি আনলি মুই তোর বুড়ো মামু বসে রইনু – একটা দে।'

রহিমদ্দি জবাব দেয় মুড়ি তেলেভাজা গালে পুরে চিবোতে চিবোতে, 'ওকে মারার সময় মনে থাকেনে?'

আকবর বলে, 'হাঁ হাঁ, তুই আর তোর বউকে নিয়ে খুব করে খা।'

'বেশ খাবো। দোর এঁটে দিয়ে খাব। ওকে আমি খাওয়াইনি? কিরে বল গফুর?'

গফুর বলে, 'আলবৎ। খাও তোমরা দুজন। আমি আবার 'খিচড়ি' খেতে যাব। ঘোষেদের দোকানে হচ্ছে। যেতে বলেছে।'

এতক্ষণ অন্ধকারে খাওয়া-দাওয়া চলছিল। হঠাৎ গফুরের মনে পড়ে তার 'ট্যাঁকে দেশলাই আর ছোট মোটা একটা মোমবাতি আছে। মানিক পীরের দরগায় সাতটা কপাল ঠোকার পর বাতিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেবার পর তুলে এনেছে। ডাব, কাচের গেলাস, মানতের নানান জিনিস তুলে আনে সে প্রায়ই। মা গালমন্দ করলেও শোনে না।

আলোটা জ্বাললে সেটা নিয়ে দোর খুলে বাইরে বসিয়ে আসতে যায় রহিমদ্দি। সেই ফাঁকে গফুর নাজমাকে ধরে। নাজমা চাপা হাসি হাসে। নিজেকে ছাড়াতে চায়। তার গালে গুঁজে দেয় একটা গোটা আলুর চপ। মুড়ি ঢেলে দেয় চাট্টি পেট-কাপড়ে। আর ট্যাঁক থেকে দু টাকার একটা নোট দিয়ে দেয় নরম লালচে হাতের তালুর মধ্যে।

নাজমা ফিসফিসিয়ে বলে, 'ওকে দাও, টাকা আমি নিয়ে কি করব?'

'কি বোকা মেয়ে রে! লুকিয়ে লুকিয়ে মরবে?'

মা চেঁচাতে থাকে। 'ঐ রহি, আলো তোর ঘরে জ্বাল যেয়ে। রূপ দেখুক তোর বউয়ের।'

আকবরের হাতে লুকিয়ে একটা আলুর চপ দিয়েছে রহিমদ্দি। তাই সে বলে, 'দিক না আলো, মশায় যে আর বসা যায় নে।'

ভাত রান্না হতে গফুরকে বাসনে করে তার পিসি রহিমদ্দির ঘরের ভেতরে দিয়ে গেলে গফুর খায় না। নাজমাকে বলে, 'তুমি খেয়ে লও – রহি, তুইও খা। দুজনে একসংগে খা – মুই দেখি। মুই তো 'খিজড়ি' খেতে যাব। এখন ভাত খেলে নেশা চটে যাবে। মোর গুরু মধুসূদন খাঁড়া বলে, নেশা চটলে যেন পুত্রশোক।'

রহিমদ্দি খেতে বসে বউয়ের গালে ভাত গুঁজে দিলে সে যখন লজ্জা পায় হঠাৎ গফুর 'ইয়াআলী'বলে এমন জোরে হাঁক ছাড়ে যে ওরা চমকে ওঠে। সবাই গালমন্দ করতে থাকলে হা হা করে হাসে গফুর।

কিছুক্ষণ পরে গফুর টলতে টলতে আবার পাকা রাস্তা ধরে চলে যায় ঘোষের দোকানের দিকে।

কসিমদ্দি ফিরল বড় বড় দুটো পাকা কুমড়ো নিয়ে।

শুধু কুমড়ো ঘণ্ট খেয়ে প্রাণ বাঁচায় সবাই।

সকালে আকবর বেরিয়ে দু-ছিলিম গাঁজা টানার পর নগদ বারো শো টাকায় ঘরের সমস্ত টালিখোলা বেচে দিলে পাড়ার একজন চাষীকে।

এক বস্তা চাল, দশ কেজি আলু, তিন কেজি মাংস, শাড়ি। বাজার হাট কিনে নিয়ে ফিরে রহিমদ্দিকে দিলে একশো আশি টাকা রিক্সা ছাড়িয়ে আনতে।

কদিন খাওয়া-দাওয়া ভাল চলল কিন্তু ঘর উদোম রইল। সামনে বড় পুজো। কাজ থাকলে বোনাস পেত আকবর। দুশো টাকা হাতে ছিল, হঠাৎ বৃষ্টিতে কাঁথা-কাপড় সবকিছু ভিজে একেককার হলে দেয়াল বাঁচানোর জন্যে খড় কিনে এনে নিজেই ঘরটা ছেয়ে ফেললে আকবর। তাও দশ খানা বড় বাঁশ কিনতে হয়েছে দুশো টাকায় ছাগল বিক্রি করে। বাঁখারী নইলে খড়ের ওপরে বাঁধবে কি দিয়ে? দুশো টাকার খড়ে মটকাটা কেবল ছাওয়া হয়। দাবার চাল পড়ে থাকে। একদিন তিনটে নারকেল গাছের সমস্ত পাতা মুড়িয়ে নিয়ে দাবাটা ঢাকা দেওয়া হয়। কিন্তু পালতে-নেওয়া ছাগল দুটো দুশো টাকায় বেচে দেবার কথা কানে গেলে মালিকের বউ ছুটে এসে ছাগল চায়।

ঝগড়া চরমে ওঠে।

ফুলকি বউ চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখে। শাশুড়ি ননদ আর তার মেয়েকে পেচাল পাড়তে দেখে সে বলে, 'এ বাড়িটা একেবারে নরক! এরা ধ্বংস হয়ে যাবে।'

শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় পরে ছাগলের দাম দেওয়া হবে। জুটমিল খুলুক। ফুলকিই ছাগলগুলির হাতে ধরে ঝগড়া মিটিয়ে দেয়।

কিন্তু জুটমিল আর খোলে না। পায়ের তলায় 'গুরমো' আছে আকবরের – তবুও সে সাত মাইল দূরের চটকলে যায় বেশ খানিকটা হেঁটে – তারপর বাসে চড়ে। টিকিট ফাঁকি দেয়। নয়তো হাতে-পায়ে ধরে কন্ডাকটরের।

মিলের গেটে তালা লাগানো তেমনটি ঝুলতে দেখে। আট দশটা তালা। নানান পক্ষের।

রহিমদ্দি রিক্সা চালিয়ে চাল আর বাজার-হাট এনে বউকে নিয়ে আলাদা খায় এবার। নইলে ব্যাংকের দেনায় নাকি তার বউটাকে 'কোরক' করে নিয়ে চলে যাবে।'

শেষে বাস্তু আর ঘর বন্ধক দিলে আকবর। তিন বছরের মধ্যে সুদসমেত সমস্ত টাকা না দিলে বাস্তু-বাড়ি ছাড়তে হবে।

হাঁ, তখন ছাড়তে হয় ছাড়বে আকবর। তার আগে কি চটকল খুলবে না?

আরো তিন মাস পরে বন্ধ জুট মিল খুলল। তখন আকবর ভিক্ষে করে। তার শরীরও ভেঙে পড়েছে। কাশে আর হাঁপায়।

কারখানা থেকে ছাঁটাই হয়ে গেল আকবর আলি। প্রভিডেন্ড ফান্ডে তার এমন কিছু পাওনা ছিল না। অনেক বার সে কন্যাদায়, গৃহনির্মাণ, আধি-ব্যাধির অজুহাত দেখিয়ে টাকা তুলে নিয়েছে। ৭০০ টাকা পেলে মাত্র। বাস্তু বন্ধকের সুদ দিতেই তা ফুরিয়ে গেল।

তিন বছর পরে ঋণের দায়ে বাস্তুবাড়ি দখল হয়ে গেল। গুণ্ডা এনে দখল নিলে আকবর আর তার বউ, মেয়ে নাতি-নাতনিরা পথে ভাসল।

সেজ ছেলে তার বউ ফুলকিকে রিক্সায় তুলে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল। মেজো ছেলে পাড়ার তাড়ি ব্যাপারীর ঘর-জামাই হয়ে গেছে তখন।

গফুর নেশায় মাতাল হয়ে মুড়ি তেলেভাজা এনে মায়ের কুঁড়েঘরের দাবায় বসে চেল্লাতে থাকে, 'নাজমা কোথা – নাজমা! ফুলকি! আগুনের ফুলকি!'

তার মা বলে, 'নাজমা তো বাপের বাড়ি চলে গেছে। ফুলকি বউ কি তোর বুকে আগুন ধরিয়ে গেছে হাঁরে গোলাম-বাচ্চা?'

গফুর বলে, 'আমি খুন করব। বড় মামুর ঘর কে দখল করবে আসুক। আমার বুক যে হু হু করে পুড়ে যাচ্ছে মা। ফুলকির কাছে আমি যাব।'

কলকাতার রাস্তায় আকবর আর তার পরিবার-পরিজন কোথায় হারিয়ে গেছে ভিখিরি দলের মধ্যে এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে কি?

তবে বছর দেড়েক পরে আদুরী আর তার মেয়ে রাজ্যের রুপোর গয়না আর বোরখা পরে পিসিকে দেখতে এসে জানালে, 'মোরা এখন মেটেবোরোজে আছি।'

আদুরী নিকে সেঁধিয়েছে ডকে কাজ করা বুড়ো হিন্দুস্থানীর সংগে। আদুরীর মেয়ের বিয়ে হয়েছে কসাইখানায় কাজ করা হিন্দুস্থানী মুসলমান ছেলের সংগে। তার একটা ঠ্যাং অবশ্য খোঁড়া। আকবর এখনো বেঁচে আছে। বস্তিতে ঘরভাড়া নিয়ে থাকে। আদুরীর মা কসাইখানা থেকে 'উজড়ি' (উদর, উদরি, উজড়ি) এনে বিক্রি করে। জামাই, নাতজামাইও কিছু কিছু দেয়। আদুরীর বাচ্চা কটা থাকে ওদের কাছেই। তারা হালদার পাড়ায় দর্জির কাজ শিখতে যায়।

আদুরীদের মেটিয়াবুরুজে পৌঁছে দিয়ে তাদের বাসাবাড়ির ঠিক-ঠিকানা দেখতে গিয়ে গফুর দেখল বড় মামা আকবর আলি দাড়ি রেখে মসজিদের পাশে অন্ধ সেজে দুলে দুলে গামছা পেতে বসে ভিক্ষে করে।

আদুরীর পাকা মাথা বর রুস্তম বললে, 'যদি তুমি মদ খাওয়া ছাড়তে পার গফুর, তোমাকে খিদিরপুর ড্রাই ডকে জাহাজের মাল খালাসের কাজে লিতে পারি। আমি মজদুর ইউনিয়নের সরদার।'

গফুর ওয়াদা করল সাত মসজিদের কসম খেয়ে। কিন্তু দিন দুই পরে বাড়িতে খবর শুনলে রহিমদ্দি মারা গেছে। রিক্সা নিয়ে মদ খেয়ে ফেরার সময় কে নাকি তাকে খুন করেছে। নাজমার সংগে দেখা করতে গেল গফুর।

রহিমদ্দির কবর দেখে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে কাঁদতে লাগল সে খুব। শোক বিহ্বলা নাজমা তাকে দেখে পাগলের মতো উতলা হয়ে আরো কাঁদতে লাগল। ফেরার সময় গফুর বললে, 'নাজমা আমি মদ খাওয়া হারাম করে দিয়েছি। তুমিও বলেছিলে, মদ খেয়ো না। আমি এবার মেটিয়াবুরুজে থাকব গিয়ে। আদুরীর বর ডকে জাহাজের মাল খালাসের কাজ দেবে বলেছে। আল্লার কসম বলছি, আমি এবার সৎ হব।'

নাজমা চোখ মুছে তার দিকে আশ্বাসভরা চাউনিতে তাকিয়ে ছিল। আহা! কী সুন্দর চোখ। প্রজাপতির মতো পতপত করে। □

আবদুল জব্বার

ঋষি রাজনারায়ণ বসু এবং প্রিয়নাথ ঘোষের স্মৃতি বিজড়িত গ্রাম বোড়াল

'রাজনারায়ণের বিদ্যা, বিনয় এবং ধর্মভাব দেখিয়া, দিন দিন তাঁহার প্রতি আমার অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখনকার ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মধ্যে তাঁহার বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। তখন তিনি একজন কৃতবিদ্য বলিয়া গণ্য।... ধর্মভাবে তাঁহার সহিত আমার হৃদয়ের খুব মিল হইয়া গেল। তাঁহাকে আমি উৎসাহী সহযোগী পাইলাম।'

'ছেলেবেলায় রাজনারায়ণবাবুর সংগে যখন আমাদের পরিচয় ছিল, তখন সকল দিক হইতে তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না। তাঁহার মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটিয়াছিল, একদিকে তিনি আপনার জীবন এবং সংসারটিকে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন আর একদিকে দেশের উন্নতি সাধন করিবার জন্য তিনি সর্বদাই কতরকম সাধ্য ও অসাধ্য প্ল্যান করিতেন তাহার আর অন্ত নাই।...... ভগবদ্ভক্ত চিরবালকটির তেজপ্রদীপ্ত হাস্যমুখর জীবন, রোগে শোকে অপরিম্লান তাঁহার পবিত্র নবীনতা, আমাদের দেশের স্মৃতিভাণ্ডারে সমাদরের সহিত রক্ষা করিবার সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।'

ওপরের লেখা দুটির প্রথমটি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী' থেকে এবং দ্বিতীয়টি রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' থেকে পাওয়া। পিতা-পুত্র দুজনেই তাঁদের আত্মজীবনীতে যাঁর কথা লিখে গেছেন সেই মানুষটি হলেন –

'Grandfather of Indian Nationalism' আখ্যায় ভূষিত ঋষি রাজনারায়ণ বসু। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ সেপ্টেম্বর রাজনারায়ণ ২৪ পরগনার মাগুরা পরগনায় অবস্থিত বোড়াল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

রাজনারায়ণের প্রপিতামহ শুকদেব বসু সপ্তদশ শতকের শেষদিকে বোড়ালে বসবাস শুরু করেন। কনৌজাগত ৫ম কায়স্থের অন্যতম মহর্ষি গৌতম গোত্রস্থ দশরথ বসুর বংশ হল রাজনারায়ণ বসুর বংশ। রাজনারায়ণের পিতা নন্দকিশোর বসু ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের একান্ত সচিব। রাজনারায়ণ শৈশবে ৭ বছর পর্যন্ত বোড়ালে ছিলেন। এরপর তিনি বোড়াল ছেড়ে গেলেও বোড়ালের সংগে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ছিল। তবে তাঁর কর্মকাণ্ডের সিংহভাগই সম্পাদিত হয় মেদিনীপুরে। তিনি মেদিনীপুরে জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করেন এবং নিজের দু'ভাইয়ের সংগে দুটি বিধবা কন্যার বিয়ে দেন। এর ফলে বোড়ালে আসা তাঁর পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। তিনি সমেত বসু পরিবার বোড়াল ছেড়ে যান ১৮৬৮ সাল নাগাদ। শেষজীবন রাজনারায়ণ কাটান দেওঘরে।

রাজনারায়ণের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলার সূচনা করেন। মাইকেল মধুসূদনের বন্ধু, বিদ্যাসাগর-দেবেন্দ্রনাথের সহকর্মী রাজনারায়ণ বসুর জন্মভূমি গ্রাম বোড়াল হলেও তাঁকে নিয়ে এখানে তেমনভাবে মাতামাতি বর্তমানে নেই। রাজনারায়ণের জন্মভিটেয় বোড়ালের প্রাচীন বিদ্যালয়ের ক্লাস চলত গত শতকের শেষদিকে এবং এই শতকের প্রথমদিকে। তারপর দীর্ঘদিন অযত্নে পড়ে থাকার পর চল্লিশের দশকের শেষে পুরনো ভেঙে পড়া বাড়ি নষ্ট করে সে জায়গায় 'রাজনারায়ণ স্মৃতি মন্দির' নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সভাপতি হন প্রবীণ সাহিত্যিক সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। অন্যান্য সদস্যরা হলেন শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্র ঘোষ (রাজনারায়ণের নাতি), ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, জননায়ক শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ। স্মৃতিমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ১৯৫০-এর ২৬ মার্চ তৎকালীন পশ্চিমবংগের রাজ্যপাল কৈলাশনাথ কাটজু। প্রায় ষাট হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত স্মৃতিমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৫১-এর ২৫ ফেব্রুয়ারি।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল তৎকালীন রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় রাজনারায়ণ স্মৃতিমন্দিরে ঋষি রাজনারায়ণ প্রাথমিব বিদ্যালয় ও বোড়াল প্রিয়নাথ লাইব্রেরির উদ্বোধন করেন। পরে



ফটোঃ তরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

ঋষি রাজনারায়ণ স্মৃতিমন্দির

প্রিয়নাথ লাইব্রেরি নিজস্ব বাড়িতে উঠে গেলেও স্মৃতিমন্দিরে প্রাথমিক বিদ্যালয়টি থেকে যায়। বর্তমান মন্দিরের চারপাশে জংগল। প্রস্রাবখানা-পায়খানা, টিউবয়েল, বিদ্যুতের ব্যবস্থাবিহীন এবং প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়া পাঁচিল নিয়ে ঋষি রাজনারায়ণ স্মৃতিমন্দিরটি এখন কোনরকমে দাঁড়িয়ে আছে। স্মৃতিমন্দিরকে প্রকৃত স্মৃতি মন্দির করে তোলা একান্ত এবং আশু প্রয়োজন।

ঋষি রাজনারায়ণের নামে গ্রামে একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় আছে এবং পঞ্চায়েত চলে তাঁর নামে। ঋষি রাজনারায়ণ অঞ্চল পঞ্চায়েত ১ এবং ২।

উনিশ শতকে, ১৮৪৩-এর ২৩ আগস্ট, বোড়াল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন আর এক বরণীয় সন্তান – ঋষি রাজনারায়ণের ভাবশিষ্য, প্রিয়নাথ ঘোষ। তিনি এম এ পাস করে প্রথমে ইংরেজদের করদ রাজ্য কোচবিহার-মহারাজার গৃহে শিক্ষকতা শুরু করেন পরে কোচবিহার এস্টেটের দেওয়ান নিযুক্ত হন। এস্টেটের কাজে তিনি ইংলণ্ডে ঘুরে গ্রামে ফিরলে 'কালাপানি' পার হওয়া এবং ম্লেচ্ছদের সংগে মেলামেশার জন্য প্রায় একঘরে হয়ে পড়েন। তৎকালীন গ্রামীণ মানুষ প্রিয়নাথের থেকে প্রভূত সাহায্য গ্রহণ করলেও কালাপানি পার হওয়া তাঁরা ভাল মনে নিতে পারেননি।

বোড়াল গ্রামের উন্নতিতে প্রিয়নাথের অবদান সর্বাধিক। তিনি বোড়ালের রাস্তা নির্মাণ, উচ্চ-বিদ্যালয় নির্মাণ, লাইব্রেরি গড়ে তোলা প্রভৃতি জনহিতকর কাজের সংগে অংগাংগিভাবে যুক্ত ছিলেন, সাহায্য দিয়েছিলেন প্রভূত অর্থ। বোড়ালে অবস্থিত ২৪ পরগনার অন্যতম প্রাচীন লাইব্রেরিটি (বোড়াল প্রিয়নাথ লাইব্রেরি) তাঁরই নামাঙ্কিত।

স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘোরার পর ষাটের দশকের শেষ পর্যন্ত লাইব্রেরিটি রাজনারায়ণ স্মৃতি মন্দিরেই ছিল। এরপর সত্তরের দশকে গ্রামের 'অশোক কুমার দে মাস্তের পাড়ার গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে লাইব্রেরিকে কিছু জমি দান করলে গ্রামের মানুষের আর্থিক সাহায্যে সেখানেই গড়ে ওঠে লাইব্রেরির নিজস্ব বাড়ি। ১৯৭৩ খৃস্টাব্দের ২০ এপ্রিল এই বাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ডঃ রমা চৌধুরীর উপস্থিতিতে পশ্চিমবংগের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৭৬ খৃস্টাব্দের ২৫ মে এই বাড়ির দ্বারোদ্ঘাটন করেন সংসদ সদস্য প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির উপস্থিতিতে পশ্চিমবংগের তৎকালীন পূর্তমন্ত্রী ভোলানাথ সেন। এই শতবার্ষিকী ভবনটির দোতলার নির্মাণ প্রায় শেষের পথে।

লাইব্রেরির সভাপতি রামরতন ভট্টাচার্য ও সম্পাদক গোপীবল্লভ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে জানা গেল, লাইব্রেরির এই দোতলা বাড়ি তৈরিতে গ্রামের মানুষের আর্থিক সাহায্য ছাড়াও গ্রামের বাইরের বেশ কিছু ব্যক্তিও অর্থসাহায্য দেন। অর্থসাহায্য দেন ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি, সংসদ সদস্য প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সিও। স্থানীয় ইঁট ভাটার মালিকেরা সাহায্য করেছেন বহু ইঁট দিয়ে। গত ১৯৮৬-র বইমেলায়

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর হাত থেকে সরকারি এককালীন অনুদান হিসাবে ১০ হাজার টাকার চেক গ্রহণ করেন সম্পাদক।

১৮৭১ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা হওয়া লাইব্রেরি শতবর্ষ পরে তার নিজের বাড়িতে উঠে আসে। সৎ কাজ দেরিতে হলেও একদিন সফল হয়। সভাপতি, সম্পাদক এবং গ্রন্থাগারিকত্রয় প্রত্যেকেই আশা রাখেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এভাবেই একদিন সার্থক হয়ে উঠবে।

উনিশ শতকের দুই মনীষীর স্মৃতিরক্ষার কাজ এভাবেই চলছে কলকাতার দক্ষিণের গড়িয়া থেকে ২ কিমি ভেতরের সুপ্রাচীন বোড়াল গ্রামে। □

গৌতম মুখার্জি

গত তিরিশ বছরে এখানে ডাইনি বলে কাউকে সন্দেহ করা হয়নি

গিরিজোড় একটা সাঁওতাল পল্লী। বিহার সংলগ্ন বীরভূম জেলার শেষ প্রান্তে অবস্থিত। মাত্র তিনশো ঘরের বসতি। লোক সংখ্যা হাজার ছুঁই ছুঁই।

গিরিজোড়ের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোও সাঁওতাল গ্রাম। গিরিজোড় তাদের মধ্যমণি।

১৯৫২ সালে বিধানচন্দ্র রায় আদিবাসী উন্নয়নের জন্যে গিরিজোড়ে স্কুল, হেলথ-সেন্টার তৈরি করেন।

দীর্ঘ ব্যবধানেও আশানুরূপ উন্নতি নেই। সিউড়ি থেকে ২৫ কিমি দূরে গ্রামটির অবস্থান বাসস্ট্যান্ড থেকে সাত কিমি সম্পূর্ণ যোগাযোগশূন্য। সাত কিমির ব্যবধান হয় হেঁটে, না হয় সাইকেলে অথবা সাইকেল রিকশায় পৌঁছতে হয়। এখনও কাঁচা রাস্তা। কাঁকুরে মাটি তাই রক্ষে। নইলে বর্ষায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার সম্ভাবনাই বেশি।

বিধু হাঁসদা গিরিজোড়ের বয়স্ক মানুষ। গাছের নিচে খাটিয়ায় শুয়ে ছিলেন। খইনি টিপতে টিপতে বললেন – বিধান রায়ের স্বপ্ন সফল হয়নি। মনে পড়ে সেদিনের কথা, অনেক আশা-ভরসার কথা তিনি শুনিয়েছিলেন। সবটাই ব্যর্থ।

জানতে চাইলাম কেন এমন হল?

ধীর কণ্ঠে বললেন – হাসপাতাল তৈরি হল, ডাক্তার এল না। সাঁওতাল পল্লীতে তারা থাকতে পারে না। যারা আসে, ৩/৪ মাস পরেই পালায়, শূন্য হাসপাতাল খাঁ খাঁ করে। কম্পাউন্ডার হাসপাতালের ডাক্তার সেজে চেয়ারে বসে। নগদ পয়সার ওষুধ বিক্রি শুরু করে।

কোন উন্নতি হয়নি গিরিজোড়ের। পূর্বের অবস্থা আজও বিদ্যমান।

এরা আগের মতই আজও সরল। অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যস্ত। মারাং বুরু এদের বড় দেবতা। দেবাদিদেব শিবের সংগে কতকটা মিল আছে যেন।



ফটো : সিরাজুল মনির

গিরিজোড়ের উৎসবে

জিজ্ঞাসা করলাম বিধু হাঁসদাকে – আপনারা মদ খান কেন?

সংগে সংগে তিনি জবাব দিলেন – দিকু (বাঙালি) বাবুরাও এখন মদ খাচ্ছে।

তাঁরাও ভুল করছেন, তবে আপনারা মদ না খেলে, আপনাদের আর্থিক দুরবস্থা থাকত না। আপনাদের সামাজিক শাসন আছে, আপনারা মদ খাওয়া বন্ধ করে দিন।

বিধু হাঁসদা বললেন, মদ আমাদের প্রাণ। মদ খাওয়া বন্ধ করব না।

জানতে চাইলাম, কেন?

– আমাদের আদিপুরুষ, পিলচু বুড়ি আর পিলচু হাঁড়ায় মদ খেয়ে দাম্পত্য জীবন শুরু করেছিলেন। মদ না খেলে সংসারের উৎপাদন হত না। মদ বড় পবিত্র। পুজো পার্বণ, বিয়ে, সকল রকম উৎসব ছাড়াও মৃতের সৎকারের জন্যে মদ একান্ত অপরিহার্য।

ইজিকেল হাঁসদা এই স্কুলের আদি শিক্ষক। জানতে চাইলাম, গ্রামের কতগুলো ছেলে মাধ্যমিক পাস করেছে?

সংগে সংগে জবাব দিলেন –এগার জন। এদের মধ্যে তিনজন মিলিটারিতে, চারজন প্রাইমারি স্কুলে, দুজন পোস্ট অফিসে, দুজন বনবিভাগের ড্রাইভার। পাস করেনি, সপ্তম অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে সাঁওতাল ছেলেমেয়ে প্রচুরআছে। স্কুলটা কোন কাজে লাগেনি তা নয়, অনুপাতে কম।

সিধু হাঁসদা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। গিরিজোড় হাইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের গ্রামে ডাইনি প্রথা আছে?

শুনে হাসলেন আপন মনে। ধীর কণ্ঠে বললেন – ডাইনির ব্যাপারটা আমাদের সমাজে একটা মস্ত বড় কুসংস্কার। ছেলেবেলায় শুনেছি, আমাদের গাঁয়ের এক বুড়িকে তার ছেলে ডাইনি বলে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছিল।

এখনও এ বিশ্বাস টিকে আছে?

–আদিবাসী সমাজে ডাইনি আছে। ভূতপ্রেত, তুক-তাকে আজও এরা বিশ্বাসী। তবে আমাদের গ্রামে ডাইনির ধারণা দূর করে দিয়েছি। শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়ার সংগে সংগে অন্ধকার কাটছে।

ডাইনি সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?

– কিছু ধান্দাবাজ স্বার্থপর মানুষ বিশেষ উদ্দেশ্যে মেয়েদের ডাইনি সাজায়। এটা ধারণা নয়, এটাই ঘটনা। আমি গর্বের সংগে বলতে পারি, গত তিরিশ বছরে এখানে ডাইনি বলে কাউকে সন্দেহ করা হয়নি। শিক্ষার আলোর সংগে সংগে ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হচ্ছে এ বিশ্বাস।

গিরিজোড় হাইস্কুলের হেড মাস্টার রহিম সাহেব, বয়স ৪০/৪২, রং ময়লা, স্বাস্থ্য একহারা, সদা-আলাপী, শান্ত কণ্ঠে বললেন, শিক্ষার প্রতি আদিবাসীদের আগ্রহ বাড়ছে।

রহিম সাহেব আরও বললেন – আগ্রহী ছেলেমেয়েদের হস্টেলে রাখার ব্যবস্থা করেছি। সব ফ্রি। খরচ সরকারের। আমরা কোচিং-এ ফ্রি সার্ভিস দিচ্ছি।

জানতে চাইলাম – এখন স্কুলে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত।

নির্বিবাদে বললেন, ফিফটি-ফিফটি।

গ্রামে কোন বেকার আছে কিনা জানতে চাওয়ার সংগে সংগে মিষ্টি করে বললেন এটাই মজার ব্যাপার, এ গ্রামে কোন বেকার নেই। থাকবে কীকরে? পরিশ্রম এদের জীবন, কেউ অলস জীবন কাটায় না। যারা পাস করেছে, তারা চাকরি পেয়েছে। বাকিরা পার্শ্ববর্তী স্টোন কোয়ারিতে কাজ করে।

এ গাঁয়ের মেয়েদের দেহে এখন শায়া, শাড়ি, ব্লাউজ উঠেছে। তবে অনেকেই এখনও স্বাস্থ্যবিধি পালনে অজ্ঞ।

গাঁয়ের সকলেই যেন এক পরিবারের মানুষ। কেউ পর নয়। সকলের তরে সকলে ওরা। বিয়ের উৎসব মানে গ্রামের উৎসব। সকলের সাদর নিমন্ত্রণ। কেউ অনাহূত নয় এখানে।

বাবর আলি মোল্লা, এম এ পাস, গিরিজোড় হাইস্কুলের পুরনো-শিক্ষক, আদিবাসীর সংগে তাঁর নাড়ির যোগ। তিনি বললেন – সব চেয়ে মজার ব্যাপার গিরিজোড়ে কোন ভিখিরি নেই। ভিক্ষের জীবন এদের কাছে ভীষণ ঘৃণ্য।

মূলত অধিকাংশ মানুষই গরিব। কিন্তু দৈহিক পরিশ্রমের বিনিময়ে রোজগার করতে এরা অভ্যস্ত।

নাচগান এদের প্রাণ, পুজো-পার্বণ থেকে শুরু করে ছোটখাটো অনুষ্ঠানেও মেয়েরা দল বেঁধে হাত ধরাধরি করে নাচে। ছেলেরা মাদল বাজায়, ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি সবাই এক আসরে নেমে পড়ে।

সুরেন হাঁসদা, বয়স প্রায় সত্তরের ঘরে, নিজের তৈরি বেহালা নিয়ে গান শোনাতে শুরু করলেন। ভারি মিষ্টি সুর।

সুরেন হাঁসদার বাজনার রেশ কানে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। □

এ মান্নাফ

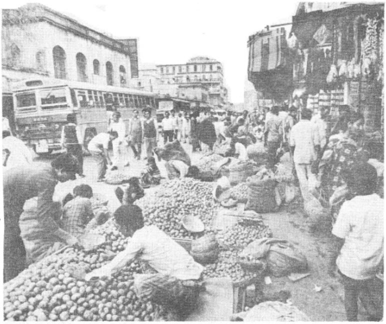
কলকাতার ফুটপাত পথচারীদের পা থেকে ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যাচ্ছে

কলকাতার ফুটপাত বোধহয় কলকাতা কর্পোরেশনের। আইনমোতাবেক তারাই কর্তৃপক্ষ হলেও আসল খবরটা হল এই যে ফুটপাত বেহাত হয়ে গেছে বহুকাল আগেই। আজ আর কর্পোরেশন ফুটপাতের ওপর দাঁড়িয়ে নিজের জমিজমা দেখাশোনা করার সুযোগই পাবেন না বোধহয়।

ফুটপাতে দাঁড়াবার জায়গা কোথায়? গায়ে গা লাগিয়ে হাঁটার রাস্তা কোথায়? সকলকে কাঁচকলা দেখিয়ে ফুটপাত এখন জবরদখল কলোনি। দাবিদার হিসেবে আপনি হয়তো কাঁচুমাচু পথচারী বুকে একটু বল এনে রাজনৈতিক বক্তার মত বললেন – 'ফুটপাত হল পায়ে হাঁটা মানুষের জন্য। ফুটপাত আমার'।

বলা শেষ হবে না। কোথা থেকে আপনার চারপাশে হ্যা হ্যা, হো হো, হি হি করে খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠবে অদ্ভুত সব মানুষ। ফুলপ্যান্ট গুটিয়ে, গেঞ্জি পরে, লুঙ্গি তুলে তেড়ে আসবে যারা, ওরা হকার। হাতাখুন্তি হাঁড়িকুড়ি নিয়ে তেড়ে আসবে যারা ওরা ফুটপাতের গেরস্ত, বেলচা কোদাল শাবল গাঁইতি নিয়ে রুখে আসবে যারা ওরা খালাসি, গায়ে পৈতে, পরনে গেরুয়া পরে ভক্তসমেত খেঁকিয়ে আসবেন যিনি তিনি শনিঠাকুরের পূজারী, 'আবে ঘর যা' বলে যারা সম্মিলিতভাবে আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ওরা রকবাজ, ফুটপাতের মধ্যিখানে ওরা ক্যারাম খেলে, ক্রিকেট ব্যাডমিন্টন, এছাড়া রয়েছে আরো অনেক মানুষ – ভিখিরি, মাতাল, পাগল, ভবঘুরে, ফুটপাতের চিত্রশিল্পী। এরা সকলে মিলে আপনার ঘাড় ধরে আপনাকে রাস্তায় নামিয়ে দেবে আর আপনি এই লজ্জা দুঃখ আর অপমান হজম করার আগেই আপনাকে চেপ্টে দিয়ে চলে যাবে কলকাতার যানবাহন – ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টের সংগে যাদের মধুর সম্পর্ক।

আপনি হয়তো মরবেন না, সকলের ভাগ্য কি এত ভাল হয় যে হঠাৎই মরে যাবে! তবে যতদিন বাঁচবেন, ততদিন কিন্তু ভুলেও ঐ ফুটপাতে হাঁটার অধিকার দাবি করবেন না। ফুটপাতের মালিক আপনি নন, আপনি তো আর ঘুষদাতা, মস্তান অথবা শরণার্থী নন, পথচারীদের তো কোন অ্যাসোসিয়েশন নেই। আপনার হয়ে লড়বে কে? আর তাছাড়া ফুটপাতের দাবিদারদের যাঁরা দাদা (অধিকাংশই যুব নেতা) তাঁরা অধিকাংশই ওদের অধিকার পাইয়ে দেবার জন্য যত্নশীল, ওপরওয়ালাদের সংগে ওঁদের রীতিমত মুখ শোঁকাশুঁকি। আপনি মশাই ছাপোষা পায়ে হাঁটা লোক, হাঁটতে পারলেই হল, তা আবার ফুটপাতের বায়না কেন?



ফটো : পাহাড়ী রায়চৌধুরী

অনায়াস বাজারের রূপ

এছাড়া আছে উটকো অশান্তি।

কিছুক্ষণ বাদে বাদেই পাবেন ফুটপাত জুড়ে লাইন। কেরোসিন, গ্যাস, হরিণঘাটার দুধ, মাদার ডেয়ারির দুধ, মাদারির খেল দেখার ভিড়, সিনেমার লাইন, ভিড় পেটের অসুখ-সারানোওলাকে ঘিরে উৎসুক জনতা, জলের কল ঘিরে তৃষ্ণার্ত মানুষের ভিড়, খোঁড়াখুঁড়ির খানাখন্দ, আরো হাজার বাধা। পথে আপনাকে নামতেই হবে। ইদানীং আবার ফুটপাতেই ইটবালি চুন সুরকির গোলা – বহুতল বিশিষ্ট আবাসন প্রকল্পের জন্য ফুটপাতেই অস্থায়ী গোলা। আপনি এদের কেউ নন, আপনি, একটা ফালতু মানুষ, ফুটপাতের জন্য আপনার হ্যাংলামি দেখে এরা করুণা বোধ করে হয়তো কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হয় না।

আপনি কি শ্যামবাজারে থাকেন? না থাকলেও আপত্তি নেই। কেন না শ্যামবাজারে আপনাকে যেতেই হয়। মনে করুন আপনি আর আমি দুই পথচারী পথ হাঁটছি। অবশ্যই বিধান সরণীর ট্রাম লাইনের গা ঘেঁষে। দুপাশে তাকান, দেখবেন সার সার সব ছাউনি। বড় বড় স্থায়ী দোকানগুলোর মধ্যে ফুটপাত এক হাত চওড়া। তারপর অস্থায়ী দোকানের সার সার ছাউনি। আর তারপর মূল রাস্তা শুরুর আগেই আবার রাস্তার ওপর ঢল নেমেছে দোকানের। এই ত্রিস্তর বিশিষ্ট কাঠামো চলবে ওয়েলিংটনের আগে পর্যন্ত। কোথাও ঘন বুনোট, কোথাও বা একটু হাঁফ ছাড়ার জন্য ফাঁকা অবকাশ। ওখানে যে কোনকালে ফুটপাত

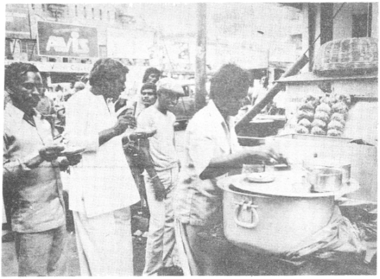
বলে কিছু ছিল তা রীতিমত গবেষণার বিষয়। তাও ধরুন, আমরা ঐ এক হাতের অধিকার ছাড়তে নারাজ। তাহলে কী কী অসুবিধে আপনাকে আমাকে পোয়াতে হবে তা দেখা যাক।

আপনাকে বাজারের পাগলা ষাঁড় হতে হবে। টুঁসিয়ে, গুঁতিয়ে, ঘাড় ঝুঁকিয়ে বেঁকিয়ে আপনাকে পথ করে নিতে হবে। কখনো আপনাকে দুহাতে সায়া, ব্লাউজ, শাড়ি, ফ্রক সরাতে হবে, স্টিল কিংবা অ্যালুমিনিয়ামের ঝুলন্ত জিনিসপত্রের গুঁতো থেকে মাথা বাঁচাতে হবে, যখন তখন ঝুঁকেপড়া তেরপল কিংবা বাঁশের খুঁটিগুলোর হাত থেকে বাঁচতে হবে, মাথার ওপরে ঝুলবে নানা জাতের ব্যাগ – আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে। এছাড়া রয়েছে কোল্ড ড্রিংকসের ক্রেটগুলো, পান-বিড়ি সিগারেটের দোকানের সামনে নেশাগ্রস্ত মানুষের ভিড়।

বড় বড় দোকানগুলো এমনিতেই নানান সমস্যায় ভুগছে। কেননা সামনের দোকানগুলো ওদের ডিস্প্লেতে বাধা দিচ্ছে। তাই তাঁরাও কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের জিনিসপত্রকে প্রচারের জন্য ঐ এক হাতের মুক্তাঞ্চলে ঠেলে দিচ্ছেন। তবু যা হোক ফাঁক ফোঁকর গলে হয়তো এগোতে পারা যায় কিন্তু গোদের ওপর বিষফোঁড়া – আপনাকে ধরে, প্রতি এক হাত অন্তরই টানাটানি হবে। সে আদর সহ্য করা দুরূহ। এই চলবে কলেজ স্ট্রিট জংশন পর্যন্ত।

তারপরই বই আর বই। সেখানেও ঐ একই ব্যাপার। তবে ওখানে এতটা হাঁসফাঁসের ব্যাপার নেই। তবে ফুটপাতে ওঁদেরও মৌরসিপাট্টা।

বড়বাজার চেনেন তো? চিৎপুর? সেখানে বাঙালিরা পরবাসী। ঐ বিপজ্জনক, মেজাজি এলাকায় ফুটপাত বলে কিছু নেই। ওখানে রামরাজত্ব চলছে। যাকে বলে মুক্তাঞ্চল। গঠন আর আকৃতির দিক থেকে সবই ঐ একইরকম। তবে ওখানকার বিশেষত্বই আলাদা। চক্ষুলজ্জার সামান্যতম আভাস ওখানে পাবেন না। ফুটপাতে বসে হোটেলের মধ্যাহ্নভোজনের তরকারি কাটাকুটি চলছে। সার সার মানুষ আটার রুটি খাচ্ছে লংকা দেওয়া লাল তরকারি সহযোগে। ছোট ছোট অস্থায়ী দোকানপাট, লোহার রড বেরোচ্ছে হুসহাস করে। অন্যমনস্ক হলেই বিপদ। আপনি হয়তো বিচিত্র দোকানের শ্রেণীবিভাগ করার চেষ্টা করবেন। পারবেন না। কিছুতেই তা সম্ভব হবে না। ফুটপাত জুড়ে মানুষ অর্থনৈতিক রুজি-রোজগারের ধান্দায় ব্যস্ত। আপনার পায়ে হাঁটা পথে ফুটপাতের ওপর আপনি অনেক স্কুটার মোটর বাইকের পার্কিং দেখতে পাবেন। বড় বড় গাড়ি? তাও পেয়ে যাবেন দু'চারটে। খৈনি, ভুজাওয়ালা আর বইপত্র ম্যাগাজিনের স্টলও পাবেন অসংখ্য।


ফটো : সলিল রায়

রসনার তৃপ্তিস্থল

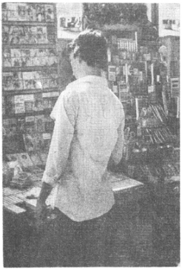


ব্যাগের পসরায় প্রসারিত

উত্তর কলকাতার টালা থেকে দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ পর্যন্ত ঐ একই ব্যাপার। উত্তর কলকাতার লোক বাজার হাট করেন শ্যামবাজার অথবা বড়বাজারে। আর দক্ষিণ কলকাতার মানুষের কাছে গড়িয়াহাট। অতএব সেখানেও ফুটপাত বেদখল, অস্থায়ী ছাউনি, সার সার দোকানপাট, ফুটপাতে ঢালাও ব্যবসা বাণিজ্য। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হলে পাবেন চায়ের স্টল, ফুচকাওয়ালা, সেলুন। ইচ্ছে হলে দেয়ালের গায়ে ঝোলানো আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে দাড়ি কামিয়ে নিতে পারেন। ওয়েলিংটন ধরে সিধে চলে আসুন ধর্মতলায়। তারপর বাঁদিকে ঘেঁষে একেবারে লিন্ডসে। কোথাও আপনাকে শান্তিতে পথ হাঁটতে দেবে না। আপনি শেষ পর্যন্ত প্রধান রাস্তায় গাড়ির বিপজ্জনক রেঞ্জে চলে আসবেন। কলকাতায় এমনিতেই রাস্তা কম। যাও বা আছে তার দুপাশে সংকীর্ণ ফুটপাত। মেট্রোরেল আর বিভিন্ন সংস্থা সেগুলোকে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফর্দাফাঁই করে রেখেছে।

তবে ফুটপাতের দাবিদারদের বড়

শরিকদের কথাও জানা দরকার। ওরা গৃহহীন, না খেতে পাওয়া মানুষের দল। না খেতে পাওয়ার লেবেল জড়ানো আছে যদিও তবুও এখন আর সে দিনকাল নেই। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কিংবা শহর কলকাতার রুজি-রোজগারের আশায় এইসব ছিন্নমূল পরিবার অনেকদিন ধরেই কলকাতায় রয়েছে। আপনার আমার চেয়ে ওরা অনেক বেশি সুখী। ওদের বাচ্চাদের মলমূত্র ত্যাগের জন্য ফুটপাত রয়েছে। তারই মধ্যে ইঁটের উনুনে রান্না চেপেছে। কাঁথা সেলাই চলেছে, বেতের কাজ, রুটি শুকোনো, পাঁপড় তৈরি এবং রোদ্দুরে মেলে দেওয়া, গল্পগুজব, কোমর বেঁধে ঝগড়া, দাম্পত্য প্রেম, মায় বাচ্চা বিয়োনো পর্যন্ত। ফুটপাতের নিশ্চিন্ত আশ্রয়, ঝুপড়ির নিচে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম, ট্যাক্সহীন, দায়দায়িত্বহীন নিরাপদ জীবনযাত্রা। ফুটপাতেরও আবার এরিয়া ভাগ করা আছে। এক একটা পরিবার এককভাবে ছোট ছোট প্লটে বাস করছে। সীমানা দখল করে ওরা মাথা গোঁজার আশ্রয়টুকু করে নিয়েছে। ওদের দিক থেকে তাই কলকাতার ফুটপাত **অনেকটাই এখন জবর দখল কলোনি।**



ফটো : অরিন্দম রায়

তথাকথিত বিদেশি পণ্যের দোকান

তাই বলে ভাববেন না যে কলকাতার সব ফুটপাতই বেদখল হয়ে গেছে! উত্তর কলকাতার ওপরই চাপটা বেশি পড়েছে। দক্ষিণ কলকাতায় রয়েছে অভিজাত ফুটপাত যেখানে নিশ্চিন্ত মনে এখনো হেঁটে চলা সম্ভব। ল্যান্সডাউন, সাদার্ন অ্যাভেনিউ, একডালিয়া, পাম অ্যাভেনিউ, রাসবিহারী অ্যাভেনিউ (এখানকার সর্বত্র এমন নয় কিন্তু), গোলপার্ক, ঢাকুরিয়া, যোধপুর পার্ক, হিন্দুস্থান পার্ক, নিউ আলিপুর, এবং আরো এমন কিছু জায়গায় ফুটপাত পড়ে আছে আপন খেয়ালে। ওখানে হাঁটাপথে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারবেন। তবে সমস্যাটা হল এখানেই যে ওখান দিয়ে বেড়াবার অবকাশ আপনার নেই। আপনাকে তো শেয়ালদা, হাওড়া, ডালহৌসি, ধর্মতলা করে বেড়াতে হয়। হাওয়া খাবার সময় কোথায় আপনার? যেখানে আপনার হাঁটাপথে কাজ আর পথ চলার আনন্দ আপনি একই সংগে পেতে চান সেখানেই ফুটপাত আপনার জন্য বন্ধ।

আর আছে এসপ্ল্যানেডের খোলামেলা চত্বর। রাজকীয় ফুটপাত। পার্ক স্ট্রিট, ক্যামাক স্ট্রিট, রেনিপার্ক, ক্যাসুরিনা অ্যাভেনিউ (এখানে অবশ্য ময়দান, রাস্তার দুপাশে গাছের সারি, ঠান্ডা), আউট্রাম রোড, আরও এমনতর। এসব ভি আই পি-দের জন্য। ওঁরা তো আর ফুটপাতে হাঁটেন না, খোলামেলা ফুটপাতের মাঝখান দিয়ে ধীর গতিতে গাড়ির কাঁচ তুলে শোভা দেখেন। এখানে হকার নেই, বিনা ভাড়ার পরিবারের সংখ্যাও কম, রাস্তা জুড়ে চ্যাংড়া ছেলেপুলেদের ক্যারাম খেলা, আড্ডা দেওয়া নেই। মুস্কিল এখানেই যে এইসব 'অলৌকিক ফুটপাত ধরে হেঁটে বেড়ানোর সময় আমাদের অনেকেরই নেই। অতএব এরা ফুটপাত গোষ্ঠীতে কুলীন এবং স্বভাবতই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

তা প্রশ্ন হল, কার দোষে, কার গাফিলতিতে গরিব পথচারীর ফুটপাতের অধিকার চলে গেল? আমাদের গরিব দেশে, এই নেই দেশের মানুষের একটু হেঁটে বেড়ানোর নিরাপদ জমি কারা দানছত্তর করে দিল এবং কোন অধিকারে? আর পাঁচটা প্রশ্নের উত্তরে যেমন কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে এক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই তার ব্যতিক্রম হবে না। এই যে এত দোকানদার, এত বেওয়ারিশ পরিবার ফুটপাতের ওপর দিব্যি আসর জাঁকিয়ে বসেছে তা কোন সাহসে?

এর একটা সর্বজনীন সহজ উত্তর অবশ্য আছে এবং তা হল এখানে জোর যার মুলুক তার। তবু, জোরটা এল কোথা থেকে? এরও উত্তর আছে। খুঁটির জোরে ম্যাড়া লড়ে। খুঁটিটা কে? নিঃসন্দেহে কর্পোরেশন। আর এ বিষয়ে হকার্স অ্যাসোসিয়েশনের খোঁজ খবর করে জানতে পেরেছি যে সরকারি পক্ষের এক প্রভাবশালী শরীক দল এই অ্যাসোসিয়েশনের হর্তাকর্তা। এদের ট্রেড লাইসেন্স আছে। ট্রেড লাইসেন্স থাকা মানেই সরকারিভাবে ফুটপাতে মৌরসিপাট্টা জমানোর ব্যবস্থা পাকা। লাইসেন্স যে সবার আছে তা নয় তবে কোন না কোনভাবে এদের অধিকাংশরাই অলিখিত লাইসেন্সের ব্যবস্থা করে নিতে পেরেছে। জনহিতকর কাজ করতে গেলে কর্পোরেশনের কিছু আয় থাকা দরকার। ট্যাক্স থেকেই আয়ের অনেকটা আসে। এক্ষেত্রে ফুটপাত দখল করে বা ব্যবহার করতে দিয়ে তা বাবদ যে আয় তার কতটুকুর মুখ কর্পোরেশন দেখতে পায়? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টাকা মাঝ রাস্তাতেই লুটপাট। দালালি খাবার লোকের অভাব নেই। দাদা-ভজার দল তো কর্পোরেশনকে কিছু দেওয়ার প্রশ্নে যায়ই না। সেখানে দাদারাই তোলা তোলে। রাজনৈতিক দল, অ্যাসোসিয়েশন, বাজার সমিতি ইত্যাদিরাই এখন তাই ফুটপাতের ভোগদখল করছে। এলাকার মস্তানরা ফুটপাত জমা নিয়েছে। চড়া সেলামি দিয়ে কাঠের গুমটি করে লোক বসাবার দায়-দায়িত্ব এখন তাদেরই।

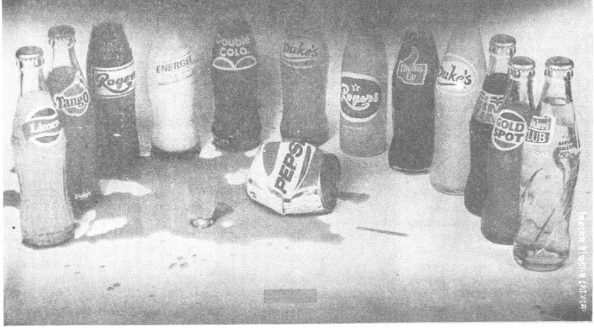
কীভাবে পেলেন দোকান করার সুযোগ? কীভাবে ফুটপাত আগলে জাঁকিয়ে বসলেন? এ ধরনের নানান প্রশ্নের উত্তর সংশ্লিষ্ট দোকানদার অনেক ক্ষেত্রে মুখ খুলতে চায়নি, অনেকের উত্তর ভাসাভাসা, অনেকে আবার সরাসরি অ্যাসোসিয়েশনকে সাক্ষ্য মেনেছে, আবার কেউ বা কর্পোরেশনের ট্যাক্সদাতা বলে দাবি করেছে। ঘটনা যাই হোক, নাগরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের দায় নিয়ে যাঁরা ক্ষমতার শীর্ষে বসে আছেন তাঁদের এই উদাসীনতা ও বৈরাগ্যে মাঝে মাঝে বড় ক্রোধ হয়।

এদেশে মাঝে মাঝে হকার উচ্ছেদ হয়, বেআইনি ঝুপড়ি, ফুটপাতের মন্দিরও। তবে তা ফাঁকা হয় কয়েকদিনের জন্য। আবার যে-কে-সেই। আসলে আইন যেমন আছে, আইনের ফাঁকও আছে। যারা ফুটপাত দখল করে আছে তারা ফাঁকফোকরের সুলুকসন্ধানটা জানে। আর প্রতিটি ফুটপাত জুড়ে আছেন শনিঠাকুর। তাঁর কোপদৃষ্টি পথচারীদের ওপর। কেননা ওরা হাঁটতে চাইলে যে তাঁর থাকা হয় না। □

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

পেপসি ঃ ঠান্ডা পানীয়, না রাজনৈতিক সুরা ?

যুক্তি-তর্কের নানা তথ্য-শৈলী, আলোচনা-সমালোচনা, নিন্দা-বন্দনা – সব কিছুর প্রস্তর-বাধা কাটিয়ে এক রকম রাজার মতই 'পেপসি' ভারতে রাজত্ব করার অনুমতি পেয়েছে। এই অনুমতি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার। পেপসি'র বিরুদ্ধে হাজার অভিযোগের অন্যতম হল, চিলিতে আলেন্দে সরকারের পতনের নেপথ্যে এই বহুজাতিক কোম্পানির গোপন হাত। ওই হাতের রং কৃষ্ণ কি গৌর, তা নিয়ে এখনও রয়েছে বিপুল বিতর্ক। ভারতে এই সংস্থার আগমন ভারতবাসীর জন্য অভিশাপ,না আশীর্বাদ তা এখনই বলা যাবে না। তবে এই পেপসি ঠান্ডা পানীয় নিয়ে আমাদের জাতীয় রাজনীতিও সমানভাবে চঞ্চল। কারো কারো সংগত জিজ্ঞাসা – ওটা কি ঠান্ডা পানীয়, না রাজনৈতিক সুরা ? আমাদের প্রতিনিধি প্রভাত ঘোষ তাঁর এই বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনে সেই জিজ্ঞাসারই উত্তর খুঁজেছেন। প্রতিবেদনটি রচিত হয়েছে সাংবাদিক সুদীপ মজুমদার (নয়া দিল্লি)-এর সহযোগিতায়।

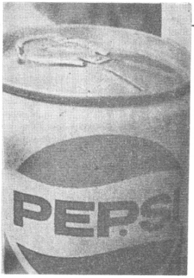


একটা মিষ্টি ঠান্ডা জলের বোতল সারা দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি মায় কিয়দংশে সমাজনীতিকেও কীভাবে একযোগে জড়িয়ে ধুন্ধুমার কান্ড লাগিয়ে দিতে পারে, ইদানিংকালে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ মাত্র ২২ কোটি টাকার পেপসি-কোলা প্রকল্প। ইস্যুর অন্ত নেই। এর মধ্যে রয়েছে ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ, অদূর ভবিষ্যতে এ দেশের খাদ্যাভ্যাস কতটা বদলাতে পারে, জাতীয় কারিগরী কর্মকুশলতার উন্নয়ন কতটা কী হয়েছে বা হতে পারে, এ দেশের বৈদেশিক মুদ্রা সমস্যার সমাধান কোন পথে হতে পারে, বিশ্বের কাছে ভারতের বাজার কতটা লোভনীয়, বহুজাতিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি দেশে দেশে কী কান্ড ঘটিয়ে বেড়ায়, এবং অবশ্যই পাঞ্জাব তথা সারা ভারতের সমস্যা সমাধানের নামে ভোটকুড়ুনি রাজনীতির উৎকর্ষসাধন। এই এতসব ইস্যু এক ধাক্কায় চোখের সামনে এনে ফেলেছে এমনই এক প্রকল্প যাতে খুবই অকিঞ্চিৎকর পরিমাণের মূলধন বিনিয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ আরও পরিষ্কার করে বললে, সারা দেশে প্রতি বছর ব্যবসা ক্ষেত্রে যত টাকা বিনিয়োগ করা হয়, পেপসি প্রকল্পের ২২ কোটি টাকা ১ শতাংশেরও সামান্য ভগ্নাংশ স্থান অধিকার করে রয়েছে। অথচ এই নিয়েই যত গোল।

গত চার বছর ধরেই গোল চলছিল। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তা বাড়া কমার রেওয়াজও মেনে চলেছে। কিন্তু সেপ্টেম্বরের গোড়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে রাজীব গান্ধীর পাঞ্জাব সফরের ঘোষণার সংগেই পেপসি বিতর্ক আবার জোর পায়। গত ফেব্রুয়ারিতে পেপসি প্রথম আশার আলো দেখে যখন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রজেক্টস অ্যাপ্রুভাল বোর্ড তাদের ভারতে ঢোকার অনুমতি দেয়। তারপরেও ফাঁড়া ছিল। সেটা কেটে গেল এই সেদিন, ১৯ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনীতি বিষয়ক কমিটি (ক্যাবিনেট কমিটি অন ইকনমিক অ্যাফেয়ার্স বা সি সি ই এ) ওই প্রকল্প চূড়ান্তভাবে মঞ্জুর করে। তার দুদিন পর প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী পাঞ্জাব সফরে গিয়ে এই 'খুশখবর' শোনালেন।

মাঝে অবশ্য পঞ্চনদীর জল বিস্তর গড়িয়ে গেছে। পেপসি নিয়ে সরকারি মহলে তর্কবিতর্কের ঝড় যেমন বয়ে গেছে (কংগ্রেস (ই) নেতৃত্বের রক্তচক্ষু সত্ত্বেও) তেমনি বিরোধীপক্ষও ছিল সোচ্চার। তবে অবিরাম লড়াই চালিয়ে গেছেন বা এখনও যাচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি, যিনি পেপসিকে ভয় পাচ্ছেন নানা কারণে। তার প্রধানতম হল ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এদেশে সফট ড্রিংকের বাজার এককথায় যার হাতের মুঠোয় সেই পার্লে কোম্পানির চেয়ারম্যান রমেশ চৌহান প্রথমাবধিই পেপসির ভারতে ঢোকার বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধ করে চলেছেন।

সংসদে এই প্রকল্প নিয়ে বিরামহীন বিতর্ক চলেছিল। ৫০ জন এম পি এর বিরুদ্ধে এক স্মারকলিপিতে সই করলেন, তো আর ৫০ জন প্রকল্পের সমর্থনে আর একটি স্মারকলিপি দিলেন। এর মধ্যে কংগ্রেস-অকংগ্রেস সবাই-ই ছিল। এছাড়াও ছিল এই বিষয়ের জন্য তৈরি ফুল হাফ সর্বস্তরের মন্ত্রীকে নিয়ে কমিটি-উপকমিটির



বৈঠকের পর বৈঠক। একথা বলা অন্যায় হবে না, অন্তত রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান কংগ্রেস (ই) যেহেতু তাঁর নির্দেশ ছাড়া এক পাও নড়েনা, তাই এই বিতর্কে সরকারি দলের বেশ কয়েকজন প্রথম সারির নেতা যখন এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন, তাঁদের পেছনে দল-সভাপতি রাজীবের প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল। নাহলে কারোর ঘাড়ে দুটো মাথা নেই যে স্বয়ম্ভূ হয়ে প্রধানমন্ত্রী রাজীবের বিরুদ্ধাচরণ করেন। আসলে এইরকম বিতর্ক তুলে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন অংশের নাড়ি বোঝার চেষ্টা করেছিলেন।

এছাড়াও ছিল বোম্বাই আর কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের করা মামলা। সুপ্রিমকোর্টও বাদ যায়নি। শেষমেশ, বাদ-বিবাদের রূপরঙ্গ দেখেশুনে সাউথ ব্লকের নির্দেশে পেপসি ছাড়পত্র পেল।

প্রকল্পের চেহারাটা দেখা যাক :-

এর জন্য মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ২২.৬ কোটি টাকা। পেপসি একা নয়, আছে দুজন ভারতীয় সহযোগী- পাঞ্জাব অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (পি এ আই সি বা পাইক) এবং টাটা গোষ্ঠীর ভোল্টাস। মালিকানায় শতাংশের হার থাকবে এরকম – পেপসি ৩৯.৮৯%, পাইক ২০% এবং ভোল্টাস ২৪%। এছাড়া বাকি শেয়ার অর্থাৎ ১৬.১১ শতাংশ বাজারে ছাড়া হবে। অতএব ভারতীয় সহযোগীদের হাতেই থাকছে

ভোল্টাসের চেয়ারম্যান এ এইচ টোবাকোওয়ালা : 'কোক' প্রযুক্তিতে আসক্ত



সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ার। কিন্তু কোম্পানি গড়ার টাকা আসবে কী ভাবে? বলা হয়েছে ৫০ শতাংশ টাকা আসবে তিন অংশীদারের কাছ থেকে এবং বাকি অর্ধাংশ নেওয়া হবে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি ঋণদান সংস্থা থেকে।

গত ২৫.৯.৮৮-তে দূরদর্শনের জাতীয় কার্যক্রমের এক অনুষ্ঠানে এই প্রকল্পের তত্ত্বাবধায়ক ফুড প্রসেসিং মন্ত্রকের কর্তা জগদীশ টাইটলার-এর অন্তর্গত বিভিন্ন ডিভিশনের একটা হিসেব দিয়ে বোঝালেন যে ২২.৬ কোটি টাকা এভাবে খরচ হবে। ১.৬ কোটি টাকায় তৈরি হবে কৃষি গবেষণা কেন্দ্র। ৮ কোটি টাকা খরচ করে গড়ে তোলা হবে আলু ও শস্য থেকে খাবার তৈরির ইউনিট। ৭.৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে অন্যান্য শাকসব্জী থেকে খাবার তৈরির ইউনিট এবং ৫.৫ কোটি টাকায় তৈরি হবে নরম পানীয় তৈরির কারখানা।

এই প্রকল্প যাতে ছাড়পত্র পায় তার জন্য অনেক লবিই সরকারের বিভিন্ন স্তরে দৌড়োদৌড়ি করেছিল। এর মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন দেশের একনম্বর শিল্পগোষ্ঠীর প্রধানতম পুরুষ জে আর ডি টাটা। তিনি নিজে ব্যক্তিগত স্তরে প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য ক্যাবিনেট মন্ত্রীর কাছে এই প্রকল্পের হয়ে দরবার করেছিলেন। আবার অন্য দিকে এর সমালোচকরা বলেছেন যে, পেপসিকে ভারতে ঢুকতে দিলে সর্বনাশের অনেক রাস্তাই খুলে যাবে। তার মধ্যে অন্যতম হল, দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার চান্স খুব বেশিরকম থাকবে। যেহেতু পেপসি বিভিন্ন দেশে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিয়া-র হয়ে কাজ করে বলে প্রমাণ আছে, সেহেতু পেপসির সংগে মার্কিন গোয়েন্দাবাহিনীকেও এদেশে ঢোকার রাস্তা পরিষ্কার করে দেওয়া হবে। তাছাড়া পেপসির তৈরি 'আবর্জনা' খাইয়ে দেশের মানুষের স্বাস্থ্যের কোন দিকটা উন্নত হবে?

এরকম লড়াই এই প্রথম যে হচ্ছে তা নয়। বছর দশেক আগে অংশীদারীর ঝামেলা এবং আমদানি-রফতানির নানা আইনি সমস্যায় জড়িয়ে যখন কোকাকোলা কোম্পানি এ দেশ ছেড়ে চলে গেল তখনও এরকম বিতর্ক উঠেছিল। তারপর থেকে বহুদিন আন্তর্জাতিক বণিক সভাগুলো ভারতকে ব্যবসায়িক দিক থেকে খুবই গোলমেলে স্থান হিসেবে বিবেচনা করত। মার্কিন সমাজের একনম্বর প্রতিভূ 'কোক' চলে যাবার পর থেকে গত এক দশকে দেশীয় নরম পানীয় প্রস্তুতকারকরা চুটিয়ে ব্যবসা করে নিজেদের চেহারা চতুর্গুণ ফুলিয়েছে। কিন্তু ফুলোনো চেহারার দেশীয় 'সফট ড্রিংক জায়েন্ট'রা আবার কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়েছে দু নম্বর (মার্কিনী) নরম পানীয়ের উপস্থিতিতে। সত্যি কথা বলতে কি, কোক-এর সে রমরমা আজ আর নেই। একটু আগে পেপসিকে দু-নম্বর বললাম বটে, কিন্তু আসলে ক্রমের দিক থেকে সে দু-নম্বর হলেও ব্যবসার দিকে সে এক নম্বরে। ১৫১টা দেশে ১৫ হাজার 'ভ্রাতৃপ্রতিম' সংস্থার সংগে হাত মিলিয়ে পেপসি তার ব্যবসায়িক জাল ছড়িয়েছে। কোক-এর কাছে এখন যা ঈর্ষনীয়।

স্বদল-বিরোধী দল, দু-পক্ষ থেকেই যেরকম জোরদার সমালোচনা উঠেছে, তার সমস্তটাই

এখনও পর্যন্ত ঘাড়ে নিতে হচ্ছে ফুড প্রসেসিং মন্ত্রী জগদীশ টাইটলার ও সচিব পি মুরারিকে। যদিও পেপসির মত বহুজাতিক মার্কিনী সংস্থাকে ডেকে আনার পেছনে ১৯৮৪-তে ঘোষিত রাজীবের 'মুক্ত অর্থনীতি' দায়ী। যে ঘোষণার পেছনে হাত ছিল বিশ্ব ব্যাংক ও প্রাইভেট সেক্টর ফেরত হোমরাচোমরাদের। তবু এখন কিল হজম করতে হচ্ছে টাইটলারকে।

পেছন ফিরে দেখলে অন্য চিত্র নজরে পড়ে। ১৯৮৫-র প্রথম দিকে 'কিং শার্ক' রমাপ্রসাদ গোয়েংকার মালিকানাধীন অ্যাগ্রো প্রডাক্টস এক্সপোর্টস ইন্ডিয়া (এ পি ই আই) প্রথম পেপসির সংগে এদেশে যৌথ উদ্যোগের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জমা দেয়। কিন্তু তখন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নিয়ন্ত্রণাধীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল, যে সব উন্নত প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধার প্রস্তাব এই যৌথ উদ্যোগ দিয়েছে, সেগুলো ভারতে রয়েইছে। একই সুবিধে আবার নতুন করে বিদেশি পুঁজির মাধ্যমে আনার প্রয়োজন নেই। ওয়াকিবহাল সূত্র অনুযায়ী খাদ্য ও কারিগরী উন্নয়ন দফতর এবং খোদ বাণিজ্য মন্ত্রকও পেপসির প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সে সময় (৮৫-র জুলাই) এ পি ই আই-র জনৈক মুখপাত্র জানিয়েছিলেন, বেশিরভাগ দফতরই পেপসি সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। আবার ওই সময়েই সরকারের একটা মহল থেকে বলা হচ্ছিল পেপসি যে প্রযুক্তি বিদ্যে দিতে চেয়েছে এদেশে তার প্রয়োজন যথেষ্টই রয়েছে। এত সত্ত্বেও প্রস্তাব পাশ হল না।

শেষমেশ রমা গোয়েংকা রণে ভংগ দেন। কিন্তু পেপসি-র মত সংস্থা ছেড়ে দেবার পাত্র যে নয় তার প্রমাণ মিলল ঠিক বছর খানেক বাদে। এবার ভারতীয় সহযোগী হিসেবে গাঁটছড়া বাঁধল পাইক ও ভোল্টাসের সংগে। আগেরবারে পেশ করা প্রস্তাবে নিশ্চয়ই খুঁতটুত ছিল। এবার সেসব ঝেড়েপুঁছে সাফসুতরো হয়ে প্রস্তাব ফেলা হল সরকারি দফতরে। তার ফলে গতবারে যেখানে মোট বিনিয়োগের কথা ছিল মাত্র ২ কোটি টাকার, এবার সেটাই হল দুয়ের পিঠে দুই ২২ কোটি টাকার। লোভনীয়, কিন্তু ততটা নয়। কারণ সারা ভারতে এক বছরে বিনিয়োগ হওয়া পুঁজির কত ভগ্নাংশ স্থান পেপসি-উদ্যোগ দখল করল তার হিসেব আগেই দিয়েছি।

সারা বিশ্ব জুড়েই, বিশেষ করে পশ্চিমী সংবাদ জগতে ভারতে পেপসি-প্রস্তাব বেশ ভালরকমই প্রচার পেয়েছিল। ১৯৭৮-এ কোকাকোলা এদেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর ভারত সরকার বিদেশি পুঁজি সম্পর্কে নিজেদের নীতি পাল্টেছে কিনা, এই ব্যাপারটিই পেপসির ভারতে প্রবেশের পেছনে প্রধান বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছিল পশ্চিমের কাছে। পেপসির পক্ষ থেকেও প্রধানমন্ত্রী রাজীবকে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছিল। '৮৫ সালের জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী যখন আমেরিকা সফরে যান, তখন তিনি যে কটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন তার মধ্যে চারটিতে যোগ দেন পেপসির চেয়ারম্যান। এবং এর মধ্যে অন্তত একটিতে চেয়ারম্যান সাহেব এই প্রস্তাব নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সংগে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ



পার্লে এক্সপোর্টসের কর্ণধার রমেশ চৌহান :

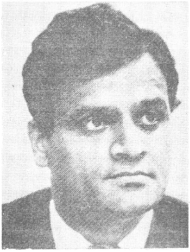
'কোলা' যুদ্ধে অসম প্রতিযোগী

পান। শোনা গেছে, রাজীব নাকি ধৈর্য ধরে চেয়ারম্যানের কথা শোনেন এবং নোটও নেন। কিন্তু তখন কোন কথা দেননি। অতএব দেখা যাচ্ছে প্রস্তাব নাকচ করার পেছনেও ছিলেন রাজীব, এবার তাকে সবুজ সংকেত দেওয়ার পেছনেও রয়েছেন তিনিই। মাঝে শুধু কিছু সময় গেল অনুকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতি নামক কলাটি পাকতে। নচেৎ এ বছরের মার্চে যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের একটি ছোট গোষ্ঠী পেপসি প্রকল্পের কথা তোলেন তখন কেন ক্যাবিনেট স্তর থেকে তাঁদের জানানো হয়েছিল যে, প্রস্তাবটি কুলুংগিতে তুলে রাখা হয়েছে? আসলে, যে সংস্থার বার্ষিক বিক্রির পরিমাণ ৪৬ হাজার কোটি টাকা, তার দেওয়া প্রস্তাব আর যাই হোক কুলুংগিতে ঠাঁই পাবার মত নিশ্চয়ই নয়। প্রস্তাবটি টেবিলেই ছিল, তবে একটু গোপনভাবে, নানা ফাইলের তলায়। সুযোগ বুঝে বার করা হয়েছে।

এই প্রস্তাবের সপক্ষে বিরাট বিরাট আশার কথা শোনানো হয়েছে। যেমন – সবুজ বিপ্লব যা করতে পারেনি এই প্রকল্প ভারতের কৃষিক্ষেত্রে তার চেয়ে অনেক বেশি অগ্রগতি এনে দেবে, তাতে মুনাফার ভাগও থাকবে বিশাল পরিমাণে। এছাড়া এই বিরাট আর্থিক মুনাফার ফলে পাঞ্জাব তথা

পেপসি-কোলার প্রতিনিধি রমেশ ভাগ্গাল :

নরম পানীয়র বোতল নিয়ে যুদ্ধ জয় সম্ভব হল



প্রতিবেশী রাজ্যগুলোও দারুণভাবে উপকৃত হবে। কারণ পেপসির তৈরি ফ্রুট জুসের রপ্তানি ওই রাজ্যগুলির কাছে এক বিরাট আন্তর্জাতিক বাজারের সম্ভাবনা খুলে দেবে। পেপসি যেহেতু খাদ্যশস্যের বড় ক্রেতা সেহেতু চাষবাসের ক্ষেত্রে তার প্রযুক্তি চাষীদের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ হয়ে দেখা দেবে। আবার, এই প্রকল্প পাঞ্জাবের বেকার সমস্যা সমাধান করার কাজে এবং নড়বড়ে আর্থিক বুনিয়াদ শক্তপোক্ত করে তোলার কাজে দারুণভাবে সাহায্য করবে, যার ফলে পাঞ্জাবের উগ্রপন্থী সমস্যাকে প্রায় নির্মূল করে ফেলা সম্ভব হবে। এছাড়া আছে বিদেশি মুদ্রার প্রসংগ। বলা হয়েছে এই প্রকল্পে উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের যে বিশাল রপ্তানির সম্ভাবনা রয়েছে, তাতে ভারতের বিদেশি মুদ্রা-সমস্যা সমাধানের রাস্তা ঝাঁ চকচকে মসৃণ। এবং এসব সম্ভাবনার বিরুদ্ধে কোন প্রশ্ন তুললেই অন্যান্য যুক্তির সংগে দেখিয়ে দেওয়া হয় পৃথিবীর অন্যান্য যেসব দেশগুলোতে পেপসি প্রবেশাধিকার পেয়েছে তাদের অর্থনীতির নাটকীয় পরিবর্তনের উদাহরণ।

কিন্তু যাই হোক, ভারতীয় ব্যবসায়িক মহলের কাছে সরকার পেপসি-পাইক-ভোল্টাসের এইসব দাবি খুব একটা বেশি পাত্তা পাচ্ছে না। তাঁদের মতে এই সব দাবিসমূহকে বাস্তবে রূপ দেওয়া কঠিনতম কাজ। সন্দেহবাদীরা নিতান্তই ব্যংগভরে এইসব দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন। এর উত্তরে ভোল্টাসের চেয়ারম্যান আখতার আলি এইচ টৌব্যাকোওয়ালা বলেছেন, 'টাটার সংগে মার্সেডিজ কোম্পানির গাঁটছড়া ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে যে অগ্রগতি এনে দিয়েছে, কৃষিক্ষেত্রেও পেপসি প্রকল্প সেরকম অগ্রগতি এনে দিতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি। কৃষির ব্যবসায়িক দিকটা একেবারে বদলে দিতে পারে এই প্রকল্প।' এই প্রকল্পের ওপর ভোল্টাস চেয়ারম্যানের এতটাই বিশ্বাস যে, তিনি মনে করেন ভবিষ্যতে ভারতীয় কোম্পানির সংগে যেসব বিদেশি বহুজাতিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গাঁটছড়া বাঁধবে, তাদের সামনে সফল পথ-নির্দেশিকা হিসেবে থাকবে এই প্রকল্প।

অন্যদিকে বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে সবচেয়ে কড়া কথা বলেছেন কংগ্রেস (ই)-রই অন্যতম সাধারণ সম্পাদক কে এন সিং। তাঁর কথায়, 'ওরা ঘর সাজাতে কোলা নিয়ে ঢোকে। কিন্তু আসলে উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর তৈরি করা ছককে সাজিয়েগুছিয়ে তোলা। দেশের নিরাপত্তার বদলে কি আমাদের আরো একটা নরম পানীয় দরকার?' এর উত্তরে পেপসিকোলা ইন্টারন্যাশনালের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট বিভাগের ডিরেক্টর রমেশ ভাগ্গাল বলেছেন, 'আমরা যে সুযোগ সুবিধে নিয়ে রাশিয়া ও চীনে ব্যবসা করছি তার চেয়ে অনেক বেশি পাচ্ছে ভারত। ফলত, ওইসব অভিযোগ ধোপে টেঁকে না। এটা ঘটনা যে, ওই দুই দেশে পেপসি চুক্তিবদ্ধ হয়েছে ১:১ অনুপাতে। অর্থাৎ ১ ডলার দামের কাঁচামাল আমদানি করলে ঠিক ওই পরিমাণ অর্থই রপ্তানি করে অর্জন করতে হবে। সেখানে ভারতে অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে ১:৫ অনুপাত। দূরদর্শনের ফোকাস অনুষ্ঠানে এ প্রসংগে টাইটলার জানালেন, 'ওরা যদি ১ ডলার রোজগার করতে চায় তবে আমাদের জন্য ওদেরই রোজগার করে



দিতে হবে ৫ ডলার।' বস্তুত, ১৫১টি দেশে পেপসি যে সাম্রাজ্য চালাচ্ছে তার কোনটিতেই এইরকম অসম অনুপাতে তারা কাজ করেনি। কিন্তু ভারতের মত উন্নতশীল দেশে এই শর্তে তারা রাজিই বা হল কেন?

কেন হল, সেটা অনুমানের ব্যাপার। অনুমাননির্ভর সিদ্ধান্ত উচিত নয়। তবে প্রথমবার যেসব কারণে পেপসির প্রস্তাব বাতিল হয়ে গিয়েছিল, সেই কারণগুলি কি এবার অনুপস্থিত? নাকি নেহাৎই রাজনৈতিক মুনাফা লোটার চেষ্টায় পেপসিকে বাণিজ্যের অনুমতি দেওয়া হল? ঘটনাক্রমে নজর করলে এ প্রশ্ন উঠতেই পারে।

'কোলা' যুদ্ধ থেকে রমা গোয়েংকার পশ্চাদপসরণের পর ফের যখন পেপসি প্রস্তাব পেশ করল তখনও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রক থেকে যেরকম বিরোধিতা উঠেছিল তা কাটিয়ে ওঠা চট করে সম্ভব ছিল না। সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা এসেছিল খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ দফতর থেকে, যার তৎকালীন মন্ত্রী ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম প্রধান লেফটেন্যান্ট এইচ কে এল ভগৎ। এ বছর ২৫ জুন হঠাৎই একটা নতুন মন্ত্রক তৈরি হল – ফুড প্রসেসিং। দায়িত্ব নিলেন রাজীবের আস্থাভাজন জগদীশ টাইটলার। তারপর ৭ জুলাই নয়া দিল্লিতে মন্ত্রীমশাই প্রথম যে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেন তাতে প্রধান ইস্যুই ছিল পেপসি। তিনি ঘোষণা করলেন, 'পেপসিকো-র জন্য আমাদের দরজা বন্ধ হয়নি। পরিষ্কার করে বলতে গেলে দরজাটা এখনও হাট করে খোলা রয়েছে। পেপসিকো ভারতের দ্রুত-বর্ধমান নরম পানীয়ের বাজারে ঢোকার জন্য যে প্রস্তাব দিয়েছে সেটা মন্ত্রীদের একটি গোষ্ঠীর অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। সেটা মিললেই বাধা দূর হবে।'

বাধা দূর হতে সময় লাগেনি। তবে দৌড়োদৌড়ি হয়েছে বিস্তর। দৌড়োদৌড়ির কার্যক্রম যেমন হয়েছে খোদ রাজধানীতে, তেমনই ছুটেছেন পাঞ্জাব সরকার। আর চর্মচক্ষে দেখা গেছে ছুটিয়েছেন পাঞ্জাবের রাজ্যপাল সিদ্ধার্থশংকর রায়। ৩ আগস্ট পাঞ্জাব সরকার চণ্ডীগড়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক ডাকেন। যদিও ওই বৈঠকে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল পাঞ্জাব পুলিশ প্রধান কে পি এস গিল ও জনৈকা আই এ এস অফিসার শ্রীমতী বাজাজের কেলেংকারির ঘটনা, তবুও সরকারি তরফে পেপসি নিয়ে আধাখ্যাঁচড়া কিছু তথ্য রাখা হয় আলোচনার জন্য। পরে সরকারি মুখপাত্র জানান, ওই বৈঠকে উপস্থিত প্রায় সব নেতৃবৃন্দই পেপসি প্রকল্পের পক্ষে সমর্থন জানান, মাত্র একজন ছাড়া – জনতা পার্টির কৃষ্ণকান্ত। কিন্তু এই 'মিনমিনে অসমর্থন' খুব একটা গ্রাহ্য হয়নি। গ্রাহ্য কেন হয়নি তার একটা ব্যাখ্যা হতে পারে এরকম :

কৃষ্ণকান্ত যখন পেপসি বিরোধিতায় নামেন তখন তার পেছনে যে শুধু বিদেশি পুঁজির আগ্রাসন নীতির বিপদ বড় ইস্যু ছিল তা নয়। যেমন ছিল না জনতা পার্টিরই সাধারণ সম্পাদক জয়পাল রেড্ডির বিরোধিতায়। এ বছরের গোড়ার দিকে তিনিও বলেছিলেন, 'প্রেসিডেন্ট আলেন্দের অধীন চিলি সরকারের পতনের জন্য দায়ী পেপসি কোলা, একথা তো প্রমাণিত হয়েই গিয়েছে। তবুও এই সংস্থাকে পাঞ্জাবে কারখানা খোলার অনুমতি দিয়ে রাজীব সরকার আগুন নিয়ে খেলা করতে চলেছেন।' কিন্তু এত কথা বলা সত্ত্বেও

সিদ্ধার্থশংকর রায় :

পাঞ্জাবকে সমস্যামুক্ত করাই কি একমাত্র উদ্দেশ্য ?



জনতা পার্টির মত বিরোধী দল পেপসি নিয়ে ততটা হল্লাগুল্লা করেনি, যতটা করা দরকার ছিল। করেনি কারণ, ৭৮-এ জনতা রাজের তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজের প্রচেষ্টায় কোকাকোলা এদেশ ছাড়ার পর যমুনা দিয়ে অনেক জলই বয়ে গেছে। ফার্নান্ডেজের তখনকার প্রচেষ্টা আজ 'গিমিক' বলে কেউ মনে করতেই পারেন, তাঁর বা তাঁদের পরবর্তী পদক্ষেপ দেখে। কিন্তু এবার সে 'গিমিক' কাটানোর রাস্তা ছিল। হল না। কারণ পেপসি এলে যার বা যাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে আঘাত লাগবে তারা শাসক দলের কাছের লোক বলে প্রচারিত এবং বিরোধী পক্ষের পেপসি বিরোধিতায় কংগ্রেস (ই)-র ঘনিষ্ঠ শিল্পপতিরা লাভবান হলেও হতে পারে। অতএব মৃদু বিরোধিতা জানিয়ে দায় সারা যাক। এদেশের নরম পানীয় প্রস্তুতকারকদের ড্রিংকস এবং ম্যাকডোয়েল-এর যথাক্রমে রমেশ চৌহান, চরণজিৎ সিং ও বিজয় মালিয়া যেহেতু শাসকগোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ, অতএব পেপসিকে বাধা দিয়ে দেশীয় বাজারের ভাল বা মন্দ কোনকিছুতেই বিরোধী নেতারা রাজি নন। এই তিন ঠান্ডা জলপতি-র কেউ কেউ যে শাসক দলের অতি ঘনিষ্ঠ তার প্রমাণ কংগ্রেস(ই)-র একজন প্রাক্তন উচ্চপদস্থ নেতা ও বর্তমানে অকালি নেতা পাতিয়ালার প্রাক্তন রাজা অমরিন্দার সিংয়ের বক্তব্য। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে 'বিজনেস ইন্ডিয়া' পত্রিকার সংগে এক সাক্ষাৎকারে এই প্রকল্পের সমর্থনে যুক্তি দেখাতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেছেন, '(পাঞ্জাবের) সাধারণ মানুষ মনে করে কেন্দ্রীয় সরকার পাঞ্জাবি ও পাঞ্জাবের গ্রামের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করছে। পাঞ্জাবের কৃষকের চেয়ে রমেশ চৌহান এবং ওই জাতীয় নরম পানীয় নির্মাতাদের লবিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। ......যতদূর মনে হচ্ছে নরম পানীয় লবি পাঞ্জাবের সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিধর।' (উল্লেখ্য, সে সময় এই প্রকল্প আটকে যেতে পারে এরকম খবর ছড়িয়েছিল।) অমরিন্দার সিং আদতে কংগ্রেসি, এখন 'ধর্মরক্ষায়' অকালি নেতা। তাঁর পক্ষে জানা সহজ নরম পানীয় লবি কতটা শাসক দলের ঘনিষ্ঠ।

এই হিসেব অনুযায়ী উচিত ছিল চৌহানের নেতৃত্বে দেশীয় ড্রিংকস নির্মাতাদের স্বার্থ রক্ষা হওয়া। কিন্তু সে গুড়ে বালি ছিটিয়ে দিল মহা শক্তিধর প্রতিপক্ষ। একদিকে বার্ষিক ৪৬ হাজার কোটি টাকা বিক্রি নিয়ে পেপসি এবং ৪ হাজার কোটি টাকার বার্ষিক বিক্রির মালিক টাটা, উপরন্তু পাঞ্জাব সরকারের সম্পূর্ণ সমর্থনধন্য সরকারি সংস্থা পাইক। অন্য দিকে ক্ষুদ্রশিল্প হিসেবে রেজিস্ট্রিকৃত পার্লে এক্সপোর্টসের ১৫ কোটি টাকা বার্ষিক বিক্রি নিয়ে হাজির রমেশ চৌহান। তবে চৌহানের শক্তি ১৫ কোটিতেই সীমাবদ্ধ নয়। এদেশের ৬০০ কোটি টাকার নরম পানীয়ের বাজারের অর্ধেকটাই নিয়ন্ত্রণ করে তাঁর সংস্থা। তবু তিনি হালে পানি পেলেন না। অর্থাৎ প্রাসাদ রাজনীতির নেকনজর তিনি হারিয়েছেন। দিল্লি দরবার এখন মুক্ত অর্থনীতির নামে 'ফোরেন মাল'-এর দিকে তাকিয়ে।

চৌহান লড়াই চালিয়েছিলেন একেবারেই নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে। কিন্তু এমন কিছু

অমোঘ প্রশ্ন তিনি তুলেছেন যা সারা দেশের পক্ষেও জরুরি। বলা হয়েছে আগামী দশ বছরে পেপসির যৌথ প্রকল্প থেকে ২০০ কোটি টাকার দ্রব্য রপ্তানি করা হবে। চৌহানের প্রশ্ন, 'ওরা (পেপসি) যদি শর্ত পূরণ না করে তো সরকার কী করতে পারবে?' সংগে তিনি উদাহরণও দেখিয়েছেন। জুতো তৈরির বহুজাতিক সংস্থা অ্যাডিডাসের সংগে বাটার গাঁটছড়া বাঁধার প্রস্তাব সরকার পাশ করে দেবার পর বাটা তাদের যৌথ প্রকল্পের রপ্তানি শর্ত দশ বছরে ৩৩.৩৩ শতাংশে কমিয়ে নিয়ে আসার জন্য সরকারের কাছে দরবার করেছে। যেখানে শর্ত ছিল পাঁচ বছরে এই যৌথ প্রকল্প থেকে উৎপাদিত দ্রব্যের ৭৫ শতাংশ রপ্তানি করতে হবে। একইভাবে জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের সংগে হিন্দুস্থান কোকো প্রোডাক্টস যৌথ উদ্যোগে নেমে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না করতে পেরে কারখানাই বন্ধ করে দিয়েছে। এছাড়া আরও একটা প্রশ্ন আছে, নরম পানীয়ের মত 'নন-প্রায়রিটি' শিল্পে হঠাৎ এক বহুজাতিক দৈত্যকে নিয়ে আসার দরকার ছিল কি? কোক-এর প্রস্থানের পর দেশীয় প্রযুক্তিতেই যেখানে দেশের তৃষ্ণা মিটিয়ে রপ্তানির বাজারও ধরা গেছে, সেখানে আবার বিদেশি সংস্থা ডেকে আনা কেন? থামস আপ, লিমকা, ক্যাম্পাকোলা, থ্রিল ইত্যাদি পানীয় পশ্চিম এশিয়া, নাইজেরিয়া ইত্যাদি দেশে তো রপ্তানি করছেই। পেপসিকে ডেকে এনে দেশীয় প্রস্তুতকারকদের কি ভাত মারা হবে না? এ প্রসংগে 'ট্রিবিউন' দৈনিক পত্রিকার প্রধান সম্পাদক নারায়ণন জানিয়েছেন, কোন বিদেশি সংস্থাই এ পর্যন্ত ভারত সরকারের শর্ত পূরণ করেনি। পেপসিও যে শেষ পর্যন্ত করবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই।

তাছাড়া চৌহানের প্রশ্ন, '১০০ বছর আগে টাটারা কোন বিদেশি সহযোগিতা ছাড়াই স্টিল প্ল্যান্ট তৈরি করতে পেরেছিল। নরম পানীয়ের জন্য দেশেই তো প্রযুক্তি মজুত আছে, যার যোগানদার সেন্ট্রাল ফুড টেকনোলজি রিসার্চ ইন্সটিটিউট। তাহলে টাটা গোষ্ঠী কেন বিদেশি প্রযুক্তির জন্য দৌড়চ্ছে?' টাটা সার্ভিসেসের প্রধান একজিকিউটিভ অফিসার জাহিদ বেগ এর উত্তরে বলেছেন, 'এই উদ্যোগ মূলত ফলমূল ও খাদ্যদ্রব্য তৈরির জন্য। নরম পানীয় এর একটা অংগ মাত্র।' তাছাড়া এই উদ্যোগ মূলত রফতানি-নির্ভর। সেই কারণে আমাদের একজন বিদেশি সহযোগীর দরকার হয়েছে।' কিন্তু আসল প্রশ্নটা এখানেই – পেপসির মত বহুজাতিক সংস্থা কেন দুম করে নিজেদের ক্ষতি স্বীকার করে ভারত থেকে রফতানি করবে? পৃথিবীর যেসব অঞ্চলে রফতানি করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সেখানে তো তারা তাদের অন্যান্য কারখানা থেকে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী এখনই রফতানি করে। বলা তো হয়েছে পেপসি আসছে ব্যবসা করতে, কিন্তু সরকারের অযৌক্তিক তত্ত্ব শুনে মনে হচ্ছে তারা আসছে ভারতের মত নিম্নবিত্ত দেশের রফতানি-আদর্শ উজ্জ্বল করে তুলতে।

বলা হয়েছে পেপসি পাঞ্জাবে নাকি বেকার সমস্যার সমাধান করবে। রাজ্যপাল সিদ্ধার্থশংকর রায় বলেছেন, 'পাঞ্জাবে যে শুধু আইনশৃংখলার সমস্যাই আছে তা নয়, এ রাজ্যে

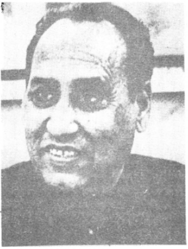


হাজারো অর্থনৈতিক সমস্যাও রয়েছে। বেশিরভাগ ছেলে যাদের উগ্রপন্থী কার্যকলাপের জন্য ধরা হয়েছিল, তারা বেকার। পেপসি তাদের কাজ দেবে। এবং যেসব কৃষকের পাঁচ একর জমি আছে এই প্রকল্পের ফলে বছরে প্রতি একরে অন্তত ৫০ হাজার টাকা তারা রোজগার করতে পারবে।' আবার মন্ত্রী টাইটলার এক কদম বাড়িয়ে বলেছেন, সব মিলিয়ে পঞ্চাশ হাজার লোক এখানে কাজ পাবে। কিন্তু পেপসির প্রতিনিধি রমেশ ভাগ্গালের বক্তব্য অনুযায়ী মাত্র পাঁচশ কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে।

আসলে এই প্রকল্পের সবচেয়ে বড় সমর্থক যারা,পাঞ্জাবের সেই ধনী কৃষক সম্প্রদায়ের সংগে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ঠ। এই কুলাকরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংগে সবচেয়ে বেশি একাত্মতা বোধ করেন। তাই পেপসি কালচার এঁদের কাছে এতটা আকর্ষণীয়। এঁরাই আবার পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদীদের মুখ্য মদতদার। মূলত এঁদের শান্ত করতেই এইরকম একটা প্রকল্প রাজীব সরকার নিয়ে ফেলেছেন।

তাছাড়া সরকার পার্টির নির্বাচনী তহবিলে টাকা। সমস্ত 'ডিলেই' পয়সা তোলা হয়। কখনো পয়সা যায় সুইস ব্যাংকে, কখনো পার্টির তহবিলে। তা সে পেপসিই হোক অথবা

কেদারনাথ সিং :
এখন কার চাপে চুপ



জাপানের সুমিতোমো, সবাই এদেশে উঁচু মহলে এজেন্ট পুষে রেখেছে। তাদের মাধ্যমে টাকা খাওয়ানো হয়। এবারের নির্বাচনী লড়াই বেশ কঠিন। বিরোধীপক্ষ 'হবে না হবে না'করেও এক মঞ্চের ওপরে এসে গেছে। লড়াই হবে জোরদার, তাই টাকাও চাই প্রচুর।

পৃথিবীর সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকে একথা পরিষ্কার যে বহুজাতিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি অন্য দেশে ব্যবসা করে শুধু অর্থনৈতিক শোষণই পাকা করে না, রাজনৈতিক পট বদলেও হাত লাগায়, প্রভাব ফেলে। তা চিলি, ইরান, ফিলিপিন্স যাই হোক না কেন। পাঞ্জাবেও যে পেপসি সেরকম কিছু করবে না তার গ্যারান্টি কি রাজীব গান্ধী দিতে পারবেন? বলা হয়েছে ১.৬ কোটি টাকা দিয়ে তৈরি হবে কৃষি গবেষণা কেন্দ্র। ভেবে দেখার কথা, সবুজ বিপ্লবের সফল হোতা পাঞ্জাবের কৃষি ব্যবস্থা অতি উন্নত হওয়া সত্ত্বেও কেন পেপসিকে অধিকার দেওয়া হল সেই পাঞ্জাবেরই কৃষিতে হস্তক্ষেপ করার। অন্য কথায়, পাঞ্জাবের চাষী কোন ফসল করবেন তার ওপরও পেপসির দখল থাকবে।

আসলে কংগ্রেস (ই) সভাপতি রাজীবের মাথায় এখন একটাই চিন্তা – কী করে পাঞ্জাবে প্রভাব বাড়ানো যায়। রাজনৈতিক সুবিধা পেয়ে গদি দখলে রাখতে গিয়ে যদি দেশের নিরাপত্তা নষ্ট হয়, তাতেও কুছ পরোয়া নেই। এদেশের উচ্চকোটির মানুষের যে সমস্যা অথবা চাহিদা সে সবের প্রতিই রাজীব সরকারের নজর। ৮০ কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র চার থেকে পাঁচ কোটি উচ্চবর্গের। সর্বসুবিধাপ্রাপ্ত মানুষের কাছে ভোগ্যবস্তুর চাহিদা তুংগে। তার সংগে তাদের প্রয়োজন বিদেশি কালচার। এরাই বছরে প্রায় আড়াই হাজার কোটি বোতল পানীয় গলাধঃকরণ করে। পেপসি তার অর্ধেক বানাবে এদেশে। আশ্চর্যের কথা, এখন যেন সফট ড্রিংক, আলুভাজা, পপকর্ন আর ফ্রুট জুসই বড় সমস্যা। আর এর সমাধান করার জন্য চাই বিদেশি সাহায্য। দেশি চলত না। নিয়মনীতির এরকম দেউলিয়াপনার উদাহরণ আর কী হতে পারে? □

নরেন্দ্রপুরে 'গণদেবতা'

এখানে দুদণ্ড দাঁড়ালে প্রকীর্ণ সবুজ নীলে দুচোখ জুড়িয়ে যায়। এখানে বিশুদ্ধ বাতাসে ফুসফুস ভরে ওঠে।

প্রাণচঞ্চল নগর কলকাতার থেকে বহুদূরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুর গ্রাম আর সে গ্রাম ছাড়িয়েও বেশ কিছু দূরে রেললাইনের ধারে ধানক্ষেতের এলায়িত ভঙ্গিমার পাশে বেশ কিছুদিনের জন্য অস্থায়ী তাঁবু গেড়েছে ছিরু পাল, দেবু ঘোষ, অনিরুদ্ধ, দুর্গা-পদ্মা, বিলু আরও অনেকে।

উপন্যাস 'গণদেবতা'। লেখক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়।প্রতি বুধবার রাত ৯ টায় জাতীয় অনুষ্ঠানের একেকটি এপিসোডে হিন্দি ভাষায় প্রচারিত হয়ে চলেছে লর্ড কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মরে পচে হেজে যাওয়া বাংলার পল্লীগ্রামের নিত্য দিনলিপি। বস্তুত রাঢ়ের শিল্পী তারাশংকর গ্রামবাংলার হৃৎপিণ্ডে কান পেতে যে বঞ্চনা, যে নিপীড়ন, যে ধূর্ততা যে খলতার প্রতিধ্বনি শুনেছিলেন, পল্লীবাংলার যে দূষিত শ্বাস-প্রশ্বাস আলোড়ন তুলেছিল তাঁর পরিশীলিত এবং আধুনিক শিল্পীচিত্তে তারই অনুপুঙ্খ রূপায়ণ এপিক উপন্যাস 'গণদেবতা'। নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের একটি কালজয়ী রত্নখণ্ড। 'হামলোগ' প্রসিদ্ধ পি কুমার বাসুদেব তুলে নিয়েছেন এর চিত্রায়ণের দায়িত্ব। তাঁকে পরিচালনায় সাহায্য করছেন এম এস সোধি, দুই কিশোরী কন্যা রচনা ও ঋতু বাসুদেব, শব্দগ্রহণে সুধাংশু শ্রীবাস্তব।

শুটিং চলছিল দেবু ঘোষের আস্তানায়, সাদামাটা একটি ঘর। খাট পাতা আছে। দেবু ঘোষ নাবালক ছেলেকে নিয়ে বসে আছে। সামনে দাঁড়িয়ে দেবুর তরুণী বউ বিলু। ক্যামেরা চলতে শুরু করে। দেবু ঘোষ ছেলেকে কোল থেকে নামিয়ে এগিয়ে যায় দরজার দিকে, পেছনে বিলু। 'তাড়াতাড়ি ফিরো' – বিলু বলে। দেবু একটু পিছনে ঘুরে হেসে সম্মতি জানায় – কাট।

দেবু পণ্ডিতের ভূমিকায় রোহিত ওরি। বয়স অল্প, পাতলা ছিপছিপে ফর্সা চেহারা। কল্পনায় দেখা উপন্যাসের এ চরিত্রটিকে পদার্য় কিঞ্চিৎ অপরিণত দেখায়। তবে অভিনয়ে আন্তরিকতা আছে। বিলু চরিত্রে নীতা গগলানি বেশ অভিজাত এবং নাগরিক। বিলুর শিশুপুত্রের ভূমিকায় অঞ্জন চতুর্বেদী সপ্রতিভ।

কথা হচ্ছিল ছিরু পালের সংগে। ভাসাভাসা উজ্জ্বল দুটি চোখ স্বাস্থ্যবান স্মিতহাসি ছিরু পাল ওরফে অশোক সিং কলকাতার ছেলে। মীর্জাপুর স্ট্রিটের সিটি কলেজ অফ কমার্সের ছাত্র। ঊষা গাংগুলির 'রংগকর্মী' নাট্যদলের নিয়মিত অভিনেতা অশোক। 'মহাভোজ' নাটকে তাঁর অভিনয় প্রশংসা পেয়েছে। কুমার রায়ের নির্দেশনায় হিন্দি 'রক্তকরবী'তে করেছিলেন বিশু পাগলের অভিনয়। অশোক ভাল গানও গান। 'খলচরিত্রে' অভিনয় করতে কেমন লাগে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, গ্রুপ থিয়েটারে খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করার অভিজ্ঞতা তার আছে, সুতরাং সেদিকে কোন অসুবিধা নেই। আর তাছাড়া 'গণদেবতা'র ছিরু পাল, সে খলই হোক আর যাই হোক যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র কারণ গোটা উপন্যাসেই বিস্তৃত তার প্রভাব। সুতরাং এদিক থেকে ছিরু পালের চরিত্র রূপায়ণে অনুভূত বা নৈপুণ্য কোনটাই কম হলে চলবে না। বড় পর্দায় তরুণ মজুমদারের 'গণদেবতা'র ছিরু পাল ওরফে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ের প্রভাব তাঁর ওপর পড়েছে কিনা জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, বাংলা গণদেবতা তিনি দেখেননি। তবে তিনি শুনেছেন, অজিতেশ ছিরু পালের ভূমিকায় যথেষ্ট সফল। বেশিরভাগ বাঙালি দর্শকের মনেই ছিরু পালের ভূমিকায় অজিতেশের অভিনয় গভীর দাগ কেটেছে। সুতরাং এই ইমেজ ভেঙে বাঙালি দর্শকের মনে প্রবেশ করা অশোকের পক্ষে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। অশোক জানালেন, নিজের বোধ বুদ্ধি অনুভূতি দিয়ে তিনি এ চরিত্রটিকে যথাসাধ্য ভালভাবে রূপায়িত করার চেষ্টা করবেন। একই চ্যালেঞ্জ আছে দেবু পণ্ডিত ওরফে রোহিত

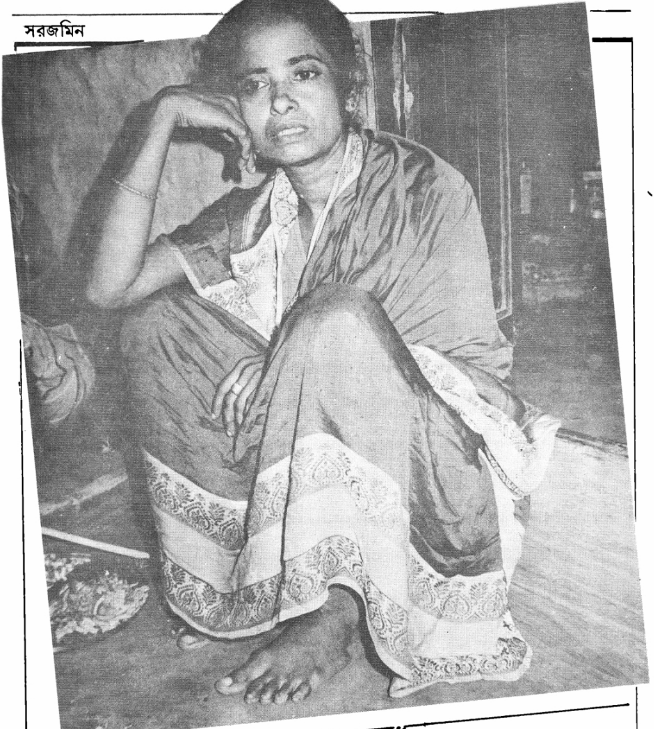


ওরির সামনেও। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ইমেজ ভেঙে তাঁকেও স্থান করে নিতে হবে বাঙালি দর্শকের হৃদয়ে। হিন্দিতে বার তিনেক উপন্যাসটি পড়েছেন রোহিত। পরিচালকের কড়া নির্দেশে অশোক বা রোহিত কেউই দেখেননি বাংলা 'গণদেবতা'। অন্যান্য প্রধান চরিত্রের মধ্যে আছে অনিরুদ্ধ (পূরণ জয়শোয়াল), দুর্গা (রূপা গাংগুলি), পদ্মা (সংযুক্তা গুপ্ত), পাতু (চন্দ্রেশ্বর শা)। জগন ডাক্তারের ভূমিকায় যাঁকে দেখা গেল সেই কল্যাণ চক্রবর্তীকে দর্শক এতদিন চিনেছেন 'অ্যাংগ্রি ইয়ংম্যান' হিসেবে। এবারে সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারায় দূরদর্শনের পর্দায় অবতীর্ণ হচ্ছেন কল্যাণ। জগন ডাক্তারের ভূমিকা তাঁর পক্ষেও কম বড় চ্যালেঞ্জ নয়।

কলকাতার উপকণ্ঠে এক প্রত্যন্ত এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে গণদেবতার ছবি তোলার কাজ। আউটডোর লোকেশন হিসেবে শুটিং স্পটটি 'গণদেবতা'র আবহ রচনার পক্ষে যথাযথ ও সুনির্বাচিত মনে হল। রোহিত বিস্মিত। কলকাতার এত কাছে এমন পিছিয়ে পড়া জায়গা থাকা সম্ভব? রেললাইনের ধারে শীর্ণদেহ ছোট্ট গ্রাম। গ্রামবাসীরা সাধ্যমত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। গ্রামবাসীদের সাদামাটা কুঁড়েঘরেই অনিরুদ্ধের দালান, ছিরুর চণ্ডীমণ্ডপ, দেবু পণ্ডিতের ডেরা পাঠশালা। কাছেই হরিজন পল্লী, গাঁয়ের মেঠো পথ। 'গণদেবতা'র গ্রামীণ ক্যানভাস সঠিক ধরা পড়তে পারে এ লোকেশনে। এছাড়াও অস্থায়ী শিবিরে চলছে মেকআপ, মহড়া।

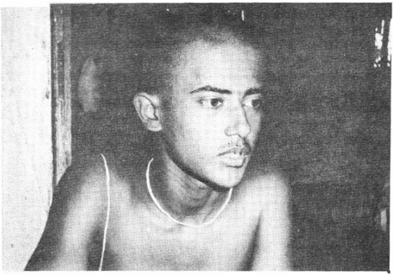
পরিচালক বাসুদেব জি বম্বের পুনা ফিল্ম ইনস্টিট্যুটের প্রাক্তন ছাত্র। দিল্লি-বম্বের নাগরিক সংস্কৃতির সংগেই বাস্তবে তাঁর বোঝাপড়া। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, গণদেবতার সঠিক চিত্রায়ণের পথে এই সাংস্কৃতিক দূরত্ব কোন অন্তরায় সৃষ্টি করছে কিনা। তিনি অবলীলায় জানালেন, গ্রামের সংগে তাঁর আত্মীয়তার অভাব নেই। থিয়েটারের কল্যাণে গ্রামের হৃৎস্পন্দন বুঝতে ভুল করেন না তিনি। আসলে তিনি মানুষের গল্প শোনাতে চান। আধুনিক যুগে মানুষের মূল্যবোধের শিকড়ে যখন টান পড়েছে তখন তারাশংকরের এই মহান উপন্যাসের আশ্রয় নিয়ে তিনি উপহার দিতে চান সৎ, সরল, সুস্থ জীবনের কাহিনী। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ সংগ্রাম, হারিয়ে যাওয়া সত্যের অন্বেষণ এ উপন্যাসের উপজীব্য। এছাড়া পল্লীবাংলার প্রতিদিনের চেনাজানা মানুষের মুখে রাষ্ট্রভাষায় সংলাপ ও কথোপকথন উভয় সংস্কৃতির মধ্যে সেতুবন্ধন ঘটাবে – এও তিনি বিশ্বাস করেন। □

বর্ণালী দাস



কোন অপরাধে আমার স্বামী খুন হলেন – লাবণ্য দেবী

যে রাজ্যে মেহনতি মানুষের সরকার আজ দীর্ঘ ১১ বছর ধরে রাজত্ব করছে, সেই রাজ্যেই নিজের ও অন্য সহকর্মীদের বোনাসের দাবি জানাতে গিয়ে মালিকের হাতে খুন হলেন



মুরারীবাবুর বড় ছেলে বিশ্বজিৎ

একজন শ্রমিক। ভাবতে অবাক লাগে যে রাজ্যের সরকার খেটে খাওয়া মানুষের কল্যাণের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সেই রাজ্যেই একজন শ্রমিক মাত্র ১২ টাকা দিন মজুরিতে প্রাণপাত করে গেলেন অথচ প্রাপ্য হিসাবে পেলেন অকথ্য অত্যাচার। হ্যাঁ, দিনে ১২ টাকা মজুরি পেতেন ৪৫ বছর বয়স্ক মুরারী চক্রবর্তী। কাজ করতেন জগাছা থানা এলাকার দাশনগরের 'মাকালী ঢালাই কারখানায়'। কারখানার মালিক কালীপ্রসাদ সাউ। বিত্তবান মানুষ। এলাকায় আরও তিনটি ঢালাই কারখানার মালিকও তিনি। থাকেন হাওড়ার বেলিলিয়াস রোডে। তার চারটি কারখানায় সব মিলিয়ে কয়েকশো লোক কাজ করেন। মুরারীবাবুও ছিলেন এঁদেরই মত একজন অদক্ষ শ্রমিক। মুরারীবাবু কারখানায় কী ধরনের কাজ করতেন তা শোনা যাক তাঁর স্ত্রী লাবণ্যর ভাষায়। ওঁকে কারখানায় সবরকম কাজ করতে হত। গোবর তোলা থেকে লোহার জিনিসপত্র ওঠানো, মানে জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ পর্যন্ত। অথচ ও সবচেয়ে কম মজুরী পেত। প্রতিবাদ করলেই জুটতো লাঞ্ছনা, মারধোর। তবুও সে সহকর্মীদের ন্যায্য সব দাবিদাওয়া নিয়ে মালিকের সঙ্গে কথা বলত। আর সেটাই ওর কাল হল। চক্রবর্তী পরিবারের সেই কালরাত্রির দিকে চোখ ফেরানো যাক।

লাবণ্য জানালেন, মুরারীবাবু প্রায় দিনই ওভারটাইম ডিউটি করতেন। মঙ্গলবার অর্থাৎ ৪ অক্টোবর সকালে মুরারীবাবু শেষ বাড়ি থেকে বের হন। বাড়িতে বলে যান রাতে ফিরবেন। কিন্তু রাতে বাড়ি না ফেরায় বাড়ির সবার চিন্তা হয়। কিন্তু সারা রাত বাড়ি না ফেরায় ভোর হতে বড় ছেলে বিশ্বজিৎকে কারখানায় পাঠান লাবণ্য দেবী।

বিশ্বজিৎ জানাল আমি ফ্যাক্টরিতে গিয়ে দেখলাম বাইরে থেকে দরজা বন্ধ। ইতিমধ্যে একজন এসে থানায় জানাল বাবাকে কাল রাতে কারখানার মধ্যে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। আমার মনের অবস্থা বলার মত নয়। পাগলের মত আমি বাড়ি ফিরে আসি। পাড়ার লোক খবর পেয়ে যায়।' সবাই একসঙ্গে ফ্যাক্টরিতে আসি।

এরপরের ঘটনা জানালেন হাওড়া পুলিশের এক পদস্থ অফিসার। ভারতমাতা কলোনি – যেখানে মুরারিবাবু থাকতেন সেখানকার অধিবাসীরা কালীপদ সাউ-এর দুটি কারখানা আক্রমণ করে। দুটি কারখানায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। কারখানা দুটি আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারখানার মধ্যে রাখা তিনটি গাড়ি সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায়। আক্রমণকারীরা কারখানার তিনজন কর্মচারীকেও ধরে মারধোর করে। পরে তারা মালিকের বাড়ি আক্রমণ করতে যায়। তবে

শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে
মালিকপক্ষকে হুঁসিয়ারী



পুলিশ তাদের ফিরিয়ে দেয়। মুরারী চক্রবর্তীকে হত্যার অভিযোগে পুলিশ কারখানার মালিক-ম্যানেজার সহ মোট ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে।

জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে মুরারীবাবু শ্রমিকদের বোনাসের ব্যাপার নিয়ে মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। হঠাৎ মালিক পক্ষের সঙ্গে মুরারীবাবুর কথা কাটাকাটি হয়। অভিযোগে প্রকাশ যে তখন মালিকের এক ছেলে ও কয়েকজন শ্রমিক মুরারীবাবুকে ধরে প্রচন্ড পেটায়। তিনি গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যান। তখন তাঁকে একটি রিক্সা ভ্যানে করে কারখানার বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। মুরারীবাবুকে যখন হাওড়া-আমতা রোড দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন স্থানীয় লোকজনদের সন্দেহ হয়। তাঁদের বলা হয়, লোকটি মদ খেয়ে অচৈতন্য হয়ে গেছে, তাই তাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু কিছুদূর নিয়ে যাওয়ার পর মুরারীবাবুকে রাস্তায় ফেলে বহনকারীরা পালায়। পরে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় পুলিশ তাঁকে হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। কিন্তু তিনি সেখানেই মারা যান। পরে পুলিশ তাঁর মৃতদেহ সনাক্ত করে।

ভারতমাতা কলোনি। দাশনগর ফাঁড়ির পাশ দিয়ে এবড়ো-খেবড়ো পাথরের রাস্তা দিয়ে মিনিট কুড়ি হাঁটলে চোখে পড়বে সারি সারি টালির চালের বাড়ি। এখন যেখানে বাড়িগুলি তৈরি হয়েছে সেখানে বেশ কয়েক বছর আগেও ঝিকঝিক করে মার্টিন কোম্পানির ছোট ট্রেন চলত। তারপর একদিন বিপুল লোকসানের খেসারত দিতে দিতে মার্টিন ট্রেন বন্ধ হয়ে গেল। মার্টিন ট্রেনের লাইনের উপর পত্তন হল বেশ কিছু জবর দখল কলোনি। ভারতমাতা কলোনিও এরকমই একটি কলোনি। পথে একজনকে মুরারীবাবুর বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করতেই তিনি জানালেন সামনের রাস্তা দিয়ে গিয়ে ১২ খানা বাড়ির পরে যে বাড়িটা দেখবেন সেটাই চক্রবর্তীদের। হাওড়া জেলারই আমতা থেকে ৭৬/৭৭ সাল নাগাদ মুরারীবাবুর স্ত্রী দুই ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে ভারতমাতা কলোনিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মুরারীবাবুর বাড়িতে ঢুকতেই চোখে পড়ল একটা দারিদ্র্যের বাতাবরণ। টালির চালের দুটি ঘর। সামনে এক চিলতে দাওয়া ও উঠোন। উঠোনে কয়েকটা গাছ লতিয়ে লতিয়ে টালির চালে ওঠার চেষ্টা করছে। দাওয়াতে রান্নার জায়গা। চোখে পড়ল একটা থালায় কেটে রাখা হয়েছে থোড় আর করোলা। মেঝেতে একটা বাটিতে দুটো বিস্কুট। একজন কমবয়সী বিবাহিতা মেয়ে রান্নার তোড়জোড় করছে। একজন বৃদ্ধা তরকারির খোলা তুলছেন। একটি ১৪/১৫ বছরের ছেলে আমাদের

দাওয়ায় নিয়ে বসাল। ন্যাড়া মাথা দেখে বুঝতে পারলাম সে মুরারীবাবুর বড় ছেলে বিশ্বজিৎ। বৃদ্ধা হলেন মুরারীবাবুর শাশুড়ি আর বিবাহিত মেয়েটি মুরারীবাবুর কন্যা। সবাইকে ছাপিয়ে চোখে পড়ল নিরাভরণা এক মহিলা। বয়স বছর চল্লিশ। পরনে নীল রঙের একটা আটপৌরে শাড়ি। চোখ আকাশের দিকে। তাতে শূন্যতা ভরা। ইনিই লাবণ্য চক্রবর্তী। স্বামী প্রসঙ্গে কথা বলতে গেলেই কষ্ট হচ্ছে। তবু বললেন – জানেন আমার ২০/২১ বছর বিয়ে হয়েছে কিন্তু কোনদিনও ওঁকে মদ খেতে দেখিনি। নেশার মধ্যে মাঝে মাঝে খৈনি খেতেন মাত্র।

লাবণ্যর দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর স্বামীকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। কেন না তিনি সব সময়ই অন্য শ্রমিকদের হয়ে মালিকের কাছে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেন। এই সব কারণেই মালিক মুরারীবাবুকে ভাল চোখে দেখতেন না। লাবণ্য জানালেন একবার মাইনে বাড়ানোর কথা বলাতে কিছুদিন আগে মালিক মুরারীবাবুকে মারতে যায়। এই ঘটনার পর লাবণ্য দেবী তাঁর স্বামীকে ঐ কোম্পানির চাকরি ছেড়ে দিতেও বলেন।

লাবণ্য জানালেন, গত বছরেও বোনাসের প্রায় ২০০ টাকা মালিক মুরারীবাবুকে দেননি। বোনাস হিসেবে গত বছর মুরারীবাবুকে ৪০০ টাকা দেওয়া হয়েছিল। এই নিয়ে মুরারীবাবু মনে মনে ক্ষুব্ধ ছিলেন। এবারও মালিক বোনাস নিয়ে টালবাহানা করছিলেন। কথা ছিল পুজোর ষষ্ঠীর দিন বোনাস দেবেন। সেই বোনাস আর তাঁর হাতে এল না। মুরারীবাবু চলে গেলেন। একটা সংসারে নেমে এল অন্ধকার। বড় ছেলে বিশ্বজিৎ নেতাজি সুভাষ হাই স্কুলের ক্লাস নাইনের ছাত্র। ছোট ছেলে সুরজিত বাবার দুঃখ লাঘবের জন্য হাওড়ার বেলগাছিয়ার একটা কারখানায় কাজ নিয়েছিল। মাসে ১০০ টাকা বেতন পায়।

বিশ্বজিৎ জানায়, তার বাবা সাধারণত কোন দল বা বিশেষ ইউনিয়ান না করলেও মনে মনে সি পি এম-এর সমর্থক ছিলেন। গরিব অহসায় শ্রমিকদের উপর মালিকের অত্যাচার দেখলে গর্জে উঠতেন। আর এই প্রতিবাদী ভূমিকার জন্যই তাঁকে প্রাণ দিতে হল। বিশ্বজিৎ জানায়, ঘটনার পর স্থানীয় সি পি এম কাউন্সিলার দেবী পাঠক ও তাদের পাড়ার ক্লাবের ছেলেরা তাদের জন্য অনেক করেছেন। সি পি এম-এর স্থানীয় কমিটি থেকে তাঁদের পরিবারকে এককালীন টাকা সাহায্য দিয়েছে। পার্টির এই সাহায্য আর সুরজিতের উপার্জিত ১০০ টাকার উপর ভরসা করে এখন কোনওমতে তাদের সংসার চলছে। কিন্তু কতদিন চলবে? লাবণ্য দেবী জানালেন ঘটনার পর সরকার তরফে কেউ কোন খোঁজ নিতে আসেনি। সবচেয়ে দুঃখের কথা যে মুরারীবাবু প্রাণ দিলেন যে শ্রমিকদের জন্য সেই শ্রমিকদের তরফে একজনও হতভাগ্য পরিবারের কাছে এসে দাঁড়ায়নি বা খোঁজও পর্যন্ত নেয়নি। স্বামীহারা শোকার্ত যে মহিলা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে কথা বলে যাচ্ছিলেন, স্বামীর সহকর্মীদের অকৃতজ্ঞতায় তাঁর চোখ এখন জলে ভরে উঠল।

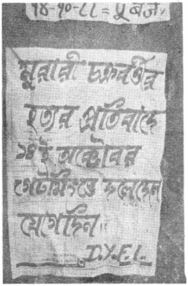
মুরারীবাবুর বাড়ি থেকে পায়ে পায়ে যখন সেই মাকালী ঢালাই কারখানার কাছে গিয়ে পৌছলাম তখন সূর্য মাথার উপরে উঠে গেছে। দাশনগরের ভারত জুট মিলের ঠিক উল্টোদিক দিয়ে যে ঘিঞ্জি রাস্তাটা চলে গেছে তার ভিতরেই মুরারীবাবুর কারখানা। চারদিকের বিভিন্ন কারখানা থেকে নানা ধরনের বিচিত্র আওয়াজ। কাজ করছে বঞ্চিত শ্রমিকের দল। খোঁজ নিয়ে মাকালী ঢালাই কারখানার সামনে পৌছলাম। বেশ বড়সড় কারখানা। কিন্তু গেটে একটা প্রকান্ড তালা ঝুলছে। কোনরকমে হাত দিয়ে গেট ফাঁক করতেই চোখে পড়ল দগ্ধ কয়েকটি গাড়ি। কারখানার ভিতর কেউ নেই। স্থানীয় লোকজন জানাল, ওই ঘটনার পর থেকেই কারখানা বন্ধ। পাশের কারখানার এক শ্রমিককে কালীপদ সাউ সম্বন্ধে প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই এক মোটাসোটা ভদ্রলোক পাশের কারখানা থেকে বেরিয়ে শ্রমিকটিকে ডেকে নিলেন। শ্রমিকটিও ভয়ে ভয়ে কারখানার ভিতর ঢুকে গেল। তবে স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে সাউ পরিবার সম্বন্ধে কোন ভাল ধারণা নিয়ে ফিরতে পারিনি।

তবে ফিরে আসার আগে মাকালী ঢালাই কারখানার গেটে চোখ পড়তেই লক্ষ্য করলাম লাল কালি দিয়ে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি থেকে শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে মালিক পক্ষকে হুঁসিয়ারী দেওয়া হয়েছে। তেমনি বাস স্ট্যান্ডসহ এলাকার বিভিন্ন জায়গায়ও নানা কালি দিয়ে ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। আজ মুরারীবাবুর মৃত্যুর পর এত সব কান্ড হচ্ছে অথচ জীবিত অবস্থায় যে মানুষটা ১২ টাকার বিনিময়ে জীবনপাত করে গেলেন তিনি কী বিচার পেলেন? □



ভারতমাতা কলোনীতে মুরারীবাবুর বাড়ি

মুরারীবাবুর মৃত্যুর প্রতিবাদে
এলাকায় ডি ওয়াই এফ আই এর পোস্টার



অম্বর মুখোপাধ্যায়

ফটো : অচিন্ত্য হাজরা

বন্যপ্রাণীর প্রতি নির্মমতা বাড়ছে

আমাদের দেশে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা দিনদিন কমে যাচ্ছে। শুধুমাত্র বাঘের সংখ্যাবৃদ্ধির হিসাব দিয়ে বন্যপ্রাণী ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রয়েছে বলে দাবি করা বাতুলতা মাত্র। শুধুমাত্র জীবজন্তুই নয়, বহু প্রজাতির গাছপালা -বনৌষধিও বিরল হতে হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বসেছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেও বেঁচে থাকা পশুপাখি আর টিকে থাকা গাছপালাও ধ্বংস করা হচ্ছে। মানুষ নিজের ভুলের জন্যেই, চরম স্বার্থপরতা এবং সীমাহীন অজ্ঞতার জন্যেই বন্যপ্রাণী এবং বন্য পরিবেশের ক্ষতি সাধন করছে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রথমদিকেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বন্যপ্রাণীও পশু-পক্ষীর প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনের উপদেশ দিয়েছিলেন। বন্যপ্রাণীর প্রতি ভালবাসা এবং তাদের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপনের চেষ্টা করা দরকার। ভারতে বন্যপ্রাণী রক্ষা আইন প্রচলিত থাকলেও অবাধে পশু হত্যা চলছেই। গ্রামেগঞ্জে মাঠে-ক্ষেতে শস্যের বৃদ্ধি ও পুষ্টির আশায় কীটনাশক, আগাছানাশক ও ফসল বৃদ্ধিকারক নানা ধরনের ওষুধ ছড়ানোর জন্য জল দূষিত হচ্ছে। পাখির মৃত্যু তাই ত্বরান্বিত হচ্ছে। ব্যাঙের ঠ্যাং বিদেশি মুদ্রা আনার প্রতিশ্রুতি দেয় বলেই রাতদুপুরে লাঠি সড়কি আর যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যাঙ ধরতে বের হতে দেখা যায় সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীকে।

ব্যাঙের সংখ্যা কম হওয়ায় মশা বাড়ছে। মশা ব্যাঙের খাদ্য। ব্যাঙ নেই, তাই আরও অনেক পোকা-মাকড় বাড়ছে। সাপের উৎপাত নিত্য নতুন সংবাদবাহী। ছিটে বন্দুক দিয়ে ঘুঘু, শালিক, ফিঙে, দোয়েল, টিয়া, বুলবুলি, টুনটুনি, হাঁড়িচাঁচা পাখির প্রাণ নিতে একদল অতি উৎসাহী শৌখিন শিকারী মেতে ওঠে। হুগলি জেলা বিজ্ঞান ক্লাব (বাঁদপুর) এক সমীক্ষায় লক্ষ্য করেছে যে, কত দ্রুত পাখির বংশ ধ্বংস করার যজ্ঞ চালাচ্ছেন সংঘবদ্ধ যুবকেরা। কিছু যুবক ও আদিবাসী তরুণ গুলতি, তীর, ধনুক দিয়ে পাখি শিকার করছেন। গ্রামের ভেতরে গিয়ে একটু খবর নিলেই বোঝা যাবে ছাতার কাপড়ে খাঁচা ঢেকে খাঁচার ভেতর পোষা ডাহুক পাখি রেখে দেয় একদল মানুষ। তারপর সেই খাঁচা পুকুর পাড়ে বা নির্জন বনে রেখে দিয়ে পাখির ডাক নকল করে ডাকে মানুষ। খাঁচার গায়ে বোকা ডাহুক দলবেঁধে দেখতে আসে জাতভাইদের। খাঁচার গায়ে লাগানো আঠায় জড়িয়ে বনের ডাহুকরা ধরা পড়ে।

প্রায় মাংসহীন কঙ্কালসার ডাহুক পাখি ছোট মুর্গির বাচ্চা বলে শহরের খদ্দেরদের খেতে দেয় হোটেলের মালিক। কলকাতার নতুনবাজার কিংবা হাওড়ার টিকিয়া পাড়ায় অজস্র সব পাখি বিক্রি হয়। মাংসের জন্যেই বেশিরভাগ খদ্দের পাখি কেনে। দীঘার সমুদ্র-তীর থেকে বিশালাকায় কচ্ছপ—সি টার্টল ধরে কলকাতায় চালান দেওয়া হয়। কচ্ছপের ডিম বহু মানুষের প্রিয়। ২৪ পরগণার বারাসতের এক বাজারে জ্যান্ত বিশাল কচ্ছপের দেহ থেকে মাংস

গুজরাটে মুক্ত-আবাসে সিংহ



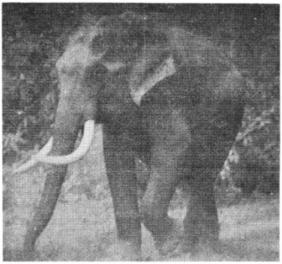
কেটে কেটে বিক্রি হচ্ছিল। বেচারা যন্ত্রণাদগ্ধ প্রাণীটি তখনও বেঁচে রয়েছে। এমন নির্মমতাও মানুষের গা সওয়া হয়ে গেছে। ২৪ পরগণার ক্যানিং এলাকায় গলদা চিংড়ি দ্রুত বেড়ে ওঠার আশায় বাচ্চা মাছকে ধরে পিন দিয়ে চোখ ছেঁদা করে নষ্ট করে দেওয়ার কথা শোনা গেছে।

শশাক্ষেতের শেয়াল তাড়াবার জন্যে শশার ভেতর বোমার মাল-মশলা ভরে দেওয়া হয়। বেচারা শেয়াল না জেনে কামড় দিলেই বোমা ফেটে রক্তাক্ত হয়ে মারা যায়। তাছাড়া শেয়াল মারার জন্য পোষা কুকুর দিয়ে বন-জঙ্গলে শেয়ালের গর্ত খুঁজে আগুন জ্বালিয়ে একদল মানুষ খুবই আনন্দ পায়। এদের অত্যাচারে শেয়ালের বংশ ধ্বংস হতে বসেছে। সন্ধের পর কা-হুয়া রব গ্রামে এখন বিরল। বেদে বা একধরনের ভবঘুরে মানুষ বাঁশের লগির ওপর আরও একটি লগি ঢুকিয়ে (এক ধরনের পাতলা সরু বাঁশ) তার মাথায় তীক্ষ্ণ ধারালো লোহার শলাকা এঁটে দেয়। বট--অশ্বত্থ গাছে বাদুড়ের আশ্রয়। তারা কলাগাছেও ঝোলে কখনও বা। আচমকা ঐ যন্ত্র দিয়ে বাদুড়ের হৃৎপিণ্ড ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হয়।

দুধ না দিয়ে খাদ্য না দিয়ে বাছুরকে ধীরে ধীরে হত্যা করার ঘটনা তো বহু প্রাচীন। পাকা কাঁঠালের ভেতর বিষ দিয়ে সেই কাঁঠাল খাইয়ে হাতিকে মারা হয়েছে দাঁতের লোভে। এই ঘটনা উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে হামেশাই ঘটে থাকে। গণ্ডারের শিং-এর জন্য মানুষরূপী কিছু পশু এই প্রাণীটিকেও বিষ খাইয়ে হত্যা করতে পিছপা হচ্ছে না। চামড়ার জন্যেই কুমিরের চাষ করার পক্ষপাতী কিছু মানুষ। এরা কুমির চাষ করতে চান ব্যবসা-ভিত্তিতে। এদিকে কুমিরের সংখ্যা ভারতের বহু নদীতে অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে বলে ভারসাম্য রক্ষার জন্য কুমির নিধনের সুপারিশ করেছেন বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ। অন্যদিকে 'বিউটি উইদাউট ক্রুয়েলটি' সংস্থাটি এই কুমির নিধনের তীব্র প্রতিবাদ করেছে। এই সংস্থার মতে: খরগোস, গোসাপ, সাপ, হরিণ ইত্যাদির চামড়া দিয়ে সৌখিন ব্যাগ তৈরি করা কিংবা নিরীহ প্রাণীর চর্বি

দিয়ে প্রসাধন দ্রব্য প্রস্তুত করা বন্ধ হোক। কলকাতা পুরসভা কুকুর রপ্তানি করতে চাইলে যেমন ডগ লাভার্স সংস্থা প্রতিবাদ করে তীব্রভাবে, তেমনি অ্যানিম্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড আপত্তি জানিয়েছে রাজ্যে রাজ্যে কর্পোরেশন কর্তৃক কুকুর ধরে হত্যা করার ব্যাপারে। সম্প্রতি একটি সংস্থা মাংসের জন্য পশু হত্যার আগে বিশাল পশুকে ইনজেকশন দিয়ে অচল অনড় করে দিতে বলছে। এ ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়েছে নানা মহলে।

পশ্চিমবঙ্গের 'কনজার্ভেটর অব ফরেস্ট, ওয়াইল্ড লাইফ সার্কল' সুভাষচন্দ্র দে (আই এফ এস) মহাশয়ের দপ্তরে গিয়েছিলাম বন্যপ্রাণীর প্রতি নির্মমতা বিষয়ে কিছু জানার ছিল। সুবলসখা মণ্ডল মহাশয় বনবিভাগের বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত। তাঁর মতে, বনবিভাগ আপ্রাণ চেষ্টা করছেন নির্মমতা কমাতে। বন্যপ্রাণীর প্রতি মমতা আছে বলেই সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে পাগলা হাতিকে ঘুম পাড়ানি গুলি দিয়ে অবশ করে ধরে ফেলা হয়েছিল এবং পরে তাকে মুক্ত প্রকৃতিতে ছেড়ে দেওয়াও হয়েছে। এর আগে মেদিনীপুরে বন্য মত্ত হাতিকে বনবিভাগ বাধ্য হয়েই হত্যা করেছিল। সেবার সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন (লণ্ডন)-এর এক মুখপাত্র বলেন--'চিড়িয়াখানায় পশুপালন কেন্দ্রে কিংবা মুক্ত পশুসংরক্ষণ কেন্দ্রেই বা পশুরা কীভাবে রয়েছে? পশুকে কি ঠিকমত লক্ষ্য রাখা হচ্ছে?



দাঁতের লোভে কাঁঠালের ভেতর বিষ দিয়ে সেই কাঁঠাল খাইয়ে হাতিকে মারা হয়েছে

নদীয়ার বেথুয়াডহরি রিজার্ভ ফরেস্টের হরিণ পর পর অজানা রোগে মারা গেল, আলিপুর পশুশালায় দূষিত পরিবেশে পশু-পাখি মারা যাওয়ার খবরও অস্বীকার করার উপায় নেই। গুজরাটে মুক্ত সিংহ পালন কেন্দ্রের সিংহগুলোকে এমনভাবে রাখা হয়েছে যে বেচারাদের দেখলে মায়া হয়। যেন মৃত্যুর জন্য দিন গুনছে। এ কীরকম পশুপ্রীতি?

বন্য পশুপ্রাণীর প্রতি ভালবাসা জাগিয়ে তোলার জন্য পরিবেশ বিষয়ে, বন্যপ্রাণী বিষয়ে পাঠ্যসূচি স্কুল-কলেজের শিক্ষাক্রমের সঙ্গে যুক্ত করা হোক। বন্যপ্রাণীর প্রতি নির্মমতার প্রতিবাদ সব মহল থেকেই হওয়া উচিত। বন্যপ্রাণী রক্ষা ও পরিবেশ বিষয়ে শিক্ষা প্রচারে ব্রতী সংস্থাগুলোর একযোগে প্রয়াস চালানো দরকার। □

এ এফ কামরুদ্দীন আহমদ

খবর

দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি



সম্প্রতি হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুর ব্লকের স্বেচ্ছাসেবামূলক প্রতিষ্ঠান সোনাতলা মিলন সংঘের কার্যালয়ে সংঘ আয়োজিত কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তিত সুসংহত গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পে দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির পনেরোদিন ব্যাপী এক প্রশিক্ষণ শিবির শেষ হয়। মাধ্যমিক থেকে স্নাতক ডিগ্রিধারী ১০০ জন ছাত্রছাত্রী এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত বুদ্ধিজীবীরা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন।

আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে ১) গ্রামীণ উন্নয়নে ভারত সরকারের ভূমিকা এবং অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের পার্থক্য, ২) গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ভূমিকা, ৩) সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণে পঞ্চায়েতের ভূমিকা, ৪) ভূমিহীন কৃষক ও প্রান্তিক কৃষকের ভূমিকা, ৫) কৃষির উন্নয়ন ও খাদ্যশস্য উৎপাদনে কৃষকের ভূমিকা, ৬) জাতীয় সংহতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মিলন সংঘের সাধারণ সম্পাদক সরোজরঞ্জন কাঁড়ার জানালেন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৬ জন ছাত্রছাত্রীকে বাছাই করে সংঘের কর্মীরূপে মনোনীত করা হবে এবং এরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে স্বনির্ভর কর্মসূচির সার্থক রূপায়ণের প্রচেষ্টা চালাবে। □

স্বপনকুমার ঘোষ

গ্রাহক নিয়মাবলী

- 'পরিবর্তন' সাপ্তাহিক পত্রিকার মূল্য ৪.৫০ টাকা। প্রকাশিত হয় প্রতি বুধবার।
- বিশেষ সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না।
- বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার ১৮৪.০০ টাকা। ষাণ্মাসিক চাঁদার হার ৯৪.০০ টাকা। এই বিশেষ সুবিধা শুধুমাত্র এক বছরের জন্য।
- পত্রিকা 'আণ্ডার সার্টিফিকেট অব পোস্ট'-এ পাঠানো হবে। কোন কারণে 'বুক পোস্ট' করা পত্রিকা না পেলে আমরা দায়ী থাকব না।
- নিশ্চিতভাবে প্রতিটি সংখ্যা পেতে হলে রেজিস্ট্রি ডাকে পত্রিকা নিলে ভাল। সেক্ষেত্রে চাঁদার হার – বার্ষিক ৪৩৫.০০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ২১৮.০০ টাকা
- বার্ষিক চাঁদার হার (ভারতীয় মুদ্রায়)
  আমেরিকা ও কানাডা : ১২১০ টাকা (বিমান ডাকে)
  ইউরোপ : ১২১০ টাকা (বিমান ডাকে)
  মধ্যপ্রাচ্য : ১২১০ টাকা (বিমান ডাকে)
  বাংলাদেশ : ৪৩৫ টাকা (রেজিস্ট্রি ডাকে)
- বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য অতিরিক্ত রেজিস্ট্রি ডাকখরচ সব সময় দিতে হবে। আমাদের দপ্তর থেকে এই বিষয়ে আপনাকে আগেই জানানো হবে।
- আপনার চাঁদা টাকা M. O. বা Bank Draft করে পাঠাতে পারেন। পাঠাবার ঠিকানা :

Ityadi Prakasani Ltd.
33 Biplabi Anukul Chandra Street, Calcutta 700 072

বক্রেশ্বরে জল কোথায় যে তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র হবে ?

বীরভূমের সিউড়ি থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে মুথাবেড়িয়ার শালবনে সেদিন রাজকীয় কান্ড ঘটে গেল। সেদিনটা ছিল ২৮ সেপ্টেম্বর, বুধবার। শালবনের নিস্তব্ধতাকে খান্‌খান্‌ করে সাড়ম্বরে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু শিলান্যাস করলেন বহু বিতর্কিত বক্রেশ্বর তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের। জেলা তথা সারা রাজ্যের মানুষকে নতুন স্বপ্ন দেখান হল। জনগণের সাহায্যে গড়ে উঠবে বিরাট শিল্প। গড়ে উঠবে শিল্প উপনগরী। বেকাররা চাকরি পাবে। রাজ্যের অর্থনীতির ভিত দৃঢ়তর হবে।



ছবি : লেখক

মুখ্যমন্ত্রী বক্রেশ্বরে তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শিলান্যাস করছেন

এই তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের খরচ ধরা হয়েছে ১০০০ কোটি টাকা। প্রকাশ্য জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিলেন, যদি বিদেশি ঋণ পেতে কেন্দ্র সহযোগিতা না করে, তাহলে রাজ্য সরকার নিজেই এটি করবেন। রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী প্রবীর সেনগুপ্ত সিউড়ি সার্কিট হাউসে এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে ঘোষণা করে দিলেন, ১৯৯৩-৯৪ সাল নাগাদ এই তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ২১০ মেগাওয়াট ইউনিটের উৎপাদন শুরু হয়ে যাবে এবং বাদবাকি ইউনিটগুলি ছ'মাস অন্তর অন্তর উদ্বোধন হবে।

শিলান্যাস অনুষ্ঠানের ঠিক আগের দিন, অর্থাৎ ২৭ সেপ্টেম্বর, সিউড়ি সার্কিট হাউসে জেলা যোজনা ও সমন্বয় পর্ষদের একটি সভা হয়। ঐ সভায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং তাঁর মন্ত্রিসভার ১৭ জন মন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। সভায় জেলা প্রশাসন কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি চিত্র তুলে ধরেন। চিত্রটি এইরকম : চলতি সপ্তম যোজনায় বিশ্বব্যাঙ্ক বীরভূম জেলার খরাপ্রবণ এলাকায় পানীয় জল এবং কৃষি সেচের জলের জন্য ৫০টি গভীর নলকূপ ও ১৫০০টি অগভীর নলকূপ বসানোর প্রকল্প অনুমোদন করেছেন। টাকার অভাব নেই। তবুও গত সাড়ে তিন বছরে বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে মাত্র একটি এবং অগভীর নলকূপ বসানো হয়েছে মাত্র ৪০০টি। কারণ, ওইসব নলকূপ বসানোর জন্য যোগ্য ড্রিলিং এজেন্সি নাকি পাওয়া যায়নি।

পাঞ্জাব স্টেট টিউবওয়েলস কর্পোরেশন নামে একটি সংস্থা এতদিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ বসিয়ে আসছেন। কিন্তু জেলা কৃষি সেচ বিভাগের ওদের কাজ পছন্দ নয়। তাই ওই সংস্থাকে নতুন করে কাজ দেওয়া হয়নি। অথচ সেচ বিভাগ নিজেও বসাতে পারেনি। কারণ, জেলা কৃষি সেচের বিভাগীয় অফিসটি বহরমপুরে। তাঁরা সিউড়ি নিয়ে মাথা ঘামাতে পারেননি।

অথচ বক্রেশ্বরের ওই তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ জল আর কয়লা। বীরভূম এমনিতেই খরাপ্রবণ এলাকা বলেই চিহ্নিত। পানীয় বা সেচের – সবরকম জলেরই অভাব। তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য যে পদ্ধতিতে এখন জল সংগ্রহ করা হবে বলে ভাবা হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে বিস্তর।

বক্রেশ্বরের তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি যেখানে হচ্ছে তার আশেপাশে কোথাও নদী নেই। এমনকি বক্রেশ্বর নদীও অনেক দূরে। ওই এলাকার অন্তত ৪ কিলোমিটার দূর দিয়ে গেছে ময়ূরাক্ষী বাঁধের ক্যানেল। তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় ওই বিপুল পরিমাণ জল ওই বাঁধকে সম্প্রসারিত করে সংগ্রহ করতে হবে।

জনৈক বিদ্যুৎ বিশেষজ্ঞের মতে, একটি ২১০ মেগাওয়াট তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য জলের প্রয়োজন ঘন্টায় ৬ হাজার গ্যালন। এখন ৮৪০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন প্রস্তাবিত ওই তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য যদি গভীর নলকূপ বসিয়ে জল সংগ্রহ করতে হয় তাহলে ঐ জেলার মাটির তলার জলভান্ডার যে নিঃশেষিত হয়ে যাবে এ আশঙ্কা অমূলক নয়। বিশেষজ্ঞটি আরও জানিয়েছেন, খরাপ্রবণ ঐ জেলার মাটির তলার জলস্তরে যে জল রয়েছে তা যদি টেনে তোলা হয় তাহলে সেচের জন্য ব্যবহৃত নলকূপগুলিতেও জল পাওয়া যাবে না। ষষ্ঠ যোজনায় বিশ্বব্যাঙ্কের অনুদানে যে ৫০টি গভীর নলকূপ বসানো হয়েছিল তার মধ্যে এখন ৪৪টি অকেজো হয়ে পড়ে আছে।

সত্তর দশকে তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখার্জি বীরভূমের খয়রাসোল ব্লকের কাঁকরতলায় এরকম একটি তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শিলান্যাস করেছিলেন। বলা বাহুল্য তারপর সেখানে একটি ইঁটও গাঁথা হয়নি। কিন্তু কাঁকরতলায় তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র হলে প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত জল যেমন ময়ূরাক্ষীর হিংলো বাঁধ থেকে পাওয়া যেত তেমনি কাঁকরতলার আশপাশ থেকে কয়লাও পাওয়া যেত।

এদিকে প্রণব মুখার্জিকে আবার কংগ্রেসে ফিরিয়ে নেবার পরদিন থেকে তিনি বীরভূমের বিভিন্ন গ্রামে পদযাত্রা করে আবার সেই পুরনো কাঁকরতলায় তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের যৌক্তিকতা গ্রামের মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। এমনকি এও বলা হচ্ছে, ঠিক আছে, বক্রেশ্বরে যদি রাজ্য সরকার তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র করেন তো করুন, এন টি পি সি তাহলে খয়রাসোলে বহু প্রতীক্ষিত তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্থাপন করুক।

কিন্তু জলের সমস্যাই একমাত্র সমস্যা নয়। আছে কয়লার যোগানের সমস্যাও। বক্রেশ্বর তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় সব কয়লা আনতে হবে রানীগঞ্জের খনি থেকে। কিন্তু তা আনতে গেলে যে রেল ও সড়ক যোগাযোগ দরকার তা এখনও এ অঞ্চলে হয়নি। কিন্তু তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শিলান্যাস হয়ে গেল।

রাজ্য ক্ষুদ্র শিল্প নিগমের চেয়ারম্যান সংসদ সদস্য সোমনাথ চ্যাটার্জি ২৭ সেপ্টেম্বরের জেলা যোজনা সমন্বয় পর্ষদের সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, পাঁচামি থেকে মল্লারপুর রেল লিঙ্ক স্থাপনের প্রস্তাব তিনি ইতোমধ্যে রেল দপ্তরকে দিয়েছেন। কিন্তু রেল দপ্তর নাকি বলেছে, এটি রাজ্য সরকার করুক। এদিকে ভূ-সমীক্ষা

বিভাগ ওই অঞ্চলে ভূগর্ভে প্রচুর কয়লার ভান্ডার আবিষ্কার করেছেন। শুধু কয়লা নয়, চীনামাটি, পাথরের কোয়ারিও রয়েছে। তাই রেল দপ্তর যদি সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনের সঙ্গে মল্লারপুর-পাঁচামি রেল সংযোগ স্থাপন করে দেয় তাহলে এই অঞ্চলের আর্থ সামাজিক উন্নতিও হবে। সড়কপথে আসানসোল-রানীগঞ্জ যোগাযোগের জন্য ভীমগড়ে অজয় নদের ওপর একটি ব্রিজেরও দরকার। এটি হলে কাঁকরতলার খনির কয়লা সড়কপথে বক্রেশ্বরে আনা যেতে পারে। সেদিনের সভায় অবশ্য অজয় নদের ওপর ব্রিজ তৈরির প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে।

সেদিনের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে আড়ম্বর, প্রচার, প্রতিশ্রুতির ঘাটতি ছিল না কিছুই। পূর্ণ মন্ত্রিসভার একটা বৈঠকও হয়ে গেল ঢাক-ঢোল পিটিয়ে। তবুও বীরভূমের মানুষের চোখে সন্দেহের ভ্রুকুটি রয়েই গেছে। অনুক্ত থেকে গেছে অনেক প্রশ্নের জবাবও। সন্দেহ দানা বেঁধেছে ২৭ সেপ্টেম্বরের সিউড়ি সার্কিট হাউসের জেলা যোজনা ও সমন্বয় পর্ষদের বৈঠকটি ঘিরেই। স্বাভাবিক কারণেই গুরুত্বপূর্ণ ঐ সভার এজেন্ডা ছিল বক্রেশ্বর তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন। কারণ ঐ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ওপরই জেলার উন্নয়নের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। বিশেষত ডি পি সি সি-র ঐ সভায় যখন রাজ্যের পূর্ণ মন্ত্রিসভা হাজির তখন ওটাই সভার মূল আলোচ্য বিষয় হবে এ বিষয়ে কোন বিতর্ক থাকার কথা নয়। ঐ সভায় উপস্থিত সব সদস্যেরও তাই ধারণা ছিল। সভা আরম্ভ হল। আলোচনা হল। সভা একসময় শেষও হল। কিন্তু বক্রেশ্বর তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে একটি লাইনও বৈঠকে আলোচনা হল না। যোজনা ও সমন্বয় পর্ষদের সদস্যরা বিস্ময়ে হতবাক। সবাইকে বোকা বানিয়ে অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত ঘোষণা করে দিলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল শিলান্যাস অনুষ্ঠানে এ ব্যাপারে যা বলার বলবেন।'

সভায় আলোচনা হল না কেন সরকারি অকর্মণ্যতায় সাড়ে তিন বছরেও বিশ্বব্যাঙ্কের প্রকল্প অনুযায়ী গভীর নলকূপ এবং অগভীর নলকূপগুলি বসানো গেল না। দীর্ঘ আড়াই ঘন্টা বৈঠকের পরে অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত সাংবাদিকদের কাছে যে রিপোর্ট পেশ করেন, তাতেও নলকূপ বসানোর ব্যর্থতার বিষয়টি একেবারেই উল্লেখ করা হল না। বীরভূম জেলাকে চলতি বছরের যোজনায় যে ৩৭ কোটি টাকা অনুদান দেওয়া হবে এবং সেটা এ রাজ্যের ব্লক পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি অনুদান, এ কথাটাই অসীমবাবু বলেছেন বার বার। অবশ্য ওই বৈঠকে উপস্থিত প্রায় ২০০ সদস্যকে জেলার সার্বিক সমস্যা সংক্রান্ত যে খসড়া ইস্তাহারটি দেওয়া হয় তাতে নলকূপ সংক্রান্ত বিষয়টির উল্লেখ ছিল।

এমনকি খসড়া ইস্তাহারে বলা হয়েছিল, বক্রেশ্বরের প্রস্তাবিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশে তাপসপুরে ২০০ একর জমি নিয়ে একটি শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা হবে যার পরিকল্পনা করবেন পশ্চিমবঙ্গ শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন কর্পোরেশন। এ বিষয়টি নিয়েও ২৭ সেপ্টেম্বরের সভায় কোন আলোচনা হয়নি। অথচ জেলা কর্তৃপক্ষ দুবরাজপুর থানার ঐ এলাকায় কী কী শিল্প স্থাপন হবে, কটা বড়, কটা ছোট শিল্পের প্লট থাকবে তাও ঠিক করে ফেলেছিলেন। ঠিক হয়েছিল, তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উপযোগী সবরকম শিল্পকেই ওখানে স্থান করে দেওয়া হবে, যাতে শিল্পপতিরা এখানে এসে সহজেই কারখানা গড়ে তুলতে পারেন। যেসব শিল্প স্থাপনের কথা জেলা কর্তৃপক্ষ ভেবেছিলেন সেগুলি হলঃ ১। মেশিন শপ, ২। জেনারেল ফেব্রিকেশন, ৩। নন ফেরাস সি আই ফাউন্ড্রি, ৪। ইলেক্ট্রিকাল রিপেয়ার শপ, ৫। রঙ ৬। রাবার মোল্ডিং শপ, ৭। হার্ডওয়ার, ৮। পি ভি সি ওয়ার অ্যান্ড কেবলস, ৯। হ্যান্ড গ্লাভস/ইউনিফর্ম ১০। হেলমেট ১১। প্রিন্টিং প্রেস ১২। কার্বন বৃশ ইত্যাদি। এছাড়া অটোমোবাইল রিপেয়ারিং ওয়ার্কশপ, টায়ার-রিট্রেডিং, বেকারি, স্টিল ফার্নিচার, ব্যাটারি এসব তো রয়েছেই।

তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র হবে কি হবে না তার আগেই সহযোগী শিল্পের পরিকাঠামোটি ভাবা হয়ে গিয়েছে। অন্তত একটা জিনিস স্পষ্ট যে, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের অন্য তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আশেপাশে এগুলো আগে কখনও গড়ে তোলার চেষ্টা হয়নি। ফলে সাঁওতালডি কেন্দ্রের জন্য বর্তমানে একটি নাটবল্টু কিনতেও ৪০ মাইল পথ ভেঙে আসানসোল ছুটতে হয়।

জেলার মানুষের মনে সন্দেহ এ কারণেই। পর্ষদের বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আলোচনা হল না কেন? রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা, তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি যেখানে গড়ে তোলা হচ্ছে সে স্থানটি নিয়ে অনেকের মনে অনেক প্রশ্ন থাকায় তা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়েছে। সন্দেহ রয়েছে জল ও কয়লার যোগান নিয়ে। জেলার বিশ্বজ্জনের মনে ঐ প্রকল্প সম্পর্কে সরকারি প্রতিশ্রুতিগুলি তাই কোন দাগ কাটতে পারেনি।

সেদিনের শিলান্যাস অনুষ্ঠানের আয়োজনের ত্রুটি ছিল না কোন ব্যাপারেই। এর অনেক আগে সিউড়ি সার্কিট হাউসে রাজ্যের পূর্ণ মন্ত্রিসভার বৈঠক হয়েছিল। তখন স্থির হয়েছিল, মন্ত্রিসভা জেলায় জেলায় গিয়ে বৈঠক করবেন। এর প্রথম এবং শেষ বৈঠকটিও হয় এই সিউড়িতেই। তখন পুরনো সার্কিট হাউস ভেঙে নব রূপ দেওয়া হয়। এবার মুখ্যমন্ত্রী দোতলায় উঠতে পারবেন না বলে একতলার ঘরগুলিকে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত করা হয়। জেলা প্রশাসন সমস্ত বাস-ট্রাক রিকুইজিশন করে মিটিং-এর জন্য লোক সংগ্রহ করেছিল। মুথাবেড়িয়া এবং সিউড়িতে দুটি মঞ্চ তৈরি করে জনসভা করা হয়েছে সরকারি খরচে। এই বিপুল আয়োজনে সরকারের কত লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে তা বোধহয় সরকারের কোন একটি নির্দিষ্ট দপ্তর হিসেব দিতে পারবে না। কলকাতা থেকে মন্ত্রীরা গিয়েছেন, তার মানে সঙ্গে অফিসার, সচিবদেরও যেতে হয়েছে। গোটা জেলা প্রশাসনকেও দুদিন ধরে সিউড়িতেই ঘাঁটি গাড়তে হয়েছে। মহড়াটা ছিল একেবারে যুদ্ধকালীন – কিন্তু জনমনে তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে সন্দেহটা রয়েই গেছে।

সন্দেহের ব্যাপারটা সরকারি কর্তাদেরও অজানা নয়। বিশেষ করে তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জল নিয়ে যে বিস্তর জল ঘোলা হচ্ছে তাও সরকারি কর্তাদের কানে জল ঢুকিয়েছে। গত ৪ অক্টোবর বিধানসভার এস্টিমেট কমিটির বৈঠকে বক্রেশ্বরে ময়ূরাক্ষীর জল এনে বাঁধ দিয়ে জল ধরে রাখার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে।

এমনও স্থির হয়েছে যে, ময়ূরাক্ষীর জলকে ক্যানেলে করে এনে বক্রেশ্বরে একটি বাঁধ করে তা ধরে রাখা হবে। এবং যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন ৬টি গভীর নলকূপ বসিয়ে তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় জলের যোগান দেওয়া হবে। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক ননী কর।

১৯৮৬-৮৭ সালের বার্ষিক আর্থিক বাজেটে বীরভূম জেলার জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছিল প্রায় ২৬ কোটি টাকা। '৮৭-'৮৮-তে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩০ কোটি টাকার ওপর। এবার হয়েছে তা ৩৭ কোটি টাকা। মোট রাজ্য বাজেট এবার ১০০০ কোটি টাকার। অর্থমন্ত্রী অসীমবাবু বীরভূমের মাত্র ১১টি ব্লকের দিকে তাকিয়ে যে যোজনা বরাদ্দের কথা বলেছেন, তাতে জেলার মানুষেরা খুব একটা উৎসাহী নন। বরং যে অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে তাতে কতটা কাজ হচ্ছে কিংবা খরচ না হওয়ায় কত টাকা ফিরে যাচ্ছে এটা জানতেই বেশি আগ্রহী। অসীমবাবু বোঝাতে চেয়েছিলেন, রাজ্যের অন্যান্য ব্লকের তুলনায় বীরভূমের ১৯টি ব্লকে ৪০ লক্ষ টাকা করে বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। অর্থাৎ যেখানে অন্য ব্লকে ১.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে সেখানে বীরভূমের ব্লকগুলিতে ১.৯০ কোটি টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে।

যাই হোক, শিল্পবিহীন, শুষ্ক, অনুন্নত এই বীরভূম জেলার মানুষ যে রাজ্য সরকারের এই সমস্ত বদান্যতায় হাতে চাঁদ পাচ্ছেন না এটা বুঝতে পেরেছেন। আক্ষরিক অর্থে কিছু অর্থ এবারের বাজেটে যে বেড়েছে এটা যেমন ঠিক তেমনি প্রশাসনিক অকর্মণ্যতায় সরকারি ও বিদেশি সাহায্যের কোটি কোটি টাকাও যে ফেরত যাচ্ছে এ তথ্যও তাঁদের অজানা নয়। □

অমলেন্দু কুন্ডু

আশার ভালবাসা – কলকাতা

নিউ থিয়েটার্স অর্থাৎ টালিগঞ্জের এন টি ওয়ান স্টুডিওর স্কোরিং রুমে সাংবাদিকরা অপেক্ষা করছেন এক বিশেষ মহিলার জন্য। মাঝেমাঝেই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত স্কোরিং রুমে মৃদু গুঞ্জন – এই বুঝি তিনি এসে পড়লেন। 'চারুচিত্র'-র ডাকা এই সাংবাদিক সম্মেলন শুরু হওয়ার কথা ছিল ঠিক পাঁচটায়। পরিচালক বীরেশ চ্যাটার্জি এবং গীতিকার-সুরকার স্বপন চক্রবর্তীকে সংগে নিয়ে দরজা ঠেলে ঝড়ের বেগে স্কোরিংরুমে প্রবেশ করলেন সেই বিশেষ মহিলা, আশা ভোঁসলে। প্রথমেই হাত জোড় করে ভাঙা বাংলাতে সাংবাদিকদের বললেন, 'আপনাদের ওনেকটা সময় ওপেক্ষা করে থাকতে হল বলে ক্ষমা করবেন।'

বিমল মিত্রের উপন্যাস 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব) চলচ্চিত্রে রূপায়িত করছেন পরিচালক বীরেশ চ্যাটার্জি। 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'-এর গান রেকর্ডিং-এর জন্য স্বপনবাবুর অনুরোধে বোম্বাই থেকে সটান কলকাতায় এসে হাজির হয়েছিলেন আশা। কলকাতায় দুটো গান রেকর্ডিং করা হল : (১) 'এমনও যামিনী মধুর চাঁদিনী', (২) 'ফুটেছে যে একটি গোলাপ'। এই ছবির গীতিকার-সুরকার স্বপনবাবু বললেন, 'রেকর্ডিংটা বোম্বাইতেও করা যেত। কিন্তু হঠাৎ আশাজী জেদ ধরলেন, না, কলকাতায় গিয়েই গানগুলো রেকর্ডিং করব।' স্বপনবাবুর মুখ থেকে কথা কেড়ে এবার আশা বললেন, 'বম্বে-লণ্ডন-নিউইয়র্ক যেখানেই যাই না কেন কলকাতায় আসার সুযোগ পেলে একটা অন্যরকমের আনন্দ পাই। কেন জানেন? আমার বাবা বেশ কিছুদিন কলকাতায় কাটিয়েছিলেন। তন্ত্রসাধনা করার জন্য কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে যাতায়াতও করতেন তিনি। আমার ছেলে-মেয়েরা বলে, তুমি যে অত কলকাতা-কলকাতা কর, কী আছে ওখানে? আমি ওদের বলি, কলকাতায় কী আছে সেটা তোরা বুঝবি না।'

স্বপনবাবু আশাকে বললেন, 'নিউ থিয়েটার্সের এই ঘর থেকেই চলচ্চিত্রে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের জন্ম।' স্বপনবাবুর কথা শুনে হলঘরের চারদিকটা একবার তাকিয়ে নিলেন আশা। ওঁর চোখে-মুখে গভীর শ্রদ্ধার ভাব। ছবিতে লক্ষ্মী অর্থাৎ অপর্ণার গলায় যে দুটো গান আশা গেয়েছেন সাংবাদিকদের অনুরোধে গুনগুন করে গেয়ে শোনালেন। তারপরই বললেন, 'এ ঘরে বসে গান গাইছি। মনটা উদাস হয়ে যাচ্ছে। নিজেকে ভাগ্যবান বলেও মনে করছি। জানেন, ছোটবেলায় বাবার সংগে নিউ থিয়েটার্সে বারকয়েক এসেছি। আজ যখন স্টুডিওর গেট দিয়ে ঢুকছি, পুরনো দিনের অনেক কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে।'

'কড়ি দিয়ে কিনলাম'-এর গান দুটো গেয়ে খুশি হয়েছেন বলে জানালেন আশা। নানা কথাপ্রসংগে বিয়ের পর নিজের আর্থিক দুর্গতির কথাও স্মরণ করলেন। বললেন, 'স্বামী একশো টাকা মাইনের একটা চাকরি করতেন। এটা আনতে ওটা ফুরতো, ওটা আনতে এটা। অর্থের তাগিদেই গান গাওয়া শুরু করেছিলাম।' হেমন্ত মুখার্জি এবং সন্ধ্যা মুখার্জির গানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে আশা বললেন, 'ওঁদের মত শিল্পী হয় না।' এরপরই আশা মুচকি হেসে বললেন, 'একসময় চুটিয়ে প্রেমও করেছি। তখন হেমন্তদার একটা বিখ্যাত গান 'আঁচল সে কিঁউ বাঁধ লিয়ে' বাজারে খুব চলছে। যার সংগে ভালবাসা ছিল যখনই দেখা হত ঐ গানটা গেয়ে শোনাতাম ওঁকে। আর আমার দিদি লতাই সন্ধ্যার সংগে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল।' আশাকে প্রশ্ন করেছিলাম, 'আপনি কার ফ্যান?' একটুও সময় না নিয়ে আশা বললেন, 'বড়ে গুলাম আলি এবং কিশোরকুমার। কিশোরকুমারের মত প্রতিভাধর শিল্পী খুব কমই জন্মেছেন।' আশা ছাড়া 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'-এর গান গেয়েছেন লতা মংগেশকর, অমর পাল, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, হৈমন্তী শুক্লা এবং অরুন্ধতী হোমচৌধুরী। ছবির টাইটেল-সঙ অমর পালের। রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথা উঠল। স্বপনবাবুর সংগে সংগে আশাও তারিফ করে বললেন – 'ওঁর গান তন্ময় হয়ে শুনেছি'।



ফটো : অভিজিৎ হালদার

কলকাতা ও বোম্বাইয়ের রেকর্ডিং সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে আশা বললেন, 'বম্বের রেকর্ডিং আরও উন্নতমানের। কলকাতায় যে কয়েকটা রেকর্ডিং সেন্টার হয়েছে সেগুলোও খারাপ নয়। তবে এখানে আধুনিক ইকুইপমেন্টসের অভাব।' ইদানীং ফিল্মি ও নন-ফিল্মি গানগুলো কেমন হচ্ছে – প্রশ্নটা করতেই আশার ঝটিতি উত্তর, 'কিছুদিন আগেও বাংলা-হিন্দি এবং অন্য ভারতীয় ভাষায় গানে বাণী ছিল, সুর ছিল, ভাব ছিল। পুরনো গানগুলোর তো কোন তুলনাই হয় না। এখনকার গানে সেই বাণী ও সুর কোথায়? তবে কিছু কিছু ব্যতিক্রম যে নেই তা বলব না।'

আশার গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে অনেকেই অনেক কথা বলেন। এ ক্ষেত্রে বিরূপ সমালোচনার পাল্লাটাই ভারি। এ সম্পর্কে আশার নিজের ধারণা কী জানতে চেয়েছিলাম। প্রশ্ন শুনে মৃদু হাসলেন আশা। বললেন, 'আমার কানেও বিরূপ সমালোচনার ব্যাপারটা এসেছে। এ সম্পর্কে একটা কথাই আমি বলব, আমি বাঙালি নই। আধুনিক গানের কথাগুলো স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করার চেষ্টা করি। রবিঠাকুরের কথা যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে উচ্চারণ করার চেষ্টা করেছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কথা হয়তো পরিষ্কার হয়নি। আসলে আমার চেয়ে অনেক অনেক ভাল রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছেন অনেক গায়ক-গায়িকাই।'

বেশ কয়েকটা বাঙালি খাবার রাঁধতে পারেন আশা। এ প্রসংগে রবিশংকরকে পায়েস ও নারকোল-চিংড়ি রেঁধে খাওয়ানোর কথা বললেন তিনি। বেশ কিছুদিন বিদেশে কাটিয়ে বোম্বাই ফিরে এসে এক গুজরাতি পরিবারের অতিথি হয়েছিলেন রবিশংকর। আশাকে একদিন ডেকে বললেন, ওসব খাবার খেতে আর পারছি না আশা। বাঙালি রান্না খাওয়াও। 'কী করি কী করি, ফ্রিজ খুলে দেখলাম অল্প একটু খেজুর গুড় পড়ে আছে। ঐ দিয়েই পায়েস বানালাম। নারকোল-চিংড়ি রাঁধলাম। খেয়ে দারুণ খুশি হয়েছিলেন রবিশংকরজী' – কথাগুলো বলতে বলতে আশা ভোঁসলের কণ্ঠস্বর আনন্দে প্রায় রুদ্ধ হয়ে আসছিল।

লতা এবং আশা সম্পর্কে অনেক গায়িকারই একটা অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে হিন্দি গান গেয়ে বোম্বাইতে কেউ

প্রতিষ্ঠা পান এটা নাকি তাঁরা কখনোই চান না। একবার আশা সম্পর্কে কলকাতার এক প্রতিষ্ঠিত গায়িকা এই প্রতিবেদককে অভিযোগের সুরেই বলেছিলেন, 'লতাজী সম্পর্কে কিছু বলব না, কিন্তু আশা ওঁর পাশাপাশি অন্য কাউকেই আসতে দিতে চান না।' এ সম্পর্কে আশাকে প্রশ্ন করতেই উল্টে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'পলিটিক্সের কথা বলছেন? না, আমার তা মনে হয় না। ইদানীং অনেক নতুন মেয়েই তো অসংখ্য গান গাইছেন। এই যেমন ধরুন অনুরাধা পাড়োয়াল, সাধনা সরগম, আলিসা চিনাই। আসল ব্যাপারটা হল, সংগীত পরিচালকেরা কোন কোন গানের জন্য আমাকে উপযুক্ত বলে মনে করেন। আবার তাঁরাই কখনো আমাকে বাদ দিয়ে দিদি বা অন্য কাউকে নেন। কেউ যদি অভিযোগ করেন, আমি পলিটিক্স করি তাহলে বলব তিনি বাজে কথা বলছেন।'

এখনকার সংগীত-পরিচালকদের মধ্যে রাহুল দেব বর্মনকেই সবচেয়ে প্রতিভাবান বলে মনে করেন আশা। বললেন, 'পঞ্চম আমার স্বামী। কিন্তু আমি একজন গায়িকাও। স্ত্রী হিসেবে নয়, গায়িকার অধিকার নিয়েই বলছি ওঁর কোন তুলনা নেই।' স্বামী হিসেবে রাহুল কেমন? আশা প্রথমটায় বেদম হেসে নিলেন। তারপর হাসি চাপতে চাপতেই বললেন, 'ওতো শিশুর মতই সরল। উসে হরসময় সামালনা পড়তা হায়।'

সুমন গুপ্ত

পার্বতীর স্মৃতিতে দেবদাস

পার্বতীর মুখে দেবদাসের কথা শোনা দুর্লভ ঘটনা। আমরা সে সুযোগটা পেলাম 'চিত্রসাথী'র দৌলতে। নতুন এই চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিবেশন সংস্থাটির অফিস উদ্বোধন উপলক্ষে, মহালয়ার দিনে। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর ম্যাজেনাইন ফ্লোরের একটি ছোট্ট ঘরে পার্বতীর মুখোমুখি হলাম। শুভ্রবসনা পার্বতী তখন এক ঝাঁক সুন্দরী পরিবৃতা। পরিচয়টুকু নিবেদন করতেই পার্বতী হৈ হৈ করে উঠলেন। সরবে জানিয়ে দিলেন তিনি খবরের কাগজে কোন ইন্টারভিউ দেন না। সেই সংগে জানিয়ে দিলেন খবরের কাগজের লোকদের সংগে কথা বলায় তাঁর অনীহার কথা। উপস্থিত সুন্দরীরা পার্বতীর সুরে সুর মেলালেন। আমি এবং আমার সহকর্মী সমরেন্দ্র তখন চক্রব্যূহে সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যুর দশা। অবশ্য পার্বতীই তখন উদ্যোগী হয়ে বরফ গলালেন এবং আলোচনার দরজা খুলে দিলেন।

পার্বতীর সংগে আলোচনার নির্যাস নিবেদনের আগে পার্বতীর পরিচয়টুকু দেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। এই পার্বতী ব্যক্তিগত জীবনে বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম পথিকৃৎ প্রমথেশ বড়ুয়ার ঘরণী. যমুনা বড়ুয়া যিনি সে যুগের দেবদাস ছবিতে পার্বতীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। সেই সূত্রেই ওঁকে পার্বতী বলা এবং বড়ুয়া সাহেবকে দেবদাস।

'খবরের কাগজের লোকদের সংগে কেন কথা বলি না জানেন?'

কেন? সবিনয়ে জানতে চাইলাম।

'ইন্টারভিউ নেওয়ার সময় এমন ছেলেমানুষের মত প্রশ্ন করে–'

যেমন?

'যেমন – বড়ুয়া সাহেবের সংগে আপনার কবে বিয়ে হয়েছিল? কিভাবে বিয়ে হয়েছিল? আচ্ছা বলুন তো, এটা তো নেহাতই ব্যক্তিগত ব্যাপার। এটা জেনে কী লাভ হবে? আর এটা থেকে কি বাংলা চলচ্চিত্রে প্রমথেশ বড়ুয়ার অবদানের কথা জানা যাবে?'

বললাম, ঠিক আছে, ব্যক্তিগত প্রসংগ থাক। বড়ুয়া সাহেবের কথা বলুন, দেবদাসের কথা শুনি। শুভ্রবসনা পক্বকেশী পার্বতী মুহূর্তের জন্য আনমনা হয়ে অতীতে ডুব দিলেন। স্মৃতির মণিকোঠা থেকে একে একে বার করতে লাগলেন টুকরো টুকরো স্মৃতি।

'পার্বতী গ্রামের মেয়ে। আর তখনকার দিনে গ্রামের মেয়েরা তো ব্লাউজ পরতো না। খালি গায়ে শাড়ি জড়িয়ে ঘুরে বেড়াত। পার্বতীর ভূমিকা করতে হলে তো খালি গায়ে অভিনয় করতে হবে। আমার তাতে খুব আপত্তি ছিল। আমি বড়ুয়া সাহেবকে বললাম, আমি খালি গায়ে অভিনয় করতে পারব না। বড়ুয়া সাহেব বললেন, ঠিক আছে তোমায় খালি গায়ে অভিনয় করতে হবে না। আমি তোমার জন্য সেমিজের ব্যবস্থা করে দেব। সেই সেমিজ পরেই আমি অভিনয় করেছি।'

এই সময় 'শেষ উত্তর' ছবির একটি সংলাপ বলে যমুনা দেবীর স্মৃতিটাকে একটু উস্কে দিয়ে বললাম, বড়ুয়া সাহেব তো সংলাপের ব্যাপারে ভীষণ সচেতন ছিলেন এবং সংলাপ উচ্চারণের ব্যাপারেও –

'হ্যাঁ, দেবদাস ছবি করার সময় তিনি শরৎবাবুকে বলেছিলেন, আমি কিছু কিছু সংলাপ একটু পরিবর্তন করতে চাই। আপনার অনুমতি প্রয়োজন। শরৎবাবু বলেছিলেন, আপনি আপনার সুবিধামত করে নিন না। কোন অসুবিধা হবে না। তিনি সেভাবেই কিছু কিছু সংলাপ পরিবর্তন করে নিয়েছিলেন। তারপর দেবদাস ছবি দেখে শরৎবাবু বড়ুয়া সাহেবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছিলেন, 'আপনি তো দেবদাসকে দারুণ ইমোশানাল করেছেন।'

আপনি চলচ্চিত্রের সংগে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিলেন কেন? কোন অভিমানে? কোন ক্ষোভে? এই প্রশ্নের উত্তরে বড়ুয়া ঘরণী আবেগপ্রবণ হয়ে বললেন, 'না, বাপু আমার কোন ক্ষোভ নেই। আর অভিমান করব কার ওপর? যিনি আমায় চলচ্চিত্রের জগতে নিয়ে এলেন, যিনি আমার সংগী এবং যিনি আমার আশ্রয় তিনিই যখন চলে গেলেন, তখন আর কীসের জন্যে এই জগতে থাকব? তাছাড়া সিনেমা করতে হলে তখন আমায় বোম্বে যেতে হত। অফারও পেয়েছিলাম হিন্দি উচ্চারণ ভাল ছিল বলে। কিন্তু সেখানে গিয়ে কার খপ্পরে পড়ব, কার হাতের পুতুল হব – এ ব্যাপারে ভয় ছিল। তাই সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে সন্তানসন্ততি মানুষ করার দিকে নজর দিয়েছি।'

সব ছেড়েছুড়ে দিলেও যমুনা দেবী ছায়াছবি দেখেন। তবে হলে গিয়ে নয়, টিভিতে ছোট পর্দায়। এখনকার অভিনেত্রীদের প্রসংগে মজার কথা শোনা গেল তাঁর মুখে। 'আমাদের সময়ে আলতায় পাউডার গুলে আমরা মুখে মাখতাম। মেক-আপের তো তখন খুবই দুরবস্থা। আর এখন তো মেক-আপের কল্যাণে সবাই সুন্দরী, সবাই দেখি নাচতে গাইতেও পারে। আমরা বাপু এতটা পারতুম না।'

তবে যমুনা দেবীর একেবারেই কোন ব্যাপারে কোন ক্ষোভ নেই তা নয়। ক্ষোভ আছে। সে ক্ষোভ অনেকটাই চলচ্চিত্র শিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ প্রমথেশ বড়ুয়ার প্রতি বর্তমান প্রজন্মের শ্রদ্ধার অভাবের জন্য, তাঁর শিল্পকর্মের যথাযথ মূল্যায়ন না হওয়ার জন্য। অথচ এই পথিকৃৎ তাঁর জীবনের সর্বস্ব ঢেলে দিয়েছিলেন এই শিল্পের উন্নতির জন্যে। যমুনা দেবী জানালেন, এই প্রজন্মের অনেকেরই হয়তো জানা নেই যে বড়ুয়া সাহেবই প্রথম কৃত্রিম আলোয় চলচ্ছবি তোলার ব্যাপারে অগ্রণী হন। সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রথম শুরু করেন তাঁর বালিগঞ্জের বাড়িতে।

'বড়ুয়া সাহেব শুধু চলচ্চিত্র তৈরি করেননি, তৈরি করেছেন অভিনেতা-অভিনেত্রী, কলাকুশলী এবং পরিচালক। তাঁরই হাতে তৈরি হয়েছেন বিমল রায়, নীরেন লাহিড়ি এবং সুশীল মজুমদারের মত পরিচালক, যাঁরা পরবর্তীকালে বাংলাদেশকে উপহার দিয়েছেন অনেক স্মরণীয় চলচ্চিত্র। বলুন তো এমন মানুষ এখন কোথায়? খুঁজলে কি পাওয়া যায়?'

ঊষা ভৌমিক

মধুবন-এ অলি আছে মাধুর্য নেই

একদল চলচ্চিত্রকার আছেন যাঁদের সাধ অনেক কিন্তু সাধ্য নেই। এঁদের কাছে দর্শকরা বিশেষ কিছু প্রত্যাশা করেন না। কিন্তু কিছু চলচ্চিত্রকার রয়েছেন যাঁরা ছবি তুললে দর্শকদের প্রত্যাশা বেড়ে যায়। তাঁরা যদি হতাশ করেন তবে সে হতাশা কখনও একটু বেশি মাত্রায় প্রকাশ হয়ে পড়ে। আসলে আক্রমণ করতে গেলে যিনি আক্রান্ত হবেন তাঁর সাধ্য সামর্থ্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত থাকা উচিত। সেই বোধ থেকে প্রথমেই জানিয়ে রাখা ভাল অজয় কর-এর চলচ্চিত্র ভাবনার পারিপাট্য বিশেষ করে ক্যামেরার ব্যবহার সম্পর্কে সাধারণভাবে প্রশ্ন তোলার কোন অবকাশ থাকে না। কিন্তু তিনি তাঁর সর্বশেষ ছবি 'মধুবন' তুলতে গিয়ে তাঁর সুনামের পূর্ণ মর্যাদা রাখতে পারেননি। ফলে ক্ষোভ থেকেই যায়। কিন্তু এখন আর এ ক্ষোভ তাঁকে স্পর্শ করবে না। তিনি এখন আমাদের মধ্যে নেই।

আলোচ্য ছবিটির প্রযোজক বামফ্রন্ট সরকার। সম্ভবত এই কারণেই প্রয়াত অজয় করের এই চিত্রভাবনা কিছুটা 'রেজিমেন্টেড' হয়ে পড়েছিল। নতুবা তিনি গৌরচন্দ্র চক্রবর্তীর এমন একটি সাধারণ মানের কাহিনী নিয়ে ছবি তুলতে সম্মতই বা হবেন কেন? এই কাহিনী নিয়ে সলিল সেন যে চিত্রনাট্য গড়ে দিয়েছেন তা তথাকথিত প্রোগ্রেসিভ ফিল্ম-এর নিগড়ে এমনভাবে বাঁধা পড়ে গেছে যে বনস্থলীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য ছাড়া অন্যত্র স্বাভাবিক নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পায়নি।

ছবিটির গতিমুখে দুটি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। প্রথমটি হল বে-আইনিভাবে বনের গাছ চুরি, যার সংগে যুক্ত রয়েছে রেঞ্জার সাহেবের অফিসের কিছু কর্মী এবং কন্ট্রাক্টর। অন্যটি হল আদিবাসী-শোষণ। এই দ্বিবিধ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে এসে কাহিনীর নায়ক এমন একজন নীরব সমর্থককে খুঁজে পেলেন যিনি যে সংস্থার বিরুদ্ধে লড়াই তার মালকিন। এছাড়া পেলেন আদিবাসী সমাজের এক তরুণ লোককবি ও শিক্ষক লগনকে। আগের রেঞ্জার সাহেবও সপরিবারে নতুন সাহেবের সংগে ছিলেন।



তবে তিনি তাঁর আমলে কেন যে তৎপরতা দেখাননি তা বোঝা গেল না।

যাই হোক, ছবিতে কাঠ চুরির ব্যাপারটা রাতের অন্ধকারে লরি চলাচল ব্যতিরেকে কিছু সংলাপের সাহায্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। আদিবাসী-শোষণ দেখাতে চড়া সুদে কর্জ থেকে শুরু করে ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া প্রভৃতি নানা ঘটনার সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। এই দুই অংশের দুই ভিলেন স্বরূপ দত্ত এবং উৎপল দত্ত ভিলেনি দেখাতে গিয়ে যা যা করণীয় (ম্যানারিজম্‌সহ) সব করে গেছেন। পক্ষান্তরে হিরো ভিক্টর ব্যানার্জি বইয়ে বাঁধানো কিছু সংলাপ আউড়ে সারা ছবিতে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। নায়িকা তনুজা এতেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। নেহাৎ অজয় করের ছবি বলেই হয়তো তিনি বনে বনে নেচে নেচে প্রেম করার সুযোগ পাননি। বয়সটাও কিছুটা অন্তরায়।

এসব সত্ত্বেও ছবিটাকে ডিরেক্টর'স ফিল্ম বলা যেত যদি কোন বার্তা পাওয়া যেত। একজন আমলার মহানুভবতা এবং লগনের হত্যার অব্যবহিত পরে তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংগে সংগে সূর্যোদয় দেখিয়ে ছবির উদ্যোক্তারা কোন বার্তা পৌঁছে দিলেন? তবে লগন মৃত্যুর সময় জেনে গেছে, সরকার তাদের সাহায্য করবে। অজয় কর ছবির লোকেশান ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে রাখলে অবশ্য এ থেকে অন্য একটা বার্তা মিলত!

এমন আড়ষ্ট অভিনয় সাধারণ মানের বাংলা ছবিতেও বড় একটা দেখা যায় না। উৎপল দত্ত অভিনয়ের দিক থেকে এখনও সেই 'অমানুষ'-স্তরেই রয়ে গেলেন। ভিক্টর যে কেন অহেতুক শ্বাসাঘাতপ্রধান উচ্চারণে সংলাপ বলেন তিনিই জানেন। তনুজা ও শোভা সেনই কেবল স্বাভাবিক অভিনয়ে চরিত্র দুটিকে দাঁড় করিয়েছেন। স্বরূপ দত্তর মঞ্চঘেঁষা ভিলেনি অভিনয় ফিল্মে মেনে নেওয়া মুশকিল। বিদনাথ ওঁরাও ও তাপস চক্রবর্তী ভাল অভিনয় করলেও ডাবিং-এর বিপত্তির মধ্যে পড়ে তেমন দাগ কাটতে পারেননি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুর সৃষ্টি ছবিটিকে অনেকাংশে ভাল লাগায়, বিশেষ করে আদিবাসীদের লোকনৃত্য অংশ সত্যিই চমৎকার।

অজয় কর ছবি তুলেছেন বলে যে প্রত্যাশা জাগে তা পূর্ণ না হওয়ায় এ ছবির প্রাপ্তিফল শূন্য হলেও বাংলা ছবির সাম্প্রতিক গড্ডল প্রবাহের বাইরে দাঁড়াবার মত মর্যাদা ছবিটিকে দিতেই হয়।

রতন চক্রবর্তী

নাটক বলা যায় না

সংস্কৃতি জগতে এমন কয়েকজন থাকেন যাঁরা সবসময় সহজে উত্তরণের কথা মাথায় রাখেন। সেইদিকে নজর রেখেই হয়ত কঠিন কোন নাটককে বাছাই করেন। কিন্তু ব্যক্তি বা সংস্থা সেই নাটক মঞ্চস্থ করতে গিয়ে পদে পদে আটকে যান নিজেদের বেড়াজালেই। এরকমই একটা সংস্থার নাম 'রৈবতক'।

সম্প্রতি কলাকুঞ্জে (কলামন্দির) তাঁরা নিবেদন করলেন 'সময় হল'। প্রযোজনাকে নিজেরা ব্যতিক্রমী বললেও, দর্শকরা সেই কথা বলবেন না। কারণ রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী'র আংশিক কিছু নিয়ে যা মঞ্চস্থ হয় তাকে নাটক বলা যায় না।

একঘেয়েমি, অভিব্যক্তিহীন, সময়বিশেষে অতিনাটকীয়তা বিরক্তিকর। এছাড়াও ছিল সংলাপ ভুলে যাওয়া। তবে শিল্পীদের দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, সীমিত পরিসরে তাঁরা যথেষ্ট যত্নবান, আন্তরিক ছিলেন।

এর মধ্যে সুশান্ত বিশ্বাস (বিশ্বপাগল) গতানুগতিকতার বাইরে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন নিজ গুণে। আর তাঁর 'অগম সমুদ্রের দূতী' সেই 'নন্দিনী' ও কয়েকটি জায়গায় অভিনয়ের ছাপ রেখেছেন। রঞ্জনকে পাবার আকুলতা, যন্ত্রণা ফুটিয়ে তুলতে নন্দিনীর ভূমিকায় সুস্মিতা সেন আন্তরিক ছিলেন। তবুও বলতে হয়, এই জায়গায় অংগনা বসু ছাড়া চলতি সময়ে অন্য কাউকে ভাবা যায় না। উল্লেখ্য, অংগনা ও সৌমাদেব বসু নাটকের উপদেষ্টা ছিলেন।

আশা করা যায় চতুর্থ বছরের নিবেদনে 'রৈবতক' সস্তায় নাম কেনার চেষ্টা না করে শিক্ষা ও অনুশীলনকে কাজে লাগিয়ে দর্শকমন জয় করবেন।

দীপংকর পাল

শিশু সমভাবনার প্রথম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

দুর্জনেরা বলেন, আজকাল নাকি শিশুদের নিয়ে বিশেষ চিন্তা-ভাবনা করা হয় না। সেজনাই শিশুরা সাংস্কৃতিক জগৎ থেকে সরে যাচ্ছে। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য না হলেও আংশিকভাবে যে সত্য তা আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। সম্প্রতি কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে 'শিশু সমভাবনা' ও 'সমভাবনা'র প্রথম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শরৎ সন্ধ্যায় উত্তর কলকাতার বিজন থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হল। যদিও সঠিক সময়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়নি, তথাপি এত ছিমছাম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাতে হয়।

কাকলী বসাকের ভজন দিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। পরে সংস্থার পক্ষ থেকে সম্পাদক নির্মাল্য বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন, 'আমাদের এই সংস্থা অন্যান্য সংস্থার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন – ভাবে এবং অনুভবে। কেন না এখানে কোন নামীদামী শিল্পীদের দিয়ে শিক্ষকতা করানো হয় না।'

বক্তব্য শেষ হবার পর মূল অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। শিশু নাটিকা – 'বাঁশিওয়ালা'। নাটিকাটি একটু ভিন্ন স্বাদের। আবেগপ্রবণ, কল্পনার রঙিন স্বপ্নে শিশুরা যেমনভাবে প্রভাব বিস্তার করতে চায়, তারা যেমন গান-বাজনা কোরাসের শব্দে মশগুল হয় ঠিক এমনই ভাবনাকে সামনে রেখে রচিত হয়েছে নাটিকাটি। তবে গানের তালিকা আরো বাড়লে ভাল হত। শুভ জোয়ারদারবাবু যদি নেপথ্যে সংলাপ না বলিয়ে সরাসরি সংলাপ বলাতেন তবে প্রাণ ফিরে পেত নাটিকা। কেননা শিশু শিল্পীর অভিনয়ের সঙ্গে পরিণত বয়সের কণ্ঠস্বর বড় বেমানান। তা সত্ত্বেও শিল্পীরা সাধ্যমত জড়তা কাটিয়ে নেপথ্য-র সঙ্গে ঠোঁট মিলিয়ে দাপটে অভিনয় করে গেল। প্রশংসাও পেল দর্শকদের কাছ থেকে।



বাঁশিওয়ালা নাটিকার একটি দৃশ্য

বাঁশিওয়ালা বাবলি করের অভিনয় বিশেষ উন্নতমানের নয়। গজকেষ্টর ভূমিকায় ঝুমুর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ক্ষেন্তপিসির ভূমিকায় মিঠু দে দারুণ অভিনয় করল। মিঠু দে অনুষ্ঠানে হাসির খোরাক জুগিয়ে গেল সুন্দরভাবে। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে কাকলি কুণ্ডু, টুম্পা জোয়ারদার, সুস্মিতা কুণ্ডু, সিনফা বসু, দোলন মাইতি, অভিজিৎ সুর, সুদীপ্তা বসু, সুস্মিতা বসু, সংগীতা বসু উল্লেখযোগ্য। নেপথ্যে গানগুলি গেয়েছেন বনানী রায়চৌধুরী, নির্মাল্য বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতুল মুখোপাধ্যায়, শুভ জোয়ারদার এবং আলো সেনগুপ্ত।

নাটিকার পর শিশুভাবনার কতকগুলি ভিন্নস্বাদের ছড়া গান পরিবেশন করলেন প্রতুল মুখোপাধ্যায়। তাঁর নির্বাচিত তালিকায় ছিল সুকুমার রায় এবং শঙ্খ ঘোষের কিছু মজার ছড়া।

এমন একটি সুন্দর আনন্দ সন্ধ্যা উপহার দেবার জন্য সংস্থার কর্ণধারদের ধন্যবাদ জানাই।

অশোক সেন

ক্যাসেট সমালোচনা

আরব্য রজনী

সম্প্রতি হাতে এল 'আরব্য রজনী'র অডিও ক্যাসেট। ক্যাসেটটি উপস্থাপনা করেছেন অ্যাড ও আর্ট সংস্থা। আরব্য রজনী নামটিই আমাদের মনে ঔৎসুক্য জাগায়। এখানে বেছে নেওয়া হয়েছে দুটি গল্প। প্রথম গল্পে, কামার-অল-আকবর আর সামস-অল-নাহারের প্রেমের মাঝখানে রয়েছে এক অলৌকিক কাঠের ঘোড়া। যে ঘোড়া নাটকটিকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টানটান করে রেখেছে। দ্বিতীয় গল্পে, মুক্তাবানু কীভাবে তার প্রেমিক আবু-অল-হাসানকে খলিফার রঙমহল থেকে উদ্ধার করল তারই রোমাঞ্চকর বর্ণনা।

বিদিশা বসুর নাট্যরূপ 'আরব্য রজনী'র মেজাজ ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ফলে নাটকের আকর্ষণ কোথাও এতটুকু কমেনি। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা প্রায় সবাই অতি পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আবার প্রমাণ করলেন যে অডিও নাটকেও তিনি সমান পারদর্শী। তাঁর কণ্ঠকে অসাধারণ ভাবে ব্যবহার করে কামার-অল-আকবরের চরিত্র তিনি জীবন্ত করে তুলেছেন। জগন্নাথ বসুও নিজের সুনাম বজায় রেখেছেন। তাঁর কণ্ঠ-পরিবর্তন অবাক করে দেবার মতন। ছোট্ট একটি চরিত্রে অভিনয় করেও আমাদের মনে দাগ কেটে যান গৌরী ঘোষ। তুলনায় তপেন চট্টোপাধ্যায় এবং পার্থ ঘোষ কিছুটা ম্লান। আর হ্যাঁ, দুটি নাটকেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আর জগন্নাথ বসুকে যথাযথ সাহায্য করেছেন বিদিশা বসু। নাট্যকার এবং নির্দেশকও তিনি, ফলে দুটি চরিত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা তিনি অনায়াস দক্ষতায় করেছেন। নতুনদের মধ্যে বিশ্বদল চট্টোপাধ্যায় এবং শঙ্কর ভট্টাচার্য আশা জাগান। আর একজনের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি দেবরাজ রায়। তাঁর প্রধান গুণ তিনি সব সময়েই চরিত্রের গভীরে যেতে পারেন। ছন্দা সেনের গ্রন্থনা নাটকের গতি বজায় রেখেছে।

'আরব্য রজনী'র রেকর্ডিং প্রশংসনীয়। এরকম উন্নত মানের রেকর্ডিং সচরাচর শোনা যায় না। হেমন্ত মিত্রর শব্দ-সম্পাদনা নাটককে সাফল্যের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। রমেন দত্তর সুরে মীনা মুখার্জির গান জনপ্রিয়তা লাভ করবে। 'ডাকস আর্নিকা হেয়ার অয়েল'-কে ধন্যবাদ। ক্যাসেটে লেখা আছে প্রথম খণ্ড। দেবু চক্রবর্তীর প্রযোজনায় 'আরব্য রজনী' দ্বিতীয় খণ্ডের অপেক্ষায় রইলাম।

সমীর রায়

[redacted]



বিসর্জন নাটকের একটি দৃশ্য

রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন

সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে সমস্বরে প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী নাটক 'বিসর্জন' মঞ্চস্থ হল।

'রাজর্ষি' ও 'বিসর্জন' এই দুইয়ের মেলবন্ধনে 'বিসর্জন'কে পেলাম সেই সন্ধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের মূল ভাবনাকে কেন্দ্র করে বাবলু মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় নাটকটি নবতররূপে আমাদের কাছে হাজির হল। বলতে দ্বিধা নেই বাবলু মুখোপাধ্যায় কবির প্রতি আগাগোড়া শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' গানের প্রয়োগ বিষয়বস্তুকে জোরালো করতে সাহায্য করেছে। নির্দেশনায় গৌতম মুখোপাধ্যায় নতুনত্বের চমক আনেন। সমগ্র প্রযোজনাটিতে গলদ ছিল চরিত্র নির্বাচনে। আমরা ব্যক্তিত্বহীন গোবিন্দমাণিক্য কিংবা দুর্বল গুণবতীকে দেখতে চাই না। মনে হয়, শিল্পীদ্বয় চরিত্র বুঝে উঠতেই পারেননি। নক্ষত্র রায় চরিত্রাভিনেতাও তথৈবচ। ব্যতিক্রম জয়সিংহ চরিত্রে মুরারি মুখোপাধ্যায় ও অপর্ণারূপী পূরবী মুখোপাধ্যায়। শিল্পীদ্বয় চুটিয়ে অভিনয় করলেন, নাটক উতরোলেন। রঘুপতির ভূমিকায় প্রদীপ ঘোষ প্রথমে খেই হারালেও শেষটা ভালই করেছেন। ধ্রুব চরিত্রে কুমারী হেমা ও গ্রামবাসীগণের মধ্যে স্বপ্না অধিকারী, সুপ্রিয় দাসকে ভাল লাগে। আলোর ব্যবহারে স্বরূপ মুখার্জি পুরোপুরিভাবে ফেলইওর। আবহ সুপ্রযুক্ত। নৃত্যের ক্ষেত্রে প্রায় একই ধরনের মুদ্রা ব্যবহারে একঘেয়ে লেগেছে।

রাহুল গুপ্ত

মহানায়ক উত্তমকুমার ইনস্টিটিউট অব মডার্ন আর্ট অ্যান্ড কালচার-এর অনুষ্ঠান

উত্তমকুমারের নামে যে কটি কলাচর্চাকেন্দ্র কলকাতায় ছড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে 'মহানায়ক উত্তমকুমার মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট অব মডার্ন আর্ট অ্যান্ড কালচার' সম্ভবত অগ্রজ। সম্প্রতি ফুটনানি হলে এই শিক্ষায়তন আয়োজন করেছিলেন একটি অনুষ্ঠানের। নবীন শিক্ষার্থীরাই ছিলেন এই অনুষ্ঠানের শিল্পী।

ছ'মাসের শিক্ষায় মঞ্চে উঠলে একটি অনুষ্ঠানের মান যেখানে পৌঁছতে পারে, শিক্ষায়তনের ছাত্রছাত্রীরা অনুষ্ঠানটিকে ততখানিই নিয়ে যেতেন পেরেছিলেন। তাদের উৎসাহে প্রেক্ষাগৃহে ছিল উৎসবের আমেজ। চলচ্চিত্র জগতের কিছু নামী ব্যক্তির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের শুরু। প্রথম পর্যায়ে ছিল ৩২ জন সংগীত শিক্ষার্থীর সংগীতানুষ্ঠান। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কেউ নেই। তবে কয়েকজনের



'আজকাল'-এর একটি দৃশ্য

কণ্ঠে ছিল সম্ভাবনার ইঙ্গিত। সংগীত নির্বাচনে শিক্ষার্থীরা আর একটু মনোযোগী হলে পারতেন। বাঙলা ও হিন্দি ছবির, এমনকি উত্তম ও রাজকাপুর স্মরণেও ওঁদের জনপ্রিয় ছবির কিছু গান শিক্ষার্থীরা গাইলেন। দুই ছাত্রের ট্রাক সিস্টেমে গান গাইবার মধ্যে থেকে বোঝা গেল যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি একেবারে অত্যাধুনিক সিস্টেমে গান গাইতে শিক্ষার্থীদের অভ্যস্ত করাচ্ছেন। কিন্তু গান বলতে যা হল, তা প্রায় সবই 'কপি-সিঙ্গিং'। সংগীত শিক্ষার প্রাথমিক স্তরেই এ জাতীয় অনুকরণ প্রবণতা কতখানি ফলপ্রসূ হবে তা যথেষ্ট সন্দেহের। 'কপি সিঙ্গিং'-এ যে সাংগীতিক বোধ বা স্বকীয় স্টাইল গড়ে ওঠে না তা বোঝা গেল।

পরবর্তী অনুষ্ঠান ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের আধুনিক নৃত্যের পরিবেশন। ইদানিং ভারতীয় নৃত্য বোধয় ব্রাত্য হয়ে পড়েছে। রাস্তায়, জলসায়, সিনেমায় এখন শরীর মুচড়ানো নৃত্যের কদর। ইনস্টিটিউটও চলতি হাওয়ার পন্থী। তাদের দুই শিক্ষার্থী প্রদীপ ভৌমিক ও দীপা রায়চৌধুরীর 'ডান্স-ডান্স' ছবির নাচে ঝড় উঠল মঞ্চে। 'প্যায়ার কা মন্দির' ছবিতে মিঠুনের নকলে নাচলেন সঞ্জয় সিং চৌহান।

সব শেষে ছিল দুটি একাংক। এই নাট্যানুষ্ঠানেই ছিল যা কিছু মৌলিকত্বের প্রয়াস। সমাজের অবক্ষয়ী মানসিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং সুস্থ মূল্যবোধের উদ্বোধন – এই থীমকে আশ্রয় করেই একাংক দুটি বিধৃত। নাট্য নির্বাচন প্রশংসনীয়। তবে আঙ্গিক, মঞ্চ, আলো তথা উপস্থাপনার সর্বাংশে ছিল অত্যন্ত দুর্বলতার ছাপ। নাটক যখন করতেই হবে, তখন ভালভাবে গুছিয়ে করাই বাঞ্ছনীয়। প্রথম একাংক 'শ্রেষ্ঠ জয়'-এ অভিনয়ে স্পর্শ করেছেন বিউটি বসুরায় (পামেলা) সম্ভাবনাময়ী। অন্যদের মধ্যে অনিমেষ ভট্টাচার্য (তীর্থবরণ), মোহরচাঁদ আহমেদ (বাউল), স্বপ্না দাস (অঞ্জলি) মন্দ নন। তবে এদের প্রত্যেককেই পরিণত হতে হলে অনেক অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। একাংক দুটির নাট্যকার ও নির্দেশকের নাম জানা যায়নি। একটি চরিত্রলিপির ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। দ্বিতীয় একাংক 'আজকাল'।

বসুবন্ধু

মাথা চিবনোর মজা

পরিচালক বীরেশ চ্যাটার্জির রঙিন বাংলা ছবি 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'-এর অন্যতম প্রধান নারী চরিত্রে অভিনয় করার জন্য মৌসুমী আজকাল ঘন ঘন বোম্বাই-কলকাতা করছেন। সেদিন খানিকক্ষণ শুটিং চলার পর লাঞ্চ-ব্রেক হল। একজন মৌসুমীকে লাঞ্চের মেনু কী কী তা জানালেন। চিকেন, কই মাছের ঝোল, চিংড়ির মালাইকারি ইত্যাদি ইত্যাদি। মেনু শুনে মৌসুমী বললেন, দারুণ হয়েছে। আর কী আছে? আর.... আর প্রোডাকশনের সংগে জড়িত ঐ ভদ্রলোকের কথা শেষ করতে না দিয়েই বললেন মৌসুমী, কইমাছের মাথা, মুরগীর হাড় চিবতে তো খুবই ভাল লাগে, তা মানুষের মাথার ব্যবস্থাটা রাখেননি। ওটা চিবিয়েও তো দারুণ মজা পাই। মৌসুমীর কথা শুনে ফ্লোরে উপস্থিত সব্বাই হেসে উঠলেন হো হো করে।



আমিরি চাল

হিট হিন্দি ছবি 'কয়ামত সে কয়ামত তক'-এর নায়ক আমির খান ইদানীং ওঁর মাথা আর ঠিক রাখতে পারছেন না। সাফল্য ব্যাপারটা ওর মাথায় চেপেচুপে বসেছে। রমেশ সিপ্পি, রাহুল রাওয়ালসহ হিন্দি ছবির জনাকয়েক তাবড় পরিচালকের বেশ কয়েকটা ভাল অফার হেলায় ফিরিয়ে দিয়েছেন আমির। কারণ, দ্বিতীয় নায়কের ভূমিকা ছিল সেগুলি। আমির দ্বিতীয় নায়ক হতে নারাজ। সেইসংগে নায়ক চরিত্রে অভিনয়ের জন্যও নাকি আকাশছোঁয়া দর হাঁকতে শুরু করেছেন উনি। এখন আমিরের উচিত কুমার গৌরবের অতীতটা একটু স্মরণ করা।



সুপ্ত

ফটো : অরুণ চট্টোপাধ্যায়

টুপি পরানো

স্টুডিওতে সুমিত্রা মুখার্জি মাথায় টুপি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সুমিত্রাকে টুপি পরে ঘুরে বেড়াতে দেখে অনেকেই অবাক। অভিনেতা বিপ্লব চ্যাটার্জি সুমিত্রাকে ঐরকম দেখেই একছুটে তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, কী ব্যাপার, টুপি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছ তুমি? আগে তো তোমাকে কখনই টুপি পরে ঘুরে বেড়াতে দেখিনি। একগাল হেসে সুমিত্রা বললেন, কী আর করি বল। কেউ যাতে আমাকে টুপি পরাতে না পারে সেজন্য নিজেই টুপি পরেছি।



ফটো : অর্দ্ধেন্দু রায়

যৎ কিঞ্চিৎ



আর কে লক্ষ্মণ/টাইমস অফ ইণ্ডিয়া

হিন্দুবাদের প্রচারের জন্য যা যা করা দরকার শিব সেনা তার সবই করবে। কেউ তাকে ঠেকাতে পারবে না।

বাল থ্যাকারে

শিব সেনা প্রধান

● ● ●

নির্বাচন পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস নিয়ে সরকারের সংগে কংগ্রেস দলের আলোচনা কখনই বিরোধী দলের সংগে আলোচনার বিকল্প হতে পারে না।

লালকৃষ্ণ আদভানি

● ● ●

নির্বাচন কবে হবে সেটা একমাত্র উনিই (রাজীব গান্ধী) জানেন এবং তাও ওঁর সুবিধেমতই করা হবে।

দেবীলাল

● ● ●

আমরা তো স্বাধীন ভারতে বাস করছি। আমি যদি খালি পায়ে সংসদ কিংবা রাষ্ট্রপতি ভবনে যেতে পারি তবে এখানে আটকানো হবে কেন? এদের ২০০ বছরের পুরোনো নিয়ম বদলানো উচিত অথবা এই ক্লাবের ডিরেক্টরকে পত্রপাঠ ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।

মকবুল ফিদা হুসেন

বোম্বাইয়ের উইলিংডন ক্লাবে শিল্পীকে খালি পায়ে ঢুকতে না দেবার পর

● ● ●

জাতীয়তাবাদী নেতাদের স্টালিন ঘৃণা করতেন এবং বিশ্বাস করতেন লাল নেপোলিয়নবাদে।

গিরিলাল জৈন

সম্পাদক, টাইমস অফ ইণ্ডিয়া

● ● ●

আমি সিরিয়াস লোকও বটে। আমার মনে হয় ইউনাইটেড স্টেটসের রাষ্ট্রপতির অফিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা।

মাইকেল ডুকাকিস

পরিবর্তন

সংযুক্ত সম্পাদক : ঊষা ভৌমিক
শিল্প-উপদেষ্টা : নিতাই ঘোষ

চিফ এগজিকিউটিভ,
বিপণন, বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ :
সি এইচ বসু, কলকাতা
সার্কুলেশন কণ্ট্রোলার : প্রসাদ চন্দ্র দত্ত

সম্পাদকীয় দফতর ও রেজি: অফিস :
৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭২, ফোন : ২৭-২১৬৯, ২৭-৯২৯২, ২৭-৯৩১১, ২৬-১৬৮০, ২৬-১৬৮১
Telex 021-5092 IPPL-IN

দিল্লি অফিস :
বিশেষ সংবাদদাতা :
প্রসেনজিৎ গাংগুলী
সূর্যকিরণ বিল্ডিংস, ফ্ল্যাট ১২১২, ১৯ কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, নিউ দিল্লি-১১০ ০০১, ফোন : ৩৩১-৭০২৪

জোনাল ম্যানেজার, নর্দার্ন জোন :
ওয়াই এ শেঠি, দিল্লি
জনসংযোগ অফিসার :
শ্রীমতী গায়ত্রী রায়, দিল্লি

বোম্বাই বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি :
ভি সত্যমূর্তি
বোম্বাই অফিস :
বিশাল বিজনেস সেন্টার, ওয়ারডেন হাউস, দ্বিতল, স্যর পি এম রোড, ফোর্ট, বোম্বাই-৪০০ ০০১
Gram VIBICENT
Telex 001-5726 AMSL-IN.
ফোন : ২৪-৭২২৯৫, ২৪-৭২৩৩৪, ২৪-৭১৩৫৮

বাংগালোর প্রতিনিধি : সি আর ভরত
১৫৯ এন জি ই এফ কলোনি
রাজামহল বিলাস, এক্সটেনশন II স্টেজ
বাংগালোর-৫৬০ ০২৪
মাদ্রাজ প্রতিনিধি : পি এস রামমূর্তি
৩৭ পেরুমল স্ট্রিট, পুরসাওয়াকম্, ফ্লাওয়ার্স রোড পোস্ট
মাদ্রাজ-৮৪, ফোন : ৬৬-৪৭২১

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০ ০১৩ (ফোন : ২৪-০১৯৯) থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭২ থেকে প্রকাশিত।

Regn. No. 32

380 Rs 4.50



বিধিসম্মত সতর্কীকরণ : সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর

STATUTORY WARNING: CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH